কুলকুণ্ডলিনী

সমরেশ মজুমদার

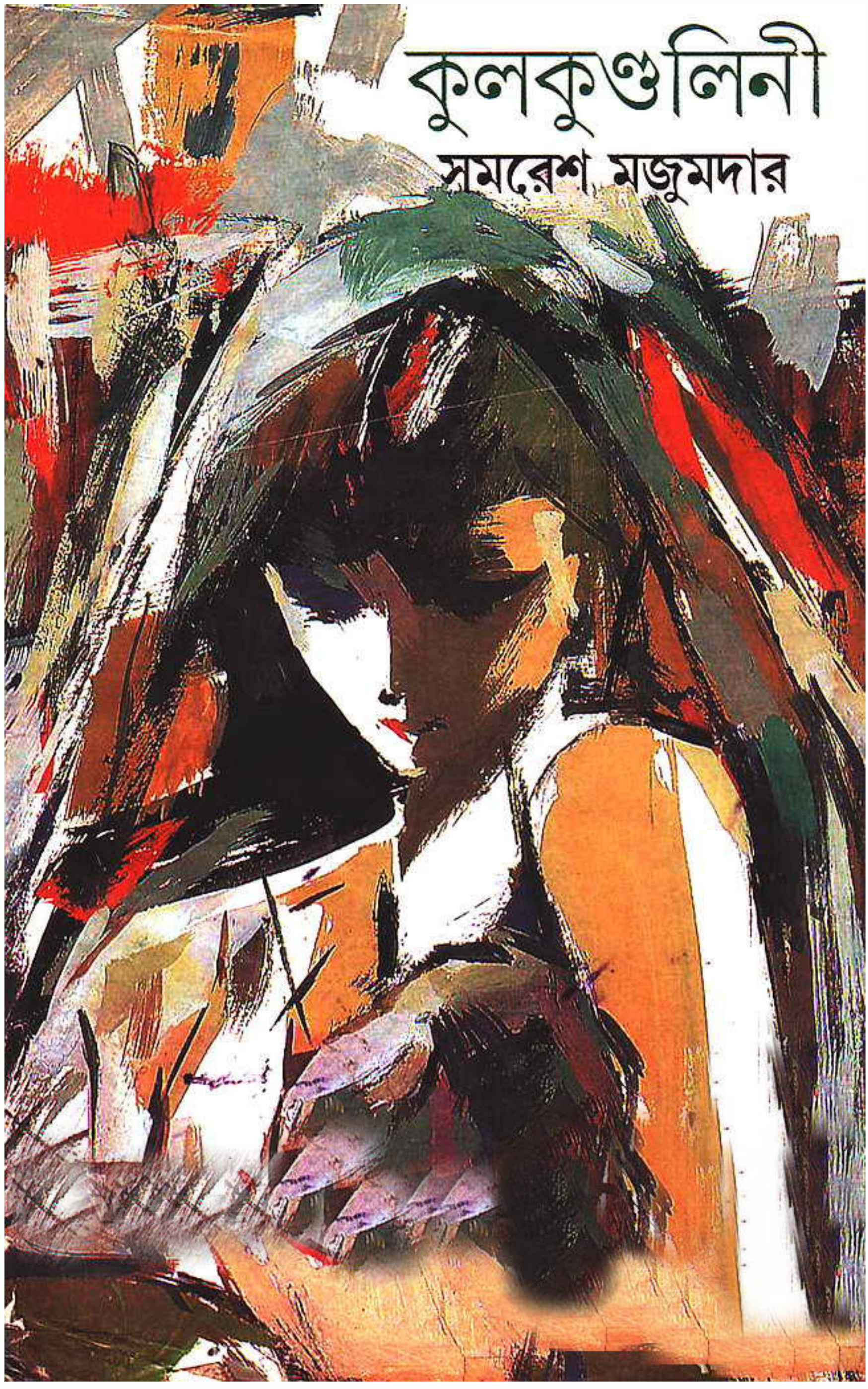

সে—মানে একটি প্রাণ। অসমাপ্ত কর্ম সম্পাদনের জন্য আরও একটি জন্ম অতিবাহিত করতে তাকে আসতেই হবে পৃথিবীতে। ধারণ করতে হবে রস-রক্ত মাস-মজ্জা শুক্র-অস্থি সমন্বিত মনুষ্যশরীর। বিধাতা তাকে তেমনই নির্দেশ দিয়েছেন।

পরমপিতা অবশ্য এই স্বাধিকারটুকু তাকে মঞ্জুর করেছেন যে, আগামী জন্মের মাতৃগর্ভ সে নিজেই নির্বাচন করে নিতে পারবে। তবে হাতে মাত্র একরাত্রির সময়সীমা।

কিন্তু কোন্ দম্পতিকে সে নির্বাচন করবে?

মধ্যরাত্রে সে তাই খুঁজে বেড়াচ্ছে তার উপযুক্ত জননীজঠর।

এমনই এক আশ্চর্য অন্বেষণ থেকে শুরু হয়েছে সমরেশ মজুমদারের এই স্বতন্ত্রস্বাদ উপন্যাস। তিনি এর প্রথম পরিচ্ছেদের নাম রেখেছেন, বোধন। গর্ভগৃহে অবস্থান ও জন্ম থেকে শুরু করে ক্রমপরিণতির সঙ্গে মিলিয়ে পরবর্তী পরিচ্ছেদের নাম যথাক্রমে সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী ও দশমী।

পরিচ্ছেদ-শিরনামার মতোই আদ্যন্ত চমকপ্রদ এই উপন্যাস। এই 'কুলকুণ্ডলিনী', যার সমাপ্তি আসলে আরেক আরম্ভেরই সূচনা। শরীরের মূলাধারে নিদ্রিত শক্তিকে জাগ্রত করার সাধনায় যা করে উদ্বুদ্ধ।

বোধন

একটির পর একটি স্তর পেরিয়ে তিনি নেমে আসছিলেন। তাঁর ইচ্ছাশক্তি এখন নিষ্ক্রিয়। নেমে আসা ছাড়া তাঁর কোন ভূমিকা নেই। এই অবতরণের সময় তিনি স্তরগুলো ক্ষণিকের জন্যে প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি যে স্তরে ছিলেন তার সঙ্গে পার্থক্য কতটুকু তা বোঝার অবকাশ পাননি। কিন্তু কাতর কোলাহল তাঁর সত্তাকে স্পর্শ করেছিল।

পৃথিবীর ওপর পৌঁছানো মাত্র তাঁর গতি শ্লথ হল। এবার তিনি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন। এখন সূর্যদেব অস্তমিত। আকাশে পূর্ণচন্দ্রের রাজত্ব। সেই মোলায়েম আলোয় তিনি তাঁর নিচের পৃথিবীকে চমৎকার দেখতে পাচ্ছেন। আকাশচুম্বী এক অট্টালিকার ছাদে তিনি ধীরে ধীরে নেমে এলেন। মাত্র একটি রাত তাঁর হাতে আছে। এই সময়ের মধ্যেই তাঁকে যা করার করতে হবে। পরমপিতা এই স্বাধীনতাটুকু দিয়েছেন।

এখনও তিনি পরমপিতাকে সুন্দর স্মরণ করতে পারছেন। অনেক অনুনয় করেছিলেন তিনি কিন্তু পরমপিতার আদেশ পরিবর্তিত হয়নি। তাঁকে আর একটি জন্ম অতিবাহিত করতে পৃথিবীতে আসতেই হল। যেহেতু সেই অনন্তলোকে তিনি নিজের চিন্তায় মগ্ন থাকতেন সেইহেতু তাঁর পরিমার্জনের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। তাঁকে এখন রস রক্ত মেদ মজ্জা শুক্র মাংস এবং হাড়ের সমষ্টি একটি শরীর ধারণ করতে হবে। সারাটি জীবন ওই শরীরের মূলাধারে নিদ্রিত শক্তিকে জাগ্রত করার সাধনা করতে হবে।

কিন্তু পরমপিতা তাঁকে একটি কৃপা করেছেন। যে গর্ভগৃহে তাঁকে দশ মাসকাল অবস্থান করতে হবে তা তিনি নিজেই নির্ধারণ করতে পারবেন। পৃথিবীর পরিমণ্ডলে আসামাত্র তাঁর অনেক কিছু স্মরণে এল। এই অনন্ত বিশ্বের জন্মদাতা যেমন পরমপিতা তেমনি একটি মানুষের আরাধ্যা দেবী হলেন তার জননী যিনি সময়বিশেষে ঈশ্বরের ভূমিকা পালন করেন। তাই কোন নারীকে তিনি জননীর সম্মান দেবেন তা অনেক ভেবেচিন্তে ঠিক করতে হবে। হাতে মাত্র একটি রাত।

পৃথিবীর সর্বত্র কোন না কোন নারী প্রতি রাত্রে গর্ভবতী হচ্ছেন। তাঁদের সন্ধান করা সহজ কাজ নয়। তিনি স্থির করলেন এই বিশাল অট্টালিকা যার প্রতিটি তলায় আলাদা আলাদা নারীপুরুষের বাস এখানেই সন্ধান করা শ্রেয়।

তিনি আকাশে তাকালেন। পূর্ণচন্দ্র এখনও মধ্যগগনে উপস্থিত হননি। তাঁর স্মরণে এল এমন রাতই নারীপুরুষকে ঘনিষ্ঠতা বাড়াতে সাহায্য করে।

তাঁর শরীর এখন অবয়বহীন। বাতাসের মত তিনি শূন্যে ইচ্ছেমতন ভেসে বেড়াতে পারেন। কাল নষ্ট না করে তিনি সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। আকাশচুম্বী সেই অট্টালিকার ছাদ থেকে তিনি নেমে এলেন প্রথম ফ্ল্যাটটির জানলায়। একটি সুন্দর ঘর। এক বৃদ্ধ খাটে শুয়ে আছেন। দেখে মৃতদেহ মনে হচ্ছে। এক প্রৌঢ়া ঘরে ঢুকে তাঁর শিয়রের পাশে বসলেন। প্রৌঢ়ার হাত বৃদ্ধের কপালে। প্রৌঢ়া জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেমন লাগছে?'

বৃদ্ধ কথা বলার চেষ্টা করেও সক্ষম হলেন না। তাঁর চোখের কোল বেয়ে জল নেমে এল। প্রৌঢ়া বললেন, 'থাক। কথা বলতে হবে না। আজ পূর্ণিমা তো, ব্যথা একটু বাড়বেই।'

বৃদ্ধের ডান হাত প্রৌঢ়ার হাত জড়িয়ে ধরল। তিনি দেখলেন প্রৌঢ়া ধীরে ধীরে নিজের মুখ বৃদ্ধের বুকের ওপর আলতোভাবে রাখলেন। দুটি মানুষ ওই ভঙ্গিতে চুপচাপ পড়ে রইল। না। এঁরা এখন অতীত। সন্তান কামনার অনেক উর্ধ্বে চলে এসেছেন এঁরা। যদিও ওই প্রৌঢ়া নারীকে জননী হিসেবে ভাবতে তাঁর খুব ইচ্ছে করছিল। তিনি ঘরে ঢুকলেন।

তিন কক্ষের এই ফ্ল্যাটটিতে তৃতীয় মানুষের কোন অস্তিত্ব নেই। যৌবন এখানে মৃত। চারধারে সাজানো জিনিসপত্রেও তাই অতীতের গন্ধ। তিনি আবার জানলা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন।

ঠিক পাশের ফ্ল্যাটের সমস্ত জানলা বন্ধ। শীততাপনিয়ন্ত্রিত ফ্ল্যাটে বাইরের বাতাস অপ্রয়োজনীয়। কিন্তু বায়বীয় শরীর কোনরকমে একটি রন্ধ্র আবিষ্কার করল। তিনি ভেতরে ঢুকে চারপাশে নজর দিলেন। বেশ ঠাণ্ডা লাগছে ভেতরটা। নিচে পুরু কার্পেট। আসবাবপত্র আধুনিক। দ্বিতীয় ঘরটিতে টিভি চলছে। সুন্দরী নায়িকা গাছের ডাল ধরে গান গাইছে সেখানে। টিভি-র উল্টোদিকে যিনি বসে তিনি দারুণ সেজেছেন। তার চোখ মুখ বাহু খুব আকর্ষণীয়। পরনে নীল সিল্কের শাড়ি। কিন্তু বেশিক্ষণ স্থির হয়ে থাকতে পারছেন না তিনি। দেখে মনে হচ্ছে খুবই উদ্বেগে আছেন। একবার উঠে টেলিফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করলেন। ওপারে কারো সাড়া না পেয়ে সেটি রেখে নিজের রক্তিম ঠোঁট কামড়ে ধরে বেশ হতাশ পদক্ষেপে টিভি-র সামনে ফিরে এলেন। অন্তত পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি লম্বা ইনি। শরীর বেশ সুন্দরভাবে গঠিত। এই রকম শরীরে সন্তান জন্ম নিলে সুস্থ থাকবেই। তিনি পুলকিত হলেন। এই ফ্ল্যাটের অন্য মানুষ কোথায়? তিনি পাশের ঘরে ঢুকলেন। চমৎকার একটি দুজনের বিছানা। চাদরে সামান্য ভাঁজও নেই। হালকা নীল আলো জ্বলছে এই ঘরে। কোন মানুষ নেই। তৃতীয় ঘরটিতে বইপত্র ভর্তি। দেওয়াল আলমারিতেও বই। তিনি বইগুলোর সামনে দাঁড়ালেন। আইনের বই। টেবিলেও সেই বই-এর স্তূপ। চেয়ারটি খালি। অর্থাৎ গৃহকর্তা আইন ব্যবসায়ী। তিনিই নিশ্চয়ই ওই ভদ্রমহিলার স্বামী। কোথায় গেলেন ভদ্রলোক এমন চাঁদের রাতে?

পাশেই একটা মাঝারি রান্নাঘর। তার মেঝেতে এক প্রৌঢ়া বসে

ঝিমোচ্ছে। দেখলেই বোঝা যায় সে এই বাড়ির কাজের লোক। যেহেতু তার কাজ শেষ এবং কিছু করার নেই তাই ঝিমোনোতেই তার তৃপ্তি। তাঁর মনে হল বেচারা টিভিতে নায়িকার নাচ দেখতে পারত! এই সময় জলতরঙ্গের মত একটা বাজনা বাজল। সঙ্গে সঙ্গে প্রৌঢ়ার চোখ খুলে গেল, 'ওই এল। একটা সুযোগও হাতছাড়া করে না।'

প্রৌঢ়ার বিড়বিড়ানি শেষ হওয়ামাত্র তিনি ছুটে গেলেন টিভি-র ঘরে। সুন্দরী দরজা খুলছেন তখন। দরজার বাইরে এক সুদর্শন যুবক মৃদু হাসছেন। সুন্দরী ঘাড় বেঁকিয়ে বললেন, 'সেই এত দেরি করলে তুমি! কখন্ থেকে বসে আছি।'

'সরি। বেরুতে যাব ঠিক তখনই একটা কল্ এল। মরণাপন্ন রুগী।'

কথা বলতে বলতে যুবক ভেতরে ঢুকে পড়েছেন। দরজা বন্ধ করে সুন্দরী আরও অভিমানী হলেন, 'যাও তা হলে রুগী দেখে বেড়াও। এখানে আসার দরকার কি?'

যুবক সামনে এগিয়ে এলেন, 'তুমি রাগ করেছ?'

একটু ছিটকে গেলেন সুন্দরী, 'যাও! আমার ভাল্লাগে না। সপ্তাহে এক-আধ দিন সুযোগ পাই তবু তোমার সময় হয় না। আমাকে আর ভাল লাগছে না, বুঝতে পারছি।'

যুবক এবার একটু জোর করেই সুন্দরীকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করলেন, 'ক্ষমা চাইছি। আর হবে না। আসলে মুখের ওপর যাব না বললে প্রফেসনের ক্ষতি হবে, তাই।'

'আমার চেয়ে তোমার কাছে প্রফেসন বড় হল?' সুন্দরীর অভিমান তখনও যায়নি।

খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে তিনি এই দুটি মানুষের লীলা দেখতে লাগলেন। অভিমান ভাঙানোর পর্ব মিটল। সুন্দরী যুবকের বক্ষলগ্না হয়ে বসে আছেন। মিষ্টি আদুরে কথাবার্তা। তাঁর মনে হতে লাগল এইভাবেই তো হয়। সুন্দরীকে জননী হিসেবে এই মুহূর্তে তাঁর পছন্দ হচ্ছে না কারণ ওইসব কথাবার্তা, নারীসুলভ ভাবভঙ্গী। কিন্তু উনি যখন জননী হবেন তখন নিশ্চয়ই চরিত্র বদলে যাবে।

'এ্যাই? কি চাই?'

চিৎকারটা এত কর্কশ যে তিনি চমকে উঠলেন। যুবকের বক্ষ ছেড়ে সরে বসেছেন সুন্দরী। তাঁর ক্রুদ্ধ মুখ দরজার দিকে ফেরানো। সেখানে সেই প্রৌঢ়া কাজের লোকটি অত্যন্ত সংকুচিত হয়ে দাঁড়িয়ে। প্রশ্নের জবাবে সে কোনমতে বলল, 'খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।'

'যায় যাক। তোমাকে হাজারবার বলেছি না ডাকলে এই ঘরে আসবে না।'

'বাবু নেই, তাই ভাবলাম আসতে পারি।' প্রৌঢ়া ঘুরে দাঁড়াল। তারপর নিঃশব্দে যেখান থেকে এসেছিল সেখানে ফিরে গেল। সুন্দরী বললেন, 'ডিসগ্যাস্টিং। আমি ঠিক জানি ও এখানে ইচ্ছে করে এসেছিল।'

'কেন?' যুবক যেন খুব চিন্তিত।

'দেখতে। আমি কি করছি।' সুন্দরী আবার ঘনিষ্ঠ হলেন।

'বকশিস দিলে হয় না ?'

'মাথা খারাপ ! একেবারে পেয়ে বসবে। যাকগে ! তুমি আমার কথা কি ভাবছ বল ?'

'তোমার কথাই তো ভাবি।'

'ছাই ভাবো। শোন, এবার ও ফিরলে আমি অ্যানাউন্স করব।'

'এই না, এখনই না।' যুবক সুন্দরীকে চুম্বন করলেন, 'এখনই করলে অনেক ঝামেলা হবে। তোমার কর্তাকে কিছু বলার দরকার নেই।'

'বাঃ, কখন বলব তা হলে ? ও আমার কোন কথায় না বলে না। চাইলে নিশ্চয়ই ডিভোর্স দিয়ে দেবে। তখন তোমার সঙ্গে—।' এবার সুন্দরী হাসলেন।

'যদি না দেয়, যদি এবারই তোমার কথার অবাধ্য হয় ? রিস্ক নেওয়া ঠিক হবে না। একটু ভাবতে হবে। এখন এসো—।'

তিনি ধীরে ধীরে সরে এলেন। না। অসম্ভব। তিনি একটি সুস্থ পিতামাতা চান। এরা সম্পর্কহীন। নারীটি দ্বিচারিণী। এর গর্ভ থেকে জন্ম নিলে তাঁর পরিচয় কি হবে ? যার জন্ম হবে বেআইনি ভাবে তাকে তো সারাজীবন সমস্যা তাড়া করে বেড়াবে। না। তিনি এমন ভুল করতে পারেন না। তাঁর ইচ্ছে হচ্ছিল পুরুষটিকে আঘাত করে এইসব কাজ থেকে বিরত করতে। কিন্তু এই অবয়বহীন অবস্থায় তিনি কিছুই করতে পারেন না। কোন শাস্তি নেই তাঁর। হঠাৎ তাঁর খেয়াল হল তিনি কেন পুরুষটিকে আঘাত করার কথা ভাবলেন ? নারীটিকে নয় কেন ? আসলে ওই নারী তো পুরুষটিকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। স্বামীর অনুপস্থিতিতে এই অবৈধ লীলা চালাচ্ছে। অতএব আঘাত তো নারীর প্রাপ্য। উত্তরটা নিজের কাছেই স্পষ্ট নয়।

যে রন্ধ্রপথে তিনি প্রবেশ করেছিলেন সেটি দিয়ে বেরিয়ে এলেন আবার। আর। বাইরেটা জ্যোৎস্নায় ঝকমক করছে। অনেক নিচে রাস্তা। আলোগুলোকে বাহুল্য বলে মনে হচ্ছে। না, প্রকৃতি দেখার মত সময় এখন হাতে নেই। তিনি পাশের ফ্ল্যাটে উঁকি মারলেন। এঁদের জানলা টানটান খোলা। এত ওপরে বলে কারো নজর ঘরে পৌঁছায় না।

তিনি দেখলেন মধ্যবয়স্কা এক নারী আয়নার সামনে বসে চুল আঁচড়াচ্ছে। তার মুখ বেশ গম্ভীর। গম্ভীর বলেই ওর সৌন্দর্যে একটা আলাদা মাত্রা এসেছে। ঘরে শিশুর কিছু খেলনা ছড়ানো কিন্তু শিশুটি নেই। একটি কাঠের ঘোড়া দেখে বোঝা গেল শিশুর বয়স চারের বেশি নয়। নারীর চুল বাঁধা হয়ে গেল। সে উঠে দাঁড়াতেই তাঁর মনে হল এই হল প্রকৃত জননী হবার যোগ্যা। যৌবন শুরুর শীর্ণচাঞ্চল্য নেই আবার ভাঁটার টান অনেকদূরে। তিনি খুশি হলেন। যাক, ঠিক জায়গায় পৌঁছানো গেল। কিন্তু এই নারীর গর্ভগৃহে প্রবেশ করতে পুরুষের সাহায্য দরকার। এঁর স্বামী কোথায় ?

তিনি পাশের ঘরে ঢুকলেন। সেখানে একটি শিশু বিছানায় শুয়ে। তার মাথার পাশে আধশোওয়া হয়ে আছেন এক প্রৌঢ়া। না, এঁকে কাজের লোক বলে মনে হল না। প্রৌঢ়া গল্প বলছেন, শিশু শুনছে। এইসময় পাশের দরজা খুলে ঘরে ঢুকল একটি পুরুষ, 'মা, এবার তোমরা ঘুমিয়ে পড়।'

'দাঁড়া, আগে তোর ছেলের চোখে ঘুম আসুক।'

'কতক্ষণ বকবক করবে?'

'তা বললে কি চলে? এককালে তোরও গল্প না শুনলে ঘুম আসত না।' প্রৌঢ়া হাসলেন, 'তোদের রাজারানীর গল্প বলতে হত, একে সুপারম্যানের গল্প শোনাতে হয়।'

এইবার শিশুটি স্পষ্ট বলে উঠল, 'তুমি যাও না, আমি গল্প শুনব।'

পুরুষ হেসে শিশুর কপালে হাত বুলিয়ে দিতেই প্রৌঢ়া নিচু স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হ্যাঁরে, বউমার কি হয়েছে? দু দিন থেকে দেখছি মুখ গম্ভীর। জিজ্ঞাসা করলেও জবাব দেয় না। আমি বাবা কিছুই বুঝতে পারি না।'

পুরুষ হাসল, 'আমিও না।'

তৎক্ষণাৎ শিশুটি বলে উঠল, 'আমিও না।'

পুরুষ আবার শব্দ করে হাসল, তারপর নারীর ঘরের দিকে এগোল। তিনি খুশি হলেন। বাঃ। এই তো উপযুক্ত সাংসারিক পরিবেশ। এ-বাড়িতে জন্ম গ্রহণ করলে ওই শিশুটিকে দাদা বলতে হবে। মন্দ কি!

তিনি দ্রুত পুরুষটির কাছে পৌঁছে গেলেন। সে আজ ঘরের দরজা বন্ধ করছে। নারী ইতিমধ্যে খাটে পাশ ফিরে শুয়ে পড়েছে। পুরুষ টেবিলে ঢাকা দেওয়া জলের গ্লাস তুলে নিয়ে সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে নিঃশব্দে জল পান করল। তারপর আলো নেভালো। তিনি দেখলেন পুরুষ শ্লথ পায়ে বিছানার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তিনি প্রস্তুত হলেন।

এইসময় নারী চাপাগলায় বলে উঠল, 'না। তুমি ছোঁবে না আমাকে।'

বিছানায় বসে পুরুষ বলল, 'কেন?'

'কেন? আবার জিজ্ঞাসা করছ?'

'ব্যাপারটাকে সহজভাবে নাও নীতা।'

'সহজ ভাবে? আমাকে তুমি ভুল বুঝিয়েছিলে। আমি তোমাকে বারবার বলেছিলাম তুমি শোননি। না, আমি আর মেনে নেবো না।'

'অসুবিধে কোথায়?'

'তুমি তো বলবেই। তোমাকে তো কিছু করতে হবে না।' নারী উঠে বসল, 'ওই একটাকে নিয়ে আমি যথেষ্ট ভুগেছি। কাল সকালে আমি যাব।'

'কোথায়?'

'মুক্ত হতে।'

'কার সঙ্গে যোগাযোগ করলে তুমি?'

'খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে ফোন করেছি। কাল সকাল দশটায় অ্যাপয়ন্টমেন্ট দিয়েছে। দুদিন ধরে তোমাকে অনেক বলেছি, তুমি কান দাওনি। তাই নিজের ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হবে। তোমার যদি ইচ্ছে হয় সঙ্গে যাবে নইলে আমি একাই যাব। আর সময় নষ্ট করতে পারব না।' নারী নিঃশ্বাস ফেলল।

পুরুষটিকে অসহায় দেখাল, 'নীতা, আর একবার ভেবে দ্যাখো।'

'আমার আর নতুন করে ভাবার দরকার নেই।'

'কিন্তু আমাদের খোকন একদম একা হয়ে থাকবে? ওর ভাই বা বোন

থাকলে লাভ বই ক্ষতি তো কিছু নেই।'

'তোমার যখন এত ইচ্ছে তখন অ্যাডপ্ট কর। আমি দশ মাস ধরে আর একবার যন্ত্রণা পেতে চাই না। সন্তান দরকার ছিল, একটাই অনেক। আবার তাকে তিলতিল করে বড় কর—উঃ, অসম্ভব।'

'কিন্তু তোমার যখন মনে হচ্ছে কনসিভ করেছ তখন যে আসছে তাকে আসতে দাও। তিন মাস হয়ে গিয়েছে, কোন হাতুড়ের পাল্লায় পড়ে একটা কিছু সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে।'

'এসব কথায় মন ভেজাতে পারবে না। আমি আর মা হতে চাই না। তিন মাসে অ্যাবরশনে কোন ঝুঁকি নেই। আমি কথা বলেছি। আর তিন মাস কোথায়? আমি জাস্ট দুটো মাস মিস্ করেছি। আমার একটাই ভাল। তাকে ঠিকঠাক মানুষ করতে পারলে আর কি চাই?' নারী আবার পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল। পুরুষটি নিঃশ্বাস ফেলল। কিছুক্ষণ পাথরের মত বসে থেকে একসময় বালিশে মাথা রেখে কাত হল সে।

তিনি চুপচাপ শুনে যাচ্ছিলেন। চুপচাপ শোনা ছাড়া তার করার কিছু ছিল না। আগামীকাল একটি প্রাণ নিহত হবে। নিষ্ঠুর হাতে তাকে মাতৃগর্ভ থেকে টেনে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হবে। হঠাৎ মনে হল তিনি খুব বেঁচে গিয়েছেন। চুপচাপ জানলা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন তিনি।

এখন পূর্ণচন্দ্র মধ্যগগনে। সময় দ্রুত বয়ে যাচ্ছে। তিনি পরপর তিনটি ফ্ল্যাটে ঢুকে একই দৃশ্য দেখলেন। সারাদিনের পরিশ্রমের পর নারী পুরুষ গভীর ঘুমে নিমগ্ন। সন্তান কামনায় কেউ আর উদগ্রীব নয়।

চারতলার একটি ফ্ল্যাটে ঢুকে তিনি দুই বৃদ্ধ বৃদ্ধাকে আবিষ্কার করলেন। বৃদ্ধা তাঁর খাটে শুয়ে, বৃদ্ধ জানলায়। বৃদ্ধ বললেন, 'সাড়ে বারোটা বেজে গেল, এখনও ফেরার নাম নেই। ইট্স টু মাচ।'

বৃদ্ধা বললেন শায়িত অবস্থাতেই, 'তুমি কেন এত চিন্তা করছ?'

বৃদ্ধ ধমকে উঠলেন, 'চিন্তা করব না? বিয়ের আগে খোকন কখনও এমন করেছে?'

'করেনি। কারণ তখন ওর বিয়ে হয়নি।'

'আমাকে তুমি বিয়ে দেখিও না। কোনকালে আমি তোমাকে নিয়ে এমন মাঝরাত পর্যন্ত টোটো করে ঘুরেছি? সভ্যতা বলে একটা কথা আছে।'

'তুমি পারনি কারণ রোমান্টিক ছিলে না।'

'বুঝতে পারছি। তোমার প্রশ্রয়েই এসব হচ্ছে।'

'আশ্চর্য! ছেলেমেয়ে দুটোর সবে বিয়ে হয়েছে। এখনই আনন্দ করার সময় আর তুমি ঘরে বসে হেঁদিয়ে মরছ। আসলে তুমি জেলাস।'

'আমি জেলাস?' বৃদ্ধ হতভম্ব।

'নইলে বাড়িতে থাকলে রাত দশটা পর্যন্ত বউমাকে নানান অছিলায় আটকে রাখো কেন? সেই সময় তো ওরা ঘরে বসে গল্প করতে পারে।'

'আটকে রাখি? বউমাই তো বলে আমাকে বই পড়ে শোনাতে তার খুব ভাল লাগে। তা ছাড়া রাত দশটার আগে তুমি কখনও আমার কাছে এসেছ?'

'দিন পাল্টে গেছে সেটা হুঁশ নেই।'

হঠাৎ বৃদ্ধ জানলার বাইরে ঝুঁকে নিচের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এতক্ষণে আসা হল। ট্যাক্সি করে আসা হয়েছে।'

বৃদ্ধা সেইভাবেই শুয়ে থেকে বললেন, 'এত রাত্রে ট্যাক্সি ছাড়া আসবে কি করে?'

'যদি ছিনতাই হয়ে যেত? নতুন বউ, গায়ে গয়না—।'

'আজকাল কেউ গয়না পরে বের হয় না। চোখের মাথা একেবারে খেয়েছ!'

'খাবার খেয়ে এসেছে কিনা জিজ্ঞাসা কর। তোমার ছেলের যা কাণ্ডজ্ঞান।'

'রেস্টুরেন্টে কেউ বেড়াতে যায় না। তোমাকে অত চিন্তা করতে হবে না।'

বৃদ্ধা ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, বৃদ্ধা বাধা দিলেন, 'তুমি শোও, আমি খুলছি।' বৃদ্ধ হতাশ কিন্তু মেনে নিলেন। জানলার পাশে চেয়ারে বসে পড়লেন তিনি। বৃদ্ধা ধীরে সুস্থে উঠলেন। বেল বাজলে ঘর থেকে বেরিয়ে দরজা খুললেন। প্রথমে বউমা পরে ছেলে। মিষ্টি বিদেশি গন্ধ। বউমার নাম পারমিতা, কিছুটা লজ্জিত গলায় বলল, 'একটু দেরি হয়ে গেল মা!' বৃদ্ধা বললেন, 'কি এমন দেরি? কোথায় খেলে?'

'চিনে দোকানে। ওরা খাবার দিতে এত দেরি করে! আপনারা খেয়ে নিয়েছেন?'

'হ্যাঁ, কখন!'

'বাবা?'

'ওঁর তো এক ঘুম হয়ে গেল। যাও শুয়ে পড়।' বৃদ্ধা নিজের ঘরে ফিরে এসে দেখলেন বৃদ্ধ তখনও চুপচাপ বসে। চাপা স্বরে বললেন, 'বউমা তোমার খোঁজ করছিল। বললাম, ঘুমিয়ে পড়েছ। যাও, শুয়ে পড়।'

'খোঁজ করছিল কেন? কোন প্রব্লেম?'

'না। সৌজন্য। ভদ্রতা।'

বৃদ্ধ চটপট চলে গেলেন খাটে। শুয়ে পড়ে বললেন, 'আঃ।'

প্রবাল দরজা বন্ধ করে দেখল পারমিতা খোঁপা থেকে বেলফুলের মালা খুলছে। সে বলল, 'থাক না ওটা। সুন্দর দেখাচ্ছে।'

পারমিতা বলল, 'আহা!'

প্রবাল বলল, 'বাবা এত তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়েছেন ভাবতে পারছি না।'

'তুমি এখন বাবাকে নিয়ে ভাবতে বসলে?'

প্রবাল এগিয়ে এসে পারমিতাকে জড়িয়ে ধরে চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিল। সেকেন্ড দশেক বাদে পারমিতা হাঁসফাঁস করল, 'আঃ, ছাড়ো ছাড়ো।'

'না, ছাড়ব না।'

'দেখছ না, জানলা খোলা আছে?'

'ওদিকে কোন বাড়ি নেই।'

'আলো জ্বলছে।'

সঙ্গে সঙ্গে আলো নিভিয়ে দিল প্রবাল, 'তোমাকে কিছুতেই দেখতে দাও

না।'

'আমি চেঁচাবো কিন্তু, বাবাকে ডাকব।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে।'

তিনি নির্লিপ্ত হয়ে দুটি নারীপুরুষকে দেখতে লাগলেন। নির্লিপ্ত কিন্তু অপেক্ষমাণ। এতক্ষণে বুঝে গিয়েছেন এই যুবক যুবতী তাঁর পিতামাতা হবার পক্ষে উপযুক্ত, ভবিষ্যৎ জীবন এই সংসারে কাটালে তার ভাল লাগবে। এখানে সন্তানের জন্যে পিতার উদ্বেগ আছে, মায়ের স্নেহ পর্যাপ্ত, বয়স্কর প্রতি কনিষ্ঠের শ্রদ্ধা আছে আর স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যে বন্ধুত্ব। এর চেয়ে বেশি কি আশা করা যেতে পারে।

আদরের প্রাথমিক স্তর পেরিয়ে যাওয়ামাত্র বিছানায় শায়িত পারমিতা প্রতিবাদ জানাল, 'না। আজ নয়।'

'কেনো ?' প্রবালের গলায় সহস্র আবদার।

'এখন সময় নয়।' বারংবার মাথা ঝাঁকাল পারমিতা।

'তুমি কিস্যু ভেবো না।'

'আমি এত তাড়াতাড়ি মা হতে চাই না।'

'কথা দিচ্ছি হবে না।'

'ঠিক তো ?'

'একশ বার।'

এইসব শব্দাবলী তাঁর কানে গেল। সঙ্গে সঙ্গে এতক্ষণের সব ভাল লাগা উধাও, কি আশ্চর্য ! এরা সন্তান চায় না ? ওই নবীনা যুবতী যদি মা হতে না চায় তা হলে তিনি কি করবেন ? এখন ওর শরীরে প্রবেশ করলে তিনি অনাকাঙ্ক্ষিত হয়ে যেতে পারেন। অনাকাঙ্ক্ষিত সন্তানকে নির্দয়ভাবে উপড়ে ফেলা যে নারীর পক্ষে অসম্ভব নয় তা তিনি একটু আগে দেখে এসেছেন। আঃ। এখন কি করা যায় ? আবার সন্ধানে বেরুনো ? রাত কমে আসছে যে। হঠাৎ মনে হল পারমিতার মত মিষ্টি স্বভাবের মেয়ে অতটা নির্দয় হতে পারবে না। অনিচ্ছা এলেও তাকে মেনে নিতে হবে। তা ছাড়া এই বাড়িতে শ্বশুর শাশুড়ি আছেন, কোন ঝুঁকি নেওয়া কি এঁদের পক্ষে সম্ভব হবে ? তিনি চোখ বন্ধ করলেন। পৃথিবীর যে কজন নারীপুরুষ শুধু সন্তান কামনায় পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হন তাঁদের সন্ধান পেতে অনেক অনেক রাত অপেক্ষা করতে হবে। ঈশ্বর তাঁকে সেই সময় দেননি। অতএব সেই ব্রাহ্মমুহূর্তে তিনি, একটি প্রাণ, তাঁর মানবজন্মের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

প্রথম মাসে সে তার নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে কিছুই জানত না। যে ডিম্বকোষ থেকে সে উদ্ভূত তা এত ক্ষুদ্র যে চোখেই দেখা যায় না। তিরিশ দিনের মাথায় শরীরের আদল এল, একটি মস্তকের আকৃতি পেল সেই শরীর, হৃদপিণ্ড কাজ শুরু করল, রক্ত চলাচল আরম্ভ হল এবং সেইসঙ্গে শরীরটিতে একটি লেজের অস্তিত্ব দেখা গেল। এখন সেই সময় যখন হাত এবং পা, চোখ ও কান, উদর আর মস্তিষ্কের প্রাথমিক প্রকাশ শুরু হচ্ছে। জীবনের এই প্রথম

মাসটিতে পূর্ণাঙ্গ মানুষের শরীরে যা যা প্রয়োজন তার আয়োজন শুরু হতে থাকে। এইসঙ্গে জীবিত মানুষের যা সবচেয়ে বড় প্রয়োজন, খাবার সংগ্রহের চেষ্টা, ওই ক্ষুদ্র শরীরটিতে দেখা গেল। মায়ের শরীরের রক্তে খাদ্যবস্তু আছে, অক্সিজেন ও জল আছে। এ সবই ট্রকোব্লাস্ট হজম করে রক্তবাহের মাধ্যমে ভ্রূণের শরীরে পৌঁছে দেয়। এই খাবার হজম হয়ে যাওয়ার পর বর্জ্য পদার্থ আবার একই প্রক্রিয়ায় মায়ের রক্তে ফিরিয়ে দেওয়া হয় যা তাঁর বৃক্ক এবং ফুসফুসের মাধ্যমে শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। মায়ের রক্ত এই মহান সাহায্যটি করে থাকে বলে শরীর বৃদ্ধি পায় কিন্তু কোন অবস্থাতেই মায়ের রক্ত ভ্রূণের ক্ষুদ্র শরীরে বৃত্তায়িত হয় না।

ইতিমধ্যে শরীরের পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে উঠেছে। পূর্ণ মানুষের চেহারা পেতে এই পরিবর্তন অত্যন্ত জরুরী। যখন ট্রকোব্লাস্ট মায়ের শরীরে একটি বাসা তৈরি করছে, ডিম্বকোষের ভেতরের সেল নিজেকে একটি শক্ত ভরাট বল থেকে একটি কাঁপা অঙ্গে রূপান্তরিত করছে। একটি আদিকোষকে দুভাগে ভাগ করে ফেলা হল। নিচের অংশটি অপেক্ষাকৃত শূন্য, কুসুমের অধিষ্ঠান। ওপরের অংশটি জলে পরিপূর্ণ থাকে ভ্রূণকে ঘিরে। যেন জলের জ্যাকেটে সেটি ভাসে এবং যে কোন আঘাত থেকে বাঁচতে সাহায্য করে। নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হওয়া মাত্র শরীর তৈরির কাজ দ্রুত লয়ে শুরু হয়ে যায়।

সতেরো দিন থেকেই হৃদযন্ত্রের কাজ শুরু হয়ে গেছে। একই সঙ্গে নার্ভাস সিস্টেম সক্রিয় হয়েছে। ক্ষুধার নিবৃত্তি করা হয়েছে। পঁচিশ দিনের মাথায় সেটি একটি ছোট্ট শরীর যার আয়তন এক ইঞ্চির দশ ভাগের এক ভাগ, মাথা লেজ এবং পেটের সমষ্টি। হাত পা মুখ অথবা ঘাড় তখন অনেক দূরে। সুতরাং তার হৃদযন্ত্র মস্তিষ্কের কাছাকাছি। এই সময় থেকেই তার ফুসফুস এবং বৃক্ক রূপ পেতে থাকে। পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে ভ্রূণের চেহারা এক ইঞ্চির চারভাগের এক ভাগ হয়ে গেল। তখন তার শরীর প্রায় গোলাকার ভঙ্গিতে রয়েছে এবং পেটের নিচে ছোট্ট লেজ, শরীরের দু'পাশে একটু বাড়তি কিছু। মাথায় এর পরে দুটো গর্তের আকারে চোখের জন্ম হল যা মস্তিষ্ক-নালির থেকেই বেরিয়েছে। চোখের খুব কাছেই কান তার আদল নিতে শুরু করেছে। নাক মাথা চাড়া দিচ্ছে। এই পাঁচ সপ্তাহে সে একটি ডিম থেকে মানুষের শরীরের রূপান্তরের যাত্রা সম্পূর্ণ করে ফেলল।

দ্বিতীয় মাসে তার মুখাবয়ব আদল পেতে লাগল। মুখ, মাড়ি, ঘাড়, কপাল তৈরির মাস এটি। তৃতীয় মাসে সে পুরুষের আকৃতি পেল। এটি লিঙ্গ নির্ধারণের সময়। চতুর্থ মাসে তার দৈর্ঘ ছয় থেকে আট ইঞ্চি, অর্থাৎ জন্মের সময় শিশুর যা দৈর্ঘ তার অর্ধেক। এই সময় থেকে শরীর তৈরির কাজকর্মগুলোয় একটু ঢিলেমি আসে। এখন তার হাত পা পূর্ণ অবয়ব পেয়েছে যদিও নখের জন্ম হয়নি। পাঁচ মাসে চুল নখ এবং চামড়ার বৃদ্ধি দেখা গেল। শরীর যখন ছয় মাসের আয়ু পেল তখন চোখের পাতা এবং দৃষ্টিশক্তির সঞ্চার শুরু হল। সপ্তম মাসে মস্তিষ্কের পূর্ণতা এল।

নবম মাসে সে পূর্ণ মানুষ। তার প্রতিটি অঙ্গ এখন সুগঠিত। তার বোধ এখন জাগ্রত। এই অন্ধকার ক্লেদাক্ত গুহায় সে আর থাকতে চাইছে না। সে

তার দুটো হাত এবং পা ছুঁড়ে প্রায়শই বিক্ষোভ জানাচ্ছে। এতেও কাজ হচ্ছে না বলে নিজের অবস্থানের পরিবর্তন করছে। যেটুকু সময় সে ঘুমায় সেটুকু সময় মায়ের শরীর শান্ত থাকে। যখন সে জেগে ওঠে তখনই বিক্ষোভ শুরু হয়ে যায়। বিধাতাপুরুষ বলেছিলেন ভূমিষ্ঠ হওয়ামাত্র তাঁর সঙ্গে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। যাক। সেই অন্ধকার পূতিগন্ধময় জলাশয়ে হাঁসফাস করতে করতে সে বিধাতাপুরুষের কাছে অনুনয় করে মুক্তির সময় ত্বরান্বিত করতে। বিধাতাপুরুষ হাসেন, 'এত তাড়া কেন ?'

'আমি আর এখানে থাকতে পারছি না।'

'কেন ? নয় মাস তো বেশ ছিলে।'

'তখন আমার বোধ ছিল না। আমার চারপাশে অন্ধকার। আমি আলো চাই। আমার চারপাশে ক্লেদাক্ত জলরাশি, আমি সহ্য করতে পারছি না। তা ছাড়া আমার ভয় করে।'

'কিসের ভয় ?'

'যাঁর শরীরে আমি তাঁর ইচ্ছায় আমার অস্তিত্ব বেঁচে আছে।'

'এতদিন তো তাই ছিলে।'

'হ্যাঁ। কিন্তু তাঁর যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে, তার অবহেলা যদি আমার শরীরে আঘাত করে, আঃ, আমি ধ্বংস হয়ে যাব।'

'কিন্তু তুমি যেখানে যেতে চাইছ সেই জায়গা তুমি জানো না। হয়তো এর চেয়ে সহস্রগুণ পূতিগন্ধময় হতে পারে, লক্ষ গুণ ক্লেদাক্ত, অনেক অন্ধকার।'

'হোক। সেই জায়গা আমি চোখে দেখিনি, বাস করিনি। এখানে আমি আর থাকতে পারছি না। বোধহীন অবস্থায় যা মেনে নেওয়া যায় বোধ এলে তা অসহ্য হয়ে দাঁড়ায়। আমায় মুক্তি দিন।'

'বেশ। তুমি মুক্তি পাবে। তবু আরও কিছুদিন সময় লাগবে। তোমার শরীরের শেষ কাজগুলো এই সময়ে সম্পন্ন হবে। তোমার সৌন্দর্যের পরিপূর্ণতার জন্যে শেষ তুলির টান।'

শেষ পর্যন্ত সেই মহালগ্ন এল। মাধ্যাকর্ষণ শক্তি তাকে নিম্নমুখী করল। তার মাথা নিচের দিকে চলে এল। মায়ের শরীরকে আঘাত করতে করতে সে তার যাত্রাপথ প্রশস্ত করতে লাগল। মা বেদনার্ত হলেন। প্রথম দিকে দশ মিনিট থেকে আধ ঘণ্টা অন্তর, পরের দিকে সেটি দু-তিন মিনিট এসে পৌঁছাল। শেষ পর্যন্ত যে জলাশয়টি তার চারপাশে ছিল তা ভেঙে যেতে পথ পিচ্ছিল হল। তার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত হল ভূমিষ্ঠ হবার সময়। এত দিন তার ফুসফুস অকেজো ছিল। চুপসে থাকা বেলুনের মত। তার মায়ের শরীর থেকেই অক্সিজেন পেত সে। জন্মানো মাত্র তার রক্ত ফুসফুসে পৌঁছালো। ঠিক যেভাবে আকাশ থেকে প্যারাসুট নিয়ে ঝাঁপ দেবার পর সেটি খুলে যায় ছাতির মত তেমনি ফুসফুস কাজ শুরু করে। যদি কোন কারণে প্যারাসুট না খোলে তা হলে এত দিনের সব আয়োজন বৃথা হয়ে যায়। ফুসফুস চালু হল। তার জন্মসূত্র বিচ্ছিন্ন করা হল। জন্মমাত্র তাকে সক্রিয় করার জন্য দুই পা উঁচুতে রেখে মাথা নিম্নমুখী করে কাঁদানো হল। তার জীবনের প্রথম কান্না জীবন শুরুতেই। সেই কান্না তার অস্তিত্বের প্রমাণে

সবাইকে সাহায্য করল। সবাই তৃপ্তির হাসি হাসল।

এই সময় আচ্ছন্নের সময়। এতকাল তার শরীরে আলো লাগেনি, কোন তাপ স্পর্শ করেনি। তার শরীরের কাঁচা চামড়ায় তাই কাঁপুনি আসছে বারংবার। তাকে পরিষ্কার করে শুইয়ে দেওয়া হল আরামপ্রদ জায়গায়। তার দুই হাতের আঙুল মুঠো করা, চোখের পাতা বন্ধ। ঈশ্বরের সঙ্গে তার আর কোন সংযোগ নেই, পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে কোন যোগাযোগ তৈরি হয়নি। সে নির্বিকার, জ্ঞানহীন ঘুমে অচেতন হয়ে রইল দীর্ঘযাত্রার শেষে। দীর্ঘযাত্রার শুরুতেও।

ষষ্ঠী

এখন ঘুম, শুধুই ঘুম। জলের বেলুন থেকে বেরিয়ে মুক্ত হয়ে শুয়ে থাকা। পা থেকে মাথা এখন প্রায় সরলরেখায়। পৃথিবীর তাপ, হাওয়া শরীরে লাগামাত্র চামড়ায় কুঞ্চন জাগছে, সর পড়ছে। এই নতুন পরিবেশে শরীর নিজেকে মানিয়ে নিতে চাইছে ঘুমের মধ্যে। অতীতের সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, বর্তমান সম্পর্কে চৈতন্যরহিত, ভবিষ্যৎ বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব তার জানা নেই।

এই ঘুম শক্তি সঞ্চয়ের ঘুম, মানিয়ে নেওয়ার ঘুম। এই প্রথম অক্সিজেন সরাসরি যাচ্ছে তার শরীরে। ফুসফুস ক্রমশ স্বাভাবিক আচরণ শুরু করেছে। কিন্তু এ সব তার জানার কথা নয়। তার শরীর আছে কিন্তু বোধ তৈরি হয়নি। কয়েক ঘণ্টা এভাবে গড়াতে ব্যতিক্রম ঘটতে লাগল। মায়ের শরীর তাকে যা যা যোগান দিত তার একটির অভাব যখন প্রকট হল তখন তার শরীরে বিক্ষোভ দেখা দিল। পেটে ঈষৎ সঙ্কোচন শুরু হল এবং শরীর কাঁপিয়ে শব্দ ছিটকে বেরুলো মুখ দিয়ে। তার রক্ষণাবেক্ষণের ভার ছিল যাঁর ওপর তিনি সেই শব্দ শুনে হাসলেন। একটা নির্দিষ্ট সময় অতিক্রম করে গেছে শরীরটা, তাই ঈষৎ জল যা খুবই পরিশ্রুত তার মুখে ঢেলে দিলেন।

মুখের ব্যবহার তার জানা নেই। জিভ এই প্রথম কোন বস্তুর সন্ধান পেল। দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় চেষ্টায় জিভ সেই জল খাদ্যনালী দিয়ে শরীরের ভেতরে পাঠিয়ে দিয়ে অদ্ভুত শান্তি পেল। শরীরের বিক্ষোভ আবার প্রশমিত হতেই সে অসাড়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

ছত্রিশ ঘণ্টা কেটে গেল এইভাবে। মাঝে মাঝেই তার গলা থেকে কান্না ছিটকে আসে, ঘুম ভেঙে যায় আর তাকে শান্ত করতে কয়েক চামচ জল দেওয়া হয়। এই জল শরীরের ভেতরের যন্ত্রপাতিকে সক্রিয় হতে সাহায্য করছে। করে আবার শরীর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। তার শরীর এমন কিছুই পাচ্ছে না যা ভেতরে ধরে রাখতে পারে।

প্রসব হয়েছিল স্বাভাবিক ভাবেই। যেটুকু কষ্ট মা হতে গেলে না পেলে নয় তার বেশি পায়নি পারমিতা। ঘণ্টা ছয়েক কেটে যাওয়ার পর সে কিছুটা

স্বাভাবিক। সমস্ত শরীর টাটিয়ে আছে কিন্তু যন্ত্রণা নেই। তলপেট থেকে দুই উরুতে অস্বস্তি। প্রসবের পর সে শুয়ে আছে সাদা বিছানায়, গলা থেকে পা পর্যন্ত মোটা চাদরে শরীর ঢেকে। তাকে, এবং সদ্যজাতককে দেখতে এসেছিল প্রবাল, আত্মীয়স্বজনেরা। তবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে নবজাতক। তাকে নিয়েই সকলের উচ্ছ্বাস। শুধু একফাঁকে একটু নিরিবিলি পেয়ে প্রবাল তার হাত ছুঁয়ে জিজ্ঞাসা করেছে, 'কেমন লাগছে ? কষ্ট হচ্ছে ?'

পারমিতা লজ্জিত হাসি হেসে নীরবে মাথা নেড়ে না বলল।

'ডাক্তার বলছেন পরশু ছেড়ে দেবেন।'

খুশি হল পারমিতা, 'তুমি খুশি ?'

'হুম্।' প্রবালের সদ্য বাবা হওয়া মুখে ঈষৎ রঙ লাগল।

তারপর দেখার সময় শেষ হয়ে গেলে চাদরের তলায় শুয়ে পারমিতা চোখ বন্ধ করল। হায় ভগবান। এত লোক এল আর সে শুয়ে রইল শরীরে একটা সুতোর বাঁধন না নিয়ে। কিন্তু সেইরকম লজ্জা তো লাগেনি। মা হয়ে গেলে অনেক কিছু পাল্টে যায় ? অন্য সময়, এই দশ মাস আগেও সে কি এমন ভাবে শুয়ে থাকতে পারত ? আর তখনই কান্নাটা কানে এল। খুব হকচকিয়ে গেল সে। পারলে উঠে পড়ত। কিন্তু তার আগেই নার্স ছুটে এলেন। ছোট্ট বাচ্চার সামনে পৌঁছে তিনি হাসলেন, 'বাঃ, এর মধ্যেই খিদে পেয়ে গেল ?'

'কি খাওয়াবেন ?' দুর্বল স্বরে জিজ্ঞাসা করল পারমিতা।

'কিস্যু না। শুধু জল।' নার্সের পেশাদারী গলা শুনে বড্ড খারাপ লাগল তার।

ঠিক জন্মাবার পরে যখন সব কিছু এলোমেলো তখন তাকে বলা হয়েছে, 'ছেলে হয়েছে আপনার, এই দেখুন, খুব ভাল স্বাস্থ্য।' সে অস্পষ্ট কিছু দেখেছিল। কিন্তু তারপর আর কেউ ও কথা বলেনি। নার্সিংহোমের এই ঘরে তারা শুয়ে আছে, এখনও ভাল করে দেখা হয়নি। কিন্তু কান্না থামল। কান খাড়া করে শুয়েছিল পারমিতা। নার্সকে ফিরতে দেখে জিজ্ঞাসা করল, 'এখন কি করছে ও ?' 'কি আবার করবে ? ঘুমাচ্ছে।' নার্স চলে গেলেন।

ছত্রিশ ঘণ্টা বাদে ভরদুপুরেই স্নান করে পারমিতা তৈরি। শাড়ি জামায় স্বচ্ছন্দ। এর মধ্যে অনেকবার সন্তানকে দেখা হয়ে গেছে। কি রকম অসহায় হয়ে পড়ে আছে বেচারি। এত বড় শরীরটাকে সে পেটের ভেতরে বহন করেছিল এতকাল তা ভাবতেই পারছিল না সে। এবার নার্স এলেন, 'এখনও দু ঘণ্টা আছে, যাওয়ার জন্যে এত ব্যস্ত কেন ?'

জবাবে পারমিতা শুধুই হাসল।

'ব্রেসিয়ার পরেছেন ?'

এমন উদ্ভট প্রশ্ন শুনবে আশা করেনি সে। এই নার্সটির মুখ খুব আলগা। যেদিন যন্ত্রণা নিয়ে ভর্তি হয়েছিল সেদিন নার্সটি বলেছিলেন, 'কি করবেন ভাই, কষ্ট তো করতেই হবে। ভগবান মেরে রেখেছেন আমাদের। তেনারা ফুর্তি করে খালাস, গায়ে হাওয়া দিয়ে ঘুরে মরবেন, আর মরতে মরণ

সানাইওয়ালার।'

ব্যথাটা তখন একটু কম ছিল। তাই প্রশ্ন না করে পারেনি পারমিতা, 'মানে?'

'সানাইওয়ালার গল্প জানেন না?'

মাথা নেড়ে না বলেছিল সে।

'রাজসভায় বাজনা বাজাতো নানান যন্ত্রীরা। কেউ ঢাক, কেউ ঢোল, কেউ সানাই, কেউ করতাল। একবার কি কারণে রাজামশাই-এর মেজাজ খুব খারাপ ছিল। যন্ত্রীরা খবরটা জানত না। রাজামশাই রাজসভায় ঢুকতেই প্রতিদিনের মত তারা বাজনা বাজাতে লাগল। সেই শব্দ শুনে রাজামশাই-এর খারাপ হওয়া মেজাজ আরও খারাপ হল। তিনি হুকুম দিলেন, 'দাও শাস্তি। যার যার যন্ত্র তার তার পশ্চাৎদেশে ঢুকিয়ে দাও।'

আদেশ শুনে ঢাকি হাসছে, ঢোলওয়ালা খুশি, করতালবাদক নিশ্চিন্ত শুধু সানাইওয়ালা ছুটে গেল রাজামশাই-এর সামনে। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে বেচারা কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'রাজামশাই, এ কি রকম বিচার?'

রাজামশাই অবাক হলেন, 'কেন? কি হল?'

'ওদের যন্ত্র বড় বলে বেঁচে গেল আর মরতে মরণ সানাইওয়ালার?'

ওই অবস্থাতেও না হেসে পারেনি পারমিতা। সত্যি, প্রবালকে তো কোন কষ্টই ভোগ করতে হয়নি। ছয় মাসের পর এটা করো না ওটা করতে নেই শুনে শুনে কান ঝালাপালা। তারপর শরীরটার যা অবস্থা হয়েছিল? উঠতে বসতে শুতে স্বস্তি নেই। নিজেকেই যেন চেনা যায় না।

নার্স সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, পারমিতা জিজ্ঞাসা করল, 'কেন বলুন তো?'

'এখন কদিন ওটা পরবেন না। পাশ ফিরে শুয়ে পড়ুন।'

'কেন?'

'আরে বাবা এখন আপনার ব্রেস্টে মিল্ক আসছে। চেপে রাখা ঠিক নয়।' বলতে বলতে কট্ থেকে শিশুকে তুলে চাদরে মুড়ে নিয়ে এলেন পারমিতার সামনে, 'খুলে ফেলুন।'

'কেন?' পারমিতার খুব ভয় করছিল নার্সের ধরার ধরণ দেখে। পড়ে না যায়!

'আপনাকে দেখিয়ে দিই কি করে দুধ খাওয়াবেন? বাচ্চা খেতে চাইলেই খাওয়াতে হবে তার কোন মানে নেই। সবসময় অল্প অল্প করে দেবেন। ব্রেস্টে বেশি দুধ জমে গেলে পাম্প করে বের করে দেবেন। ওভার ফিডিং যেন না হয়। খুলুন। এই সময় লজ্জার কিছু নেই।'

অতএব উর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত করতেই হল। এখন বক্ষ স্ফীত এবং ভারি। বৃন্ত শক্ত এবং সামান্য সিক্ত। নার্স বললেন, 'এই তো, একে বলে কোলোস্ট্রাম। সাধারণত দু-তিন দিন পর থেকেই মিল্ক আসে। একে এভাবে শোওয়াবেন। আপনি শোবেন এর দিকে পাশ ফিরে। একটুও যেন চাপ না লাগে ওর শরীরে। বুঝতে পারছেন?'

বাধ্য ছাত্রীর মত মাথা নাড়ল পারমিতা।

খাটে শোওয়াবার পরও নেতিয়ে ছিল সে। যেহেতু শরীর শক্তিহীন,

বোধহীন তাই নিজের অবস্থান সম্পর্কে কোন চৈতন্য নেই তার। হঠাৎ তার ঠোঁটে চাপ লাগল। মুখ ফিরিয়ে নেবার চেষ্টা করল। কিন্তু চাপটা জিভ পর্যন্ত পৌঁছালো। এবার নিঃশ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম। সে চাপটাকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করল প্রাণপণে। এবং সেটা করতে গিয়েই তার জিভ ভিজে গেল। জলের স্বাদে সে এখন কিছুটা অভ্যস্ত, এই স্বাদ তার থেকে লক্ষগুণ আলাদা। অনেক মধুর। সে তৎক্ষণাৎ সেই অমৃত গলাধঃকরণ করল। দুবার, তিনবার। তারপরেই শরীরে আরাম ছড়িয়ে পড়ে ঘুম, শুধুই ঘুম।

পারমিতা দেখল আর টান নেই। বাচ্চার চোখ বন্ধই ছিল, এখন আরও স্থির। সমস্ত শরীরে এক অদ্ভুত শিহরন ছড়িয়ে পড়েছে ততক্ষণ পারমিতার। এই অনুভূতির সঙ্গে এতদিনকার কোন অভিজ্ঞতার তেমন মিল নেই। সেই কৈশোরের শুরুতে শরীরে পরিবর্তন আসা শুরু হলে নিজেকে নিয়ে যে বিব্রত হওয়ার পালা শুরু হয়েছিল, নিজের শরীরটাকে আড়াল করে রাখার মানসিকতা তৈরি হয়েছিল তার অনেকটাই ভেঙে দিয়েছিল প্রবাল। সেই বিস্ফোরণে ক্রমশ অভ্যস্ত হওয়া পারমিতা জেনে নিয়েছিল যে ওই অনুভূতি ওই অভিজ্ঞতা শুধু প্রবালের সংস্পর্শেই সম্ভব হতে পারে। কিন্তু আজ তৃতীয় একটি মানুষ যেন তার সমস্ত শিকড় ধরে নাড়া দিল ওই কয়েকটি মুহূর্তে যা এতদিনে প্রবাল পারেনি। ওই নরম তুলতুলে দুর্বল ঠোঁটেই তার শরীর এবং মনের প্রতিটি কোষে অদ্ভুত সুখের বোধ ছড়িয়ে দিল আচম্বিতে। পারমিতা চোখ বন্ধ করে শুয়েছিল।

নার্স হাসলেন, 'ঠিক আছে, এবার উঠে পড়ুন। হ্যাঁ, দেখবেন নিপ্‌লে কোন ইনফেকশন না লাগে। বাচ্চাকে খাওয়াবার আগে সব সময় অ্যালার্ট থাকবেন। এখন থেকে আপনিই ওর জীবনদাত্রী। বুঝেছেন?'

ত্রস্তে সোজা হয়ে বসে উল্টোদিকে ফিরে জামা ঠিক করেছিল পারমিতা। এতক্ষণ নিজের শরীর সম্পর্কে যে শৈথিল্য এসেছিল তা এক ঝটকায় কাটিয়ে উঠল।

এখন তার বয়স সাতদিন। ঘুম এখনও তাকে ছাড়ছে না, সেইসঙ্গে খিদে। ঘুম যখন থাকে না তখনই খিদেটা খোঁচা মারে। আর সেই অবস্থায় সে একটু করে জানছে চিৎকার করতে হয়। চিৎকার যে কান্নার মতো শোনায় তা সে জানে না। মুখ হাঁ করে দুই হাত এবং পায়ে বিদ্রোহ এনে শব্দ করলেই সেই দুগ্ধ তার ঠোঁটের সামনে ধরা হয়। আহা, কি তৃপ্তি। এই তৃপ্তির ব্যাপারটা সে এতদিন জেনে গিয়েছে। নরম দুটো ঠোঁটে ঈষৎ শক্তি এসেছে। তাই দিয়ে প্রাণপণে সে সুধারস টেনে নিতে চায়। তার চোখে এখনও দৃষ্টি আসেনি কিন্তু চোখের পাতা ক্যামেরার শাটারের মত ওঠা পড়া করে। কিন্তু তার ঠোঁটে এবং জিভ পৃথিবীর একটি মাত্র বস্তুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়ে গিয়েছে। খিদে পেলেই তার সন্ধান ছাড়া সে আর কিছুই বোঝে না।

শরীর যেমন নিচ্ছে তেমনি অসাড়ে তার অনেকটাই বের করে দিচ্ছে। প্রস্রাব এবং বিষ্ঠা যখন শরীর থেকে বেরিয়ে আসে তখন সে একধরনের সংকোচন বোধ করে। একটু স্ফীত হয় তার নবীন নার্ভগুলো। এবং সেগুলো বার করে দিয়েই শরীরে একধরনের আরাম ছড়িয়ে পড়ে। গ্রহণ এবং বর্জনের

মধ্যে কোন আরামটা সুখকর তা বোঝার মত অনুভূতি তার তৈরি হয়নি। যখন সে ঘুমোয় তখন সে নিশ্চিন্ত যখন জাগে তখন তার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা সেই সুধাভাণ্ড খুঁজে পাওয়া যার জন্যে ধুন্ধুমার কাণ্ড বাধিয়ে দিতে পারে।

একটু একটু করে তার দৃষ্টিশক্তি এল। চোখের পাতা সক্রিয় হল এবং মানুষবিচার করতে শিখল। যে তাকে জীবনশক্তির যোগান দেয়, যে কাঁদামাত্র ছুটে এসে তাকে তুলে ধরে তার সঙ্গে অন্য মানুষের পার্থক্য বুঝতে পারল ধীরে ধীরে। প্রবাল তাকে খিদের সময় তুলে ধরলে তাই সে শান্ত হয় না। বৃদ্ধ সুধাময় ছুটে এসে চুক চুক করলেও সে চিৎকার থামায় না। এমনকি বৃদ্ধা মনোরমা এসে সযত্নে 'কি হয়েছে কি হয়েছে' বলে কোলে তুললে দু-এক মুহূর্তের ধন্ধ কাটিয়ে দ্বিগুণ শব্দ ছুঁড়তে থাকে। অসহায় মনোরমা যিনি প্রবালের জন্মদাত্রী গলা তুলে পারমিতাকে ডাকেন, 'কোথায় গেলে? তাড়াতাড়ি এসো, বেচারার খিদে পেয়েছে।'

পারমিতা আসে এখন স্থির পায়ে। চাপা গলায় বলে, 'কি রাক্ষুসে খিদে রে বাবা'

মনোরমা বলেন, 'ছিঃ ওভাবে বলতে নেই।' তারপর হাসেন, 'ঠিক বাপের ধরন পেয়েছে। খিদে পেলে সে এমন কাণ্ড করত।'

এখন পারমিতা অনেক সহজ। মা হবার সুবাদে তার অনেক সঙ্কোচ একটু একটু করে সরে গিয়েছে। একমাত্র শ্বশুর ছাড়া শিশুকে দুগ্ধদান করতে তেমন সঙ্কোচ হয় না শাশুড়ি অথবা প্রবালের সামনে। অবশ্য ওই দুজন যদি একা থাকে তবেই। মা হবার প্রাথমিক জড়তা কেটে যাওয়ার পর সে এখন শিশুর ব্যাপারে অনেক আপাত উদাসীন ব্যবহার করতে পারে। তবে এই বড় ফ্ল্যাটের যেখানেই সে থাকুক না কেন তার একটা ইন্দ্রিয় যেন শিশুর কাছেই রেখে যায়। এই নিয়ে প্রবাল তার সঙ্গে অনেক রসিকতা করেছে। মাঝে মাঝে অভিমানও। পারমিতা হেসেছে। হঠাৎ যেন সে অনেক পরিণত হয়ে উঠেছে। এখন মাঝেমাঝেই সে প্রবালের মধ্যে একটা ছেলেমানুষকে দেখতে পায়। দেখে মজা পায়। প্রবাল আক্ষেপ করে বলে, 'মা হবার পর তুমি কি রকম বদলে গেছ। ধুত্তোরিকা।' পারমিতা হাসে কিছু বলে না। নিজের কাছেও সে অস্বীকার করতে পারে না, এইভাবে কোন মানুষকে সে কখনই ভালবাসতে পারেনি।

এখন তার শরীর বেশ পরিণত। প্রথমদিন যখন কাত হতে পারল তখন বিরাট খাটটার আশে পাশে কেউ ছিল না। কাত হতেই নিজেই অবাক, আর একটু টানতেই উপুড় হয়ে গেল সে। এবং তখনই ভয় এল। বুকে পেটে চাপ লাগছে। এতদিন যে চিৎ হয়ে পৃথিবীটাকে দেখত। যেসব মানুষ তার কাছে আসত তাদের মুখ নিচ থেকে দেখতে অভ্যস্ত ছিল। এখন হঠাৎই সে ওপর থেকে নিচের দিকে তাকিয়ে বিভ্রান্ত হল। এই দেখায় অভ্যস্ত না থাকায় সে চিৎকার করে উঠল। এতদিনের কান্না আসত খিদের কারণে, আজ ভয়ে। এই অনভ্যস্ত ভঙ্গিতে সে হাত পাও ছুঁড়তে পারছিল না।

চিৎকার শুনে ছুটে এলেন মনোরমা। নাতিকে ওই অবস্থায় দেখে তিনি

আনন্দে আটখানা। তখনই চেঁচামেচি শুরু করে দিলেন। স্বামী এবং বউমাকে ডাকতে লাগলেন। শিশু কেঁদে যাচ্ছে। সবাই দৌড়ে কাছে এসে দৃশ্যটি দেখল। নাতি নিজে নিজে উপুড় হতে পেরেছে বলে সুধাময় বললেন, 'সাবাশ।' মনোরমা কোলে তুলে নিতে কান্না থামল না, সচরাচর থামে না। পারমিতার মুখে একটু গর্বের ছোঁয়া। এই প্রথম ছেলে খিদের জন্যে কাঁদল না। কিন্তু সবাই খুব সমস্যায় পড়ে গেল। একবার যখন উপুড় হতে শিখেছে যখন আর খাটের একটা জায়গায় স্থির হয়ে পড়ে থাকবে না। ও এখন বুকে হাঁটবে। অতএব কেউ কাছে না থাকলে খাট থেকে দুর্ঘটনা ঘটতে কতক্ষণ। অতএব খাটের চারপাশে বেড়া দেওয়া দরকার। একদিকের বেড়া সরিয়ে প্রয়োজনের সময় খাটে ওঠা যাবে। সুধাময় পারলে তখনই মিস্ত্রি ডেকে আনেন। শিশু এসবের কিছুই জানল না। সেই বিকেলেই সে দ্বিতীয়বার উপুড় হয়ে সবাইকে একজায়গায় জড়ো করল। দ্বিতীয়বারে তার ভয় কিছুটা কমেছে। পৃথিবীকে ওপর থেকে দেখার মজা পেতে শুরু করেছে সে। কিন্তু ওইটুকুই।

এই ফ্ল্যাটের চারটি মানুষের মনে পরস্পরের সম্পর্কে ভালবাসা আছে। সম্পর্ক তাই চমৎকার। সেইসঙ্গে আধুনিকতার ছোঁয়াও। সুধাময় নিজে দোকান থেকে চাইল্ড কেয়ার জাতীয় বই কিনে এনে দিয়েছেন পারমিতাকে। একদিন এক শিশুরোগের বিশেষজ্ঞকে ডেকে এনে দেখিয়েছেন সাড়ে সাত পাউন্ড শরীর নিয়ে যে পৃথিবীতে এসেছিল সে ঠিকঠাক বড় হচ্ছে কিনা। ভদ্রলোক ওঁদের নিশ্চিত করেছিলেন কিন্তু সেইসঙ্গে বলে গিয়েছেন ওই বাড়ের সময় মাতৃদুগ্ধই শিশুর একমাত্র খাদ্য হতে পারে না। তিনি আহার্যের তালিকা তৈরি করে দিয়ে গেছেন।

রাত্রে প্রবাল বলল, 'তুমি এবার ব্রেস্টমিল্ক দেওয়া বন্ধ কর।'

পারমিতা হাসল, 'কেন ?'

প্রবাল গম্ভীর হয়ে বলল, 'দুটো কারণে। প্রথমটি তো ডাক্তারের মুখেই শুনেছ। ইটস নট সাফিসিয়েন্ট। কোথায় যেন পড়েছি সার্টেন উইকের পর বাচ্চার দাঁতের পক্ষেও ক্ষতিকর। আর দ্বিতীয়ত, তোমার পক্ষেও।'

অবাক হল পারমিতা, 'মানে ?'

প্রবাল হতাশ ভঙ্গীতে বলল, 'এই জন্যেই বাঙালি মেয়েদের কিস্যু হল না। এককালে বলত কুড়িতেই বুড়ি। কেন বলত জানো ? এই বয়সেই তিনটি বাচ্চা হয়ে যেত এবং তারা মায়ের দুধ খাওয়ার সুবাদে বুকটাকে ছিবড়ে করে দিত। বুকের সৌন্দর্য ঠিক রাখার চেষ্টা এদেশের মেয়েরা আগে কখনই করত না। ভগবান আমাদের ওই সৌন্দর্য দেননি তোমাদের দিয়েছেন, সেটা ঠিকঠাক রাখবে না কেন ?'

কথাটা যে পারমিতার মনেও আসেনি তা নয়। ইদানিং শিশুর মাড়ি বেশ শক্ত হয়েছে। তার বুকে চাপ পড়ছে। মাঝেমাঝে ব্যথাও লাগছে। সেই সঙ্গে বিরক্তিও। কিন্তু ওকে দেখলেই মন আনন্দে ভরে যায়। ও যখন হামা দেবার চেষ্টা করে বা খাটের কাছে যেতেই ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে ফিক করে হাসে তখন মনে হয় ওর জন্যে আকাশ ছোঁয়া যায়। কিন্তু প্রবালের কথাগুলো শোনার পর

নিজের দিকে তাকিয়ে অস্বস্তি হতে শুরু করল। প্রবাল বলে নিজেও জানে, সুন্দর সে। এই সৌন্দর্য যখন বয়সের সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হয়ে যাবে তখন আক্ষেপ থাকবে না কিন্তু অকালে নষ্ট করার কোন যুক্তি নেই।

পারমিতাকে না বলেই ডাক্তারের নির্দেশমত সুধাময় কৌটোর দুধ নিয়ে এলেন। মনোরমা বললেন, 'এখনই গরুর দুধ দেওয়া ঠিক হবে না, পেট ছাড়বে। আর খাঁটি দুধ তো পাওয়াই যায় না। বরং কৌটোর দুধ দাও ওকে।'

সেই আয়োজন হল। খিদের কান্না শুরু হলে সযত্নে দুধ তৈরি করে শিশুর মুখে তা ঝিনুক তুলে ফেলে দেওয়া হল সামান্য। জিভ দিয়ে সেটা টেনে নিয়েই থমকে গেল শিশু। তারপর সুড়ুৎ করে বের করে দিল সেটা। যতবার তাকে খাওয়ার চেষ্টা করা হল ততবার একই বিদ্রোহ। এবং সেইসঙ্গে কান্না। বাধ্য হয়ে জামার বোতাম খুলতে হল পারমিতাকে। আর সেই পরিচিত স্পর্শ পাওয়ামাত্র শিশু পুলকিত। মনোরমা ডাক্তারকে টেলিফোন করলেন। নির্দেশ শুনলো। তারপর হাসিমুখে বউমার ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন, 'ডাক্তার বললেন অত মায়া করলে হবে না। খিদের নাম বাবাজী। খিদে পেলে আপসেই খাবে।' পারমিতার কানে কথাগুলো খুব নিষ্ঠুর শোনাল। সে কিছু বলল না।

এখন সে সহজেই উপুড় হয়। দু পা পেছনে ঠেলে বুকে হাঁটার চেষ্টা করে। তার দৃষ্টিতে রঙের তারতম্য বোঝার ক্ষমতা আসছে। সে স্পর্শ বুঝতে পারে। ঘুমের সময় পারমিতা বা মনোরমার স্পর্শে সে চুপচাপ থাকে কিন্তু প্রবাল বা সুধাময় তাকে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করলেই আপত্তি জানায়। এমনকি ঘুমের মধ্যেও মাঝে মাঝে পার্থক্য সে ধরে ফেলে। এরই সঙ্গে আর একটি অনুভূতি জোরদার হয়ে উঠেছে ওর। সেটা গন্ধ। মায়ের গায়ের গন্ধ তার ভীষণ পরিচিত। যখন তার দৃষ্টি ভাল করে আসেনি তখন থেকেই এই অনুভূতিটা জন্ম নিয়েছিল। এখন চোখ বন্ধ অবস্থায় নিজের মাকে আলাদা করে চিনে নিতে একটুও দেরি হয় না তার।

দুপুরের পর মনোরমা তাকে একটু সাজিয়ে দিলেন। এখন দুধ খাওয়ার সময়। খুব যত্নের সঙ্গে গুনগুনানি গান শুনিয়ে ঝিনুকে দুধ তুলে মুখে দিতেই আবার বিক্ষোভ শুরু হয়ে গেল। তারস্বরে কান্না। মনোরমা ইশারায় পারমিতাকে ডাকলেন। পারমিতা তৈরি ছিল। শিশু মায়ের কোলে যেতেই চুপ করে গেল। তার মুখ বারংবার দুগ্ধভাণ্ডের সন্ধান করতে লাগল।

এতদিনে সে জেনে নিয়েছে মায়ের কোলে শুয়ে কিভাবে অমৃতের উৎসে পৌঁছাতে হয়। এখন খিদের সময়ে সে সেই চেষ্টা করল। জামা খোলা ছিল। সে সহজেই পরিচিত গন্ধ পেল। সেই সঙ্গে স্পর্শ। চোখ বন্ধ করে অধীর এবং ব্যগ্র ঠোঁট নিয়ে গেল বৃন্তমূলে। সুধার আশায় সেটি চট করে ঠোঁটের ভেতরে নিয়ে আসতেই একটা তীব্র তিক্ত স্বাদ ছড়িয়ে পড়ল মুখে। এমন অনুভূতি তার কখনও হয়নি। এক ঝটকায় মুখ সরিয়ে নিতে মনোরমা হেসে ফেললেন। শিশু জিভ দিয়ে ঠোঁট পরিষ্কার করার চেষ্টা করল। এই মুহূর্তে সে পরিচিত গন্ধ পাচ্ছে না কিন্তু স্পর্শ এবং দর্শনের সুবাদে বুঝতে

অসুবিধে হচ্ছে না যে সঠিক জায়গায় আছে। তবে কেন এমন স্বাদ ? সে আবার সাগ্রহে মুখ বাড়াল। এবার ঈষৎ অমৃতের সঙ্গে সেই তেতো স্বাদ। নাকি এতদিনকার অমৃত আজ তেতো হয়ে গেল। সে মুখ ফিরিয়ে নিল প্রচণ্ড অভিমানে। তার শরীর নিংড়ে কান্না ছিটকে এল। মনোরমা তাকে তুলে নিলেন কোলে, 'আহারে, খুব কষ্ট, দাঁড়াও, তোমাকে ভাল দুধ খাইয়ে দিচ্ছি। ওই দুধ তেতো, বিচ্ছিরি, খেতে নেই।' ঝিনুকে তুলে কৌটোর দুধ নিয়ে এলেন শিশুর ঠোঁটে। সেই দুধের কয়েক ফোঁটা ঠোঁটে পড়তে তিক্ত স্বাদ যেন একটু চাপা পড়ল। শিশু আবিষ্কার করল এতে অন্তত সেই তিক্ততা নেই। খিদের দমকে সে গলাধঃকরণ করে নিল বেশ খানিকটা। জীবনের প্রথম পাঠে যে অমৃতভাণ্ডারের সন্ধান তাকে দেওয়া হয়েছিল, যাতে সে জীবন খুঁজে পেয়েছিল, যাকে আঁকড়ে ধরে সে স্বস্তি পেত, আজ তার মুখে নিমপাতার রস বুলিয়ে দেওয়া হয়েছে একথা তার জানার নয়। সে যখন ঘুমিয়ে পড়ল তখন তার মনের গভীরে একটি স্বপ্নের গাছ শেকড় নামালো। আজ এই মুহূর্তে সে একটি স্বপ্ন দেখছে। একটি বৃন্তের স্বপ্ন। যে বৃন্ত থেকে অমৃতের ধারা বের হয়। সারাজীবন ধরে সে এই একটি স্বপ্ন হয়তো দেখে যাবে। কিন্তু অমৃতের বৃন্তে নিমপাতার রস মধ্যপথেই যে মাখিয়ে দেওয়া হয় এই সত্য জানতে তার একটা জীবন কেটে যাবে।

চারপাশে হৈচৈ, ব্যস্ততা। অনেক মানুষের আনাগোনায় বাড়িটা যে আজ জমজমাট তা সে আন্দাজ করতে পারছে কিন্তু মস্তিষ্ক ধরে রাখার শক্তি অর্জন করেনি। সে আজ জানে না কেন এই বিশাল ফ্ল্যাট বাড়ির ছাদে প্যান্ডেল খাটানো হয়েছে। কিন্তু অনেক মিষ্টি মহিলার কোল তাকে প্রীত করছে। বেশ মজা লাগছে তার। চারধারে হুল্লোড়ে কথাবার্তা, যা সচরাচর এই ফ্ল্যাটে হয় না। এরই মধ্যে পারমিতা তাকে সাজিয়েছে পরিপাটি করে। এই প্রথম পাজামা এবং দামী আদ্দির পাঞ্জাবি পরেছে সে। ইতিমধ্যে বেশ বড় হওয়া চুলগুলোয় ঝুঁটি বাঁধা হয়েছে। সাজাবার সময় পারমিতা হেসে বলেছে, 'আজ আমার টুকলু ভাত খাবে। টুকলু সোনা।' টুকলু শব্দটাকে সে ইতিমধ্যে চিনে ফেলেছে। পারমিতা এবং প্রবাল তাকে ডাকে টুকলু বলে। এই শব্দটি শুনলেই সে ঘাড় ফেরায়, হাসে, ওরাও খুশি হয়। যদিও মনোরমা তাকে ডাকেন গোরা বলে কিন্তু তিনি ক্রমশ হার মানছেন টুকলুর কাছে। সাজগোজের পর সে কোলে কোলে ফিরছিল। এই মুহূর্তে পারমিতার অভাব সে যেন বোধ করছিল না। যার কোলে ছিল সে বলে উঠল, 'কি ভাল ছেলে, একটুও কান্না নেই।' এটা যে প্রশংসার কথা তা সে যেন আন্দাজ করেছে। তাকে কোলে নিয়েছিল যে সে একটু জোরেই চেপে ধরেছিল। নরম বুকের চাপে হাসফাঁস করতেই আর একজন তাকে কোলে টেনে নিল। আলতো করে তাকে ধরে রাখায় সে আরাম পেল। এবং তখনই তার মনে পারমিতার স্পর্শ ভেসে এল।

হঠাৎই যে তাকে কোলে নিয়েছিল সে চিৎকার করে উঠল, 'ও মিতালি, দ্যাখো দ্যাখো, তোমার ছেলে কি করছে। অ্যাই, তুই এত অসভ্য কেন ?'

সবাই এদিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল। টুকলুর হাত মেয়েটির বুকের ওপর। শাড়ি সরিয়ে সে বুকের আড়াল খুলতে চেষ্টা করছে। একজন বলে উঠল, 'এখনই এই, বড় হলে তুই কি হবি রে।'

আবার হাসির ফোয়ারা উঠল। বয়স্কা একজন বলল, 'বেচারার নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে। একটু খাইয়ে দাও পারমিতা।'

'ঘন্টাখানেক আগে ওকে আধবাটি খাওয়ালাম।' পারমিতার খুব খারাপ লাগছিল ছেলের এই আচরণ। সে কপট ধমক দিল, 'এই টুকলু, ভালভাবে থাকো।'

'ওকে তুমি ব্রেস্টমিল্ক দাও না?' প্রৌঢ়া জিজ্ঞাসা করলো।

'না না।' দ্রুত ঘাড় নাড়ল পারমিতা, 'সেটা অনেককাল বন্ধ করেছি।'

'ছাড়াতে পারলে?'

'এমনি হয়নি। নিমপাতা, কুইনাইন মাখিয়ে তবে ছাড়াতে হয়েছে।'

যার কোলে ছিল সে একটু ঠোঁটকাটা। বলল, 'সেইজন্যে এখনও খুঁজে বেড়ায়।'

একজন বলল, 'ছেলে বলে খুঁজছে। মেয়ে হলে খুঁজতো না।'

সঙ্গে সঙ্গে আবার হাসির তুবড়ি ফাটল।

পারমিতার ভীষণ রাগ হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু কিছু করার উপায় নেই।

মনোরমা সমস্ত জোগাড়যন্ত্র করে ফেলেছিলেন। এবার সেখানে ডাক পড়ল। এই উৎসবে পারমিতার ভাই প্রধান ভূমিকায়। সে টুকলুকে প্রথম অন্ন খাওয়াবে। ধুতি পাঞ্জাবি পরে সে আসনে বসে বলল, 'টেবিল চেয়ারে বসে মুখেভাত করা উচিত। আজকাল তো কেউ মাটিতে বসে ভাত খায় না।'

একজন মহিলা বললেন, 'আজকাল ভাই মুখে ভাত দেওয়ারও কোন মানে হয় না।'

মনোরমা আপত্তির ভঙ্গিতে জানতে চাইলেন, 'কেন?'

'বাঃ, তিন মাস বয়স থেকে দুধ ছাড়া যা ওদের গুলে খাওয়ানো হয় টিন থেকে বের করে তাতেই তো ভাত ময়দা রয়েছে।' ভদ্রমহিলা জানালেন।

'তাহোক। দেখে তো আমাদের ভাত বলে মনে হয় না।' মনোরমা যুক্তি দেবার চেষ্টা করে টুকলুকে তার মামার কাছে নিয়ে এলেন।

পারমিতা বলল, 'ওর দাদুকে ডাকবেন না?'

মনোরমার খেয়াল হল। তিনি জিভ কাটলেন, 'সকাল থেকে চারবার বলেছে আমাকে। ভাল মনে করিয়ে দিয়েছ। একজন কেউ ডাকো না ওঁকে।'

ডাকতে হল না। পাশের ঘরে সম্ভবত কান পেতেই ছিলো সুধাময়। দরজায় এসে বললেন, 'কই, আমার দাদুভাই কোথায়? আঃ, কেউ ওকে টোপরটা পরিয়ে দাওনি?

উত্তরের প্রত্যাশা না করে তিনি নিজেই চলে এলেন কাছে। মেয়েরা সরে তাঁকে জায়গা করে দিল। তাঁকে দেখামাত্র টুকলু কোল পরিবর্তন করতে চাইল। মনোরমা ধরে রাখতে আর পারছিলেন না। নাতিকে কোলে নিয়ে খুব খুশি হলেন সুধাময়। বললেন, 'আমার কোলেই থাকুক। তুমি ওকে এভাবেই

খাইয়ে দাও।'

পারমিতার অল্পবয়সী ভাই-এর এমন পরিবেশে স্বস্তি হচ্ছিল না। এই প্রস্তাবে সে সঙ্গে সঙ্গে সায় দিল। টোপর পরানোমাত্র স্থির হয়ে গেল টুকলু। শাঁখ বাজল। তার চোখের সামনে প্রদীপ ধরা হল। আর সুধাময় পকেট থেকে একটা সোনার হার বের করে পুত্রবধূকে বললেন, 'ওর গলায় পরিয়ে দাও তো বউমা।'

পারমিতা প্রতিবাদ করতে চাইল, 'এ কি করেছেন?'

'ঠিক করেছি। আমার নাতি। তোমার ছেলে হতে পারে কিন্তু আমার বংশের উত্তরাধিকারী। এই হার ওর গলায় থাকবে।'

হার পরানো হতেই টুকলু সেটা ধরে টানল। কিন্তু তার নজর তখন সামনে সাজানো বত্রিশটি বাটি থালার দিকে। তাতে নানান ধরনের খাবার সাজানো। মনোরমা এবার একটি ট্রে নিয়ে এলেন টুকলুর সামনে। তাতে একটি কলম, ধান, টাকা, লোহা আর বই সাজানো। সুধাময় বললেন, 'দাদুভাই, হাত বাড়িয়ে একটা কিছু ধরো।'

ট্রেটা এমনভাবে সামনে দোলানো হচ্ছিল যে খাবার থেকে দৃষ্টি সরাতে বাধ্য হল টুকলু। চট করে বাঁ হাত বাড়িয়ে সে লোহার টুকরোটা ধরল। সুধাময় চেঁচিয়ে উঠলেন, 'যাঃ হয়ে গেল। এ ব্যাটা নির্ঘাৎ ইঞ্জিনিয়ার হবে। ইস, আমি ভেবেছিলাম ও কলম ধরবে। পণ্ডিত হবে।'

মনোরমা বললেন, 'আমি ভেবেছিলাম দাদুভাই টাকা ধরবে।'

সুধাময় খিঁচিয়ে উঠলেন, 'তুমি তো টাকা ছাড়া কিছুই ভাবতে পারো না।'

মনোরমা খোঁচাটা আপাতত হজম করলেন। ট্রে সরিয়ে নেওয়া হলে মামাকে বলা হল ভাগ্নের মুখে সামান্য পায়েস তুলে দিতে।

পারমিতার ভাই একটা চামচের অর্ধেক পায়েস তুলে মুখের দিকে নিয়ে যেতেই সে মুখ ঘুরিয়ে নিল। তিন চার বার এই চেষ্টা বিফলে গেলে সবাই মিলে ওকে ভোলাতে চেষ্টা করল। শেষপর্যন্ত সুধাময় বললেন, 'তোমরা এভাবে বলছ বলে দাদুভাই ঘাবড়ে যাচ্ছে। দ্যাখো, আমি বলছি। দাদুভাই, হাঁ করো, ভাত খাবে আজ, দাদুভাই।'

উত্তরে টুকলু ধড়মড়িয়ে তাঁর কোল থেকে নেমে যেতে চাইল মেঝেতে। কি মনে করে সুধাময় তাকে সন্তর্পণে নামিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বত্রিশ বাটি খাবারের সামনে চলে এল ছেলে। বাবু হয়ে বসে দুহাত বাড়িয়ে বাটি থেকে একসঙ্গে খাবার তুলে মুখে ঢোকাবার চেষ্টা করতে লাগল। মনোরমা হাঁ হাঁ করে উঠলেন। সুধাময় বললেন, 'মুখে গেছে, হয়ে গেছে অন্নপ্রাশন।' তারই জন্যে সাজানো খাদ্য সামগ্রীর জন্যে হাত বাড়িয়ে টুকলু আবিষ্কার করল তাকে খেতে দেওয়া হল না। পারমিতা তাকে ছোঁ মেরে কোলে তুলে নিয়ে পা বাড়াল। চিল চিৎকার করেও কারো মন গলাতে পারল না টুকলু। পাশের ঘরে নিয়ে এসে সারা শরীরে এঁটো মাখা ছেলেকে শাসন করতে করতে মুছিয়ে দিচ্ছিল পারমিতা, 'রাক্ষস হয়েছ না? সব খাবে?' সংযম বলে কিছু নেই। বেশি খেলে পেট খারাপ হলে কে সামলাবে।?' কিন্তু এসব কথা ওর মর্মে পৌঁছচ্ছিল না, তার কান্না আরও জোরদার হচ্ছিল। মনোরমা দুধ গুলে নিয়ে

এলেন, 'নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে। খাইয়ে দাও'

রাগত ভঙ্গিতে ছেলেকে দুধ খাওয়াতে বসল পারমিতা। কিন্তু মুখে দুধ দিতেই সে পুচ করে বের করে দিচ্ছে আর সেই অবকাশে কান্না। পাশের ঘর থেকে ভিড়টা তখন এ ঘরে চলে আসছে। অনেকে অনেক রকম স্বরে ভোলাতে চাইছে টুকলুকে। পারমিতা দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'এমন জেদি হয়েছে না ? একটু বড় হলে ঠাস ঠাস করে মারতাম।'

মনোরমা বললো 'ছিঃ আজকের দিনে এসব কথা বলো না।'

'মাথা খারাপ হয়ে যায়।' পারমিতা আবার দুধ খাওয়াতে গিয়ে বিফল হল।

সেই প্রৌঢ়া মহিলা বললেন, 'তোমরা বাবা অনেকেই মাথা খারাপ করে ফ্যালো। আগের দিনে পাঁচ সাতটা বাচ্চা হত। তাদের মায়েরা তো ঠিক থাকত।'

মনোরমা বললেন, 'আমার শাশুড়ির তো আটটি ছেলেমেয়ে।'

পারমিতা চোখ বন্ধ করে বলল, 'তাঁরা দেবীর অংশ।'

সুধাময় দরজায় এলেন, 'কি ব্যাপার ? ওইটুকু বাচ্চাকে শান্ত করতে পারছ না তোমরা ? আশ্চর্য ? মা ঠাকুমা হয়েছ কি করতে ?' তিনি ফিরে গেলেন।

পারমিতা বলল, 'কি করি বলুন তো মা ? আজ ইচ্ছে করে বদমায়েসি করছে। রাগ হয় কিনা বলুন ?'

সেই প্রৌঢ়া উপদেশ দিলেন, 'বুকের দুধ দাও, চুপ করে যাবে।'

মনোরমা মন্তব্য বললেন, 'এখনও সেটা আছে নাকি ?

'এত তাড়াতাড়ি বন্ধ হবার তো কথা নয়।'

হঠাৎ ছেলেকে নিয়ে উঠে দাঁড়াল পারমিতা। তাকে উঠতে দেখে কান্না সামান্য কমল। প্রতিটি ঘরেই আজ অতিথি। সে সোজা বাথরুমে ঢুকে গেল। দরজা এক হাতে বন্ধ করে জামা খুলল, 'খাও, খাও। আমাকে শুষে ছিবড়ে না করতে পারলে তোমার শান্তি নেই। কিকুক্ষণেই যে পেটে ধরেছিলাম।' বলতে বলতে সে হঠাৎ চুপ করে গেল। বহুদিন পরে পরিচিত সুধাভাণ্ড পেয়ে পাগলের মত টুকলু চোখ বন্ধ করে খাওয়া শুরু করেছিল। কিন্তু আস্তে আস্তে ঠোঁটের চাপ কমল। চোখ খুলে গেল। যেন নিজেই বেশ অবাক হয়ে গেছে সে। বৃন্ত থেকে মুখ সরিয়ে অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে আছে সেদিকে। ছেলের চোখে এমন দৃষ্টি কখনও দ্যাখেনি পারমিতা। তার বুকে ইদানীং দুধ বেশি সঞ্চারিত হচ্ছে না তা সে জানে। কিন্তু এমন শূন্য হয়ে গেছে তা সে বুঝতে পারেনি। চটপট নিজেকে ঠিক করে বাথরুমের দরজা খুলল পারমিতা। টুকলু একদম চুপ হয়ে গেছে।

নাম রাখা হল প্রবর। অভিধান ঘেঁটে শব্দটি খুঁজে বের করেছেন সুধাময়। নাম শুনে প্রথমেই আপত্তি করেছিলেন মনোরমা, 'এ কিরকম নাম ? শুনিনি কখনও।'

সুধাময় মাথা নেড়েছিলেন, 'শুনবে কি করে ? একদম আনকমন নাম হবে।'

পারমিতা জিজ্ঞাসা করেছিল, 'মানে কি ?'

'শ্রেষ্ঠ। অত্যুৎকৃষ্ট। ওই যে কথায় বলে ধার্মিকপ্রবর। শুনেছ তো?

মনে ধরেনি পারমিতারও। সে এতদিন ধরে রবীন্দ্রনাথ ঘেঁটে নামের একটা তালিকা তৈরি করেছে। একবার এটা পছন্দ হলে অন্যবার ওটা। প্রবর শব্দটা কেমন খটমটে লাগল তার। প্রবীর নামটি চেনা। কোন চমক নেই। তবু চলে। প্রবর যেন থমকে যাওয়ার মত। কিন্তু একটু আড়ালে প্রবালের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে সে বুঝল প্রতিবাদ করে কোন লাভ হবে না। প্রবাল বলল, 'বাবা নাতির নামকরণ করেছেন, ওটাই থাক। আর সত্যি তো, নামটা তো কমন নয়।'

পারমিতা এতদিন স্বামীর স্বভাব বুঝে গেছে। বাবা মায়ের কোন কিছু যদি ওর অপছন্দও হয় তাহলে মুখের ওপর বলবে না। অনেক রাত্রে সে এই নিয়ে স্বামীর সঙ্গে ঝগড়াও করেছে। প্রবালের একটাই কথা, 'একটু মানিয়ে নাও না বাবা, বয়স হয়েছে আর কতদিন থাকবেন?' মাঝে মাঝে এইসব কথা শুনলে স্বামীর সম্পর্কে খারাপ ধারণা তৈরি হয়। সুধাময় এখন আটষট্টিতে। আজকাল আশি পর্যন্ত অনেকেই ঠিক-ঠাক বেঁচে থাকেন। অতএব বয়স দেখিয়ে অজুহাত তৈরি করা বোকামি।

কিন্তু একথা প্রবালকে বলে কোন লাভ নেই। অতএব টুকলুর পোশাকি নাম হয়ে গেল প্রবর। বাপের সঙ্গে প্রাথমিক মিলও থাকল।

আজ প্রবর প্রথম স্কুলে যাচ্ছে। এই নিয়ে বাড়িসুদ্ধু সবার খুব ভয় ছিল। যা জেদী ছেলে একবার যদি বেঁকে বসে তাহলে ওকে নিয়ে কে স্কুলে যাবে। কদিন ধরে সুধাময় অনেক গল্প বলে নাতির মন নরম করার চেষ্টা করেছেন। পারমিতা সিঁটিয়ে ছিল তিনবছরের ছেলের মুখে রাজ্যের পাকা পাকা কথা। রাত এগারটা পর্যন্ত জেগে বসে থাকে। এই নিয়ে প্রবালের সঙ্গে প্রায়ই ঝামেলা হয়। সেই ছেলে যদি একবার বলে বসে যাব না তো হয়ে গেল।

কিন্তু সকালে ইউনিফর্ম পরানো মাত্র প্রবর খুব খুশী। দাদুর হাত ধরে বেরিয়ে পড়ল পাড়ার নার্সারি স্কুলের জন্যে। নতুন ক্লাশ। প্রবরের মত সকলেই। সুধাময় দেখলেন নাতি গটগট করে হেঁটে যাচ্ছে তাঁর সঙ্গে। একেবারে ক্লাসরুমে বসিয়ে দিয়েও তাঁর সংশয় যায়নি। তিনি বসে রইলেন স্কুলের সামনের রকে। যদি চিৎকার কান্নাকাটি ভেসে আসে তৎক্ষণাৎ ছুটে যাবেন। কান্নাকাটি হচ্ছে বটে তবে তা তাঁর নাতির নয়। প্রথম দিন আটটা থেকে দশটা। দুঘন্টা কাটতেই চাইছিল না সুধাময়ের। নাম ডেকে স্কুলের গেটে দাঁড়িয়ে দিদিমণি যখন সদ্যছাত্রদের গার্জেনের হাতে তুলে দিচ্ছেন তখন প্রবর ঘুরে দাঁড়াল। দিদিমণির দিকে তাকিয়ে কচি গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'আমি এখন থাকতে পারব না এখানে?'

'এখানে থেকে কি করবে? তোমার তো ছুটি হয়ে গেছে আজ।' দিদিমণি যেন মজা পেলেন।

'আমি যদি ছুটি না নিই?' প্রবর প্রশ্ন করল।

দিদিমণি এবার সুধাময়ের দিকে তাকাল, 'বেশী কথা বলে, না?'

সুধাময় বললেন, 'চল দাদু।'

কিন্তু দেখা গেল সবার সব ধারণাকে উল্টে দিয়ে প্রবর স্কুলের নেশায় পড়ে

গেছে। বৃহস্পতি রবিবার স্কুল বন্ধ থাকে বলে তার খুব রাগ। দিদিমণি ক্লাশে যা বলেন তার প্রতিটি শব্দ সে মনে রাখে। আর এই কারণে মায়ের সঙ্গে রীতিমত ঝগড়া হয়। তৃতীয় দিনেই সে বলেছিল, 'তুমি কিছু জানো না মা।'

'আমি কিছু জানি না?' রেগে গিয়েছিল পারমিতা, 'তোর দিদিমণি যা বলবে তাই ঠিক? দুদিনেই বড় বড় কথা বলা হচ্ছে?'

'ঠিকই তো। তুমি তো শুধু আমাকে পড়াও, আর দিদিমণি ক্লাসের তিরিশজনকে পড়ায়। কে বেশী জানে, বল, বল এবার?'

পারমিতার সামনে ছবি আঁকার খাতা। তার দ্বিতীয় পাতায় শ্রীমানের কাঁচা হাতে ঘোড়ার ছবি আঁকা। সেটাকে অবশ্য ঘোড়া না বলে দিলে বোঝা সম্ভব নয়। সেই ঘোড়ার পেটের তলায় একটি বিরাট ডিম এঁকেছে প্রবর। বিপত্তি এই কারণে। দেখে হেসে ফেলে পারমিতা বলেছিল, 'দূর বোকা। ঘোড়ার ডিম হয় না।'

ছেলে গম্ভীর মুখে জবাব দিয়েছে, 'হয়?'

'হয় মানে?' হাসিটা তখনও ছিল পারমিতার।

'পাখির ডিম হয়, মুরগির ডিম হয় যখন ঘোড়ারও ডিম হয়।'

'দূর। পাখি মুরগি হাঁস দুই পেয়ে জন্তু। ঘোড়া গরু মোষ বাঘের চার পা। এদের একেবারে বাচ্চা হয়। তোর দিদিমণি দেখেছে ছবিটা?'

'হ্যাঁ। তুমি কিছু জানো না।'

'দিদিমনি এটা দেখে কিছু বলেনি?'

'আরে, বলবে কেন? দিদিমনিই তো বলেছে ঘোড়া আর তার ডিম আঁকতে।' পারমিতা আর পারল না। হো হো করে হেসে উঠল। সেই হাসি শুনে মনোরমা সরে এলেন, 'কি হল? হাসির কারণ কি?'

'এই দেখুন, আপনার নাতিকে দিয়ে স্কুলে ঘোড়ার ডিম আঁকিয়েছে।' পারমিতা নিজেকে সামলালো, 'আজকাল স্কুলে এইসব শেখানো হয়।'

মনোরমা ছবি দেখে হাসলেন। তাকে প্রবর জিজ্ঞাসা করল, 'কি ভুল হয়েছে।'

পারমিতাই ছেলেকে জবাব দিল, 'ঘোড়ার ডিম হয় না। ঘোড়া চার পেয়ে জন্তু।'

'দু'পা যাদের তাদেরই শুধু ডিম হয়?'

অন্যমনস্ক ভাবে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল পারমিতা।

'তাহলে ঠাকুমার ডিম হয়েছে, তোমার ডিম হয়েছে? তোমাদেরও তো দুটো পা। মনোরমার চোখ তখন কপালে উঠেছে। তিনি তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। স্তব্ধ হয়ে গেল পারমিতা। তারপর গম্ভীর গলায় বলল, 'মানুষের ডিম হয় না।'

ব্যাপারটা নিয়ে খুব ধন্দে পড়ল প্রবর। তখনই স্কুলে গিয়ে দিদিমণিকে জিজ্ঞাসা করতে পারলে খুশী হত। তার দিদিমণির বয়স কম, দেখতেও সুন্দর। রোজ নতুন নতুন শাড়ি পরে। তাকে খুব ভালবাসে দিদিমণি। মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। একদিন তার ওয়াটার বটলের মুখটা খুলছিল না। দিদিমণি এগিয়ে এসে নিজে সেটা খুলে তাকে জল খাইয়ে দিয়েছিল। সেটা

দেখে একটা মেয়ে বায়না করেছিল তাকেও খাইয়ে দিতে হবে। দিদিমণি মেয়েটার মাথায় হাত বুলিয়ে নিজের চেয়ারে ফিরে গিয়েছিল। এটা দেখে আরও ভাল লেগেছিল প্রবরের। দিদিমণি তাই ভুল বলতে পারে না। মা নিজেই কিছু বোঝে না। কথাটা সে বাবাকেও বলতে শুনেছে।

পরদিন স্কুলে গিয়েই দিদিমণির সামনে চলে এল সে, 'দিদিমণি, একটা কথা বলব ?'

'নিশ্চয়ই।' ভদ্রমহিলা হাসলেন।

'এই ছবিটা ভুল ?' খাতা খুলে দেখাল সে।

'খুব ভাল হয়েছে। তবে ঘোড়ার চেহারাটা আরও ভাল করতে হবে।'

'মা না কিছু জানে না।'

'কেন একথা মনে হল ?'

'মা বলেছে তুমি কিছু জানো না। ঘোড়ার নাকি ডিম হয় না।'

'আমরা এই ছবিটা মজা করতে এঁকেছি।'

'কিন্তু মা বলল যাদের চারটে পা আছে তাদের ডিম হয় না। ডিম হয় তাদের যাদের দুটো পা আছে। তাহলে মানুষের ডিম হবে না কেন, বলো ?'

ভদ্রমহিলা একটু ভাবলেন। ঠিক কথা। তোমার মা কি বলল ?'

'মা জবাবই দিতে পারেনি।'

'শোন, তুমি বড় হলে বুঝতে পারবে। ডিম সবার হয়। কোন কোন ডিম আমরা চোখে দেখতে পাই কোনটা দেখতে পাই না। মায়ের পেটেই তা থেকে বাচ্চা হয়ে যায়। কিন্তু আমরা কল্পনা করে অনেক ছবি আঁকতে পারি। যেমন একটা প্রাণী আঁকলাম যার সামনেটা হাঁসের মতন পেছনটা সজারু। নাম দিলাম হাঁসজারু। তা এই রকম প্রাণী কি পৃথিবীতে আছে ? না, নেই। কিন্তু কল্পনা করতে দোষ কি ?'

প্রবর খুব খুশী। দিদিমণি কথা বললেই সে বুঝতে পারে। বাড়ি ফিরে কথাটা সে ভুলে গিয়েছিল। মনে হল সন্ধ্যেবেলায়। অফিস থেকে ফিরে প্রবাল কিছু বলেছিল কিন্তু সেটা মানতে নারাজ পারমিতা। বিরক্ত হয়ে প্রবাল যেই বলল, 'তুমি যেটা জানো না সেটা স্বীকার করতে পারা না কেন ?' অমনি প্রবরের মনে পড়ে গেল।'

বিছানায় বসে সে গম্ভীর গলায় বলল, 'দিদিমণি একটা কথা বলেছে।'

দুজনেই চমকে তাকাল। পারমিতা অনেকবার স্বামীকে বলেছে ছেলে এখন হামাগুড়ি দেয় না, ওর সামনে উল্টোপাল্টা বলবে না। ছেলে ঘরে আছে কিনা খেয়ালই ছিল না, কথা শুনে পারমিতা মন্তব্য করল, ওই আরম্ভ হল।'

প্রবাল জিজ্ঞাসা করল, 'কি বলেছে ?'

'মা কিছু জানে না।'

মানে ?' ফোঁস করে উঠল পারমিতা।

'তুমি বলেছিলে ঘোড়ার ডিম হয় না। ঘোড়ার চারটে পা আছে, তাই।'

প্রবাল মাথা নাড়ল,'হ্যাঁ, তাই তো।'

পারমিতা মুখ ফেরাল, 'তুমি জানো ও কি বলেছে। মুরগি হাঁসের মত আমার দুই পা আছে বলে কেন আমার ডিম হবে না ? ভাবো।'

প্রবাল অনেক চেষ্টা করে নিজেকে সামলে গম্ভীর ভঙ্গীতে বলল, 'ঠিক !'

এতে উৎসাহিত হল প্রবর, 'দিদিমণি বলেছে সবার ডিম হয়। কারো দেখা যায়, কারো যায় না। তোমারও ডিম হয়েছিল, তুমি দেখতে পাওনি।

ধপ্ করে বসে পড়ল পারমিতা। আর অট্টহাসি চাপতে পারল না প্রবাল।

দিন দিন প্রবরের দিদিমণি বাতিক বাড়ছে। সেই ভদ্রমহিলা যা বলেন তা সে বাধ্য ছেলের মত শোনে। কিন্তু মায়ের কথা, ঠাকুমার কথা কানেও তোলে না। দিদিমণির হাসি, শাড়ির গন্ধ তার খুব ভাল লাগে। এমন কি রাত্রেও ঘুমিয়ে স্বপ্ন দ্যাখে। স্কুল থেকে তাদের পিকনিকে নিয়ে গিয়েছিল। সারাটা সকাল সে দিদিমণির গায়ে লেপ্টে ছিল। সেই ভদ্রমহিলা নিজের হাতে কেক খাইয়ে রুমালে মুখ মুছিয়ে দিয়েছেন। আনন্দে তার বুক ভরে গিয়েছিল। বাড়িতে ফিরে সেই গল্প শুনিয়েছে সবাইকে বারংবার। পারমিতা খেঁকিয়ে উঠেছে, 'চুপ কর। দিদিমণি দিদিমণি বলে হেদিয়ে মরল।'

রাত্রে ঘুমন্ত প্রবরের পাশে শুয়ে প্রবাল বলল, 'দেখো, এই ছেলে বড় হলে একজন মহান রোমিও হবে। এখন থেকেই যেরকম মেয়েদের প্রেমে মজে যাচ্ছে।'

পারমিতার খুব খারাপ লাগল, 'খুব ভাল কথা বলছ না ? ওই স্কুল ছাড়াতে হবে ওকে। পড়াশুনার নামগন্ধ নেই, যত আজে বাজে শিক্ষা।'

গরমের ছুটিটা যে কি ভাবেকেটেছিল প্রবরের তা সে-ই জানে। এরমধ্যে কয়েকদিন দাদুর সঙ্গে স্কুলে গিয়ে দেখেছে গেটে তালা দেওয়া। দিদিমণি দূরের কথা একটা দারোয়ান পর্যন্ত নেই। দিদিমণির বাড়িতে যাওয়ার কথা বলেছে সে দাদুকে। সুধাময় বলেছেন, 'তাঁর বাড়ির ঠিকানা তো আমি জানি না দাদু। স্কুল তো বন্ধ তাই জানাও যাবে না।'

মাঝে মাঝে মা বাবার সঙ্গে যেযে যেতে তার মনে হয়েছে হঠাৎ দিদিমণির সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে। কিন্তু হয়নি। কথাটা শুনলে মা রেগে যাবে এটা বুঝে গিয়েছে এতদিনে, তাই মুখে বলে না। তার কেবলই মনে হয় সে যদি বড় হত তাহলে ঠিক নিজে খুঁজে বের করতে পারত দিদিমণির বাড়ি। অদ্ভুত কষ্ট হত তখন।

শেষ পর্যন্ত স্কুল খুলল। বসার ঘরে টেবিলে ফুল রাখার শখ পারমিতার। ফুলদানি থেকে একটা গোলাপ তুলে পকেটে রেখে দিয়েছিল প্রবর। আজ তার হাঁটা আর দৌড়নোর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সুধাময় তাল রাখতে পারছেন না। ক্লাসে ঢুকে নিজের জায়গায় বসে সন্তর্পণে ফুলটাকে বের করল সে। ঘন্টা পড়লে ওই দরজা দিয়ে ঠিক তার সামনে আসতে হবে দিদিমণিকে। এলেই ফুলটা দিয়ে দেবে। ঘন্টা পড়ল। প্রবর অবাক হয়ে দেখল একজন অচেনা মোটা মহিলা খাতা নিয়ে তাদের ঘরে ঢুকছে, মহিলার মুখ হাসি হাসি কিন্তু দেখতে একটুও সুন্দর নয়। চেয়ারে বসে তিনি বললেন, 'এখন থেকে তোমরা আমার কাছে পড়বে।'

খুব রাগ হয়ে গেল প্রবরের কথাটা শুনে। সে বেঞ্চি ছেড়ে উঠে জিজ্ঞাসা করল, 'কেন ? তুমি পড়াবে কেন ? আমাদের দিদিমণি কোথায় ?'

'তিনি আর পডাবেন না। তাঁর বিয়ে হয়ে গেছে।'

'মিথ্যে কথা। আমি একদম বিশ্বাস করি না।' চিৎকার করে উঠল প্রবর।

ভদ্রমহিলা হতভম্ব। ওইটুকুনি পুঁচকে ছেলে তাকে ওই গলায় এমন কথা বলতে পারে সেটা বিশ্বাস করা কঠিন হয়ে পড়ছিল। তিনি ধমক দিলেন, 'তুমি ওইভাবে কেন কথা বলছ? বড়দের সঙ্গে ভাল ভাবে কথা বলতে হয়।'

'দিদিমণি কোথায়?' প্রবরের গলার স্বর ভাঙ্গছিল।

'বললাম তো, তিনি চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন।'

হঠাৎ ব্যাগ, ওয়াটার বটল তুলে প্রবর দরজার দিকে হাঁটতে লাগল। ভদ্রমহিলা হাঁ হাঁ করে উঠলেন। 'আরে, তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

এবার ডুকরে কেঁদে উঠল প্রবর, 'আমি তোমার কাছে পড়ব না।'

ততক্ষণে সে বারান্দায়। তাকে কাঁদতে দেখে অনেকেই তাকাচ্ছে। ভদ্রমহিলা বেরিয়ে এলেন, 'যাচ্ছ কোথায়! ঠিক আছে, পড়তে হবে না তোমাকে। চল, বসে থাকবে।'

'না। আমি যাব না, কিছুতেই যাব না।' চিৎকার আরও বাড়ল।

এইসময় প্রধান শিক্ষিকা বেরিয়ে এলেন, 'কি হয়েছে?'

নতুন দিদিমণি অসহায় ভঙ্গীতে বললেন, 'বুঝতে পারছি না। অঞ্জনা পড়াবে না শুনে কাঁদতে আরম্ভ করেছে।'

প্রধান শিক্ষিকা প্রবরের কাজ এগিয়ে এলেন, 'তোমার নাম কি?'

কান্না চলছিল। তারই মধ্যে নাম বলল সে। প্রধান শিক্ষিকা বললেন, 'আগের দিদিমণির কাছে পড়তে তোমার খুব ভাল লাগত, না? তা এই দিদিমণির কাছে পড়ে দ্যাখো, আরও বেশী ভাল লাগবে। কত মজার গল্প জানেন ইনি। আগের দিদিমণি চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন।'

কিন্তু ওইটুকুনি ছেলেকে ভোলানো গেল না। সে কিছুতেই স্কুলে থাকবে না। অগত্যা প্রধান শিক্ষিকা ফাইল থেকে প্রবরের বাড়ির ঠিকানা বের করলেন। আজকাল নাতি স্কুলে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ায় সুধাময় পৌঁছে দিয়ে বাড়ি ফিরে আসেন। আবার যান ছুটির সময়। প্রবর বাড়ি ফিরল দারোয়ানের সঙ্গে। দরজা খুলে পারমিতা অবাক। ছেলে আজও ফোঁপাচ্ছে। দারোয়ানের মুখে বিস্তারিত শোনার পর সুধাময় বললেন, 'ঠিক আছে, দুদিন যাক। মন ঠাণ্ডা হলে আবার স্কুলে যাবে।'

কিন্তু মন ঠাণ্ডা হবার বদলে জ্বর এল। একেবারে একশ দুই। ডাক্তার ডেকে আনলেন সুধাময়। ভদ্রলোক দেখে শুনে বললেন, 'ওষুধ দিচ্ছি, জ্বর কমবে। মনে ধাক্কা খেয়েছে খুব। একেবারে মানসিক ব্যাপার। দেখুন, ওর দিদিমণিকে একবার এখানে নিয়ে আসতে পারেন কিনা।'

মাতৃজঠরে শরীর তৈরী হয় কিন্তু মন তৈরী হয় না। এমনও বলা যেতে পারে ভূমিষ্ঠ হবার পর ঈশ্বরের সঙ্গে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ামাত্র মন তৈরীর কাজ শুরু হয়ে যায়। এই মনের নির্মাতা সে নিজে। কেউ বলেন রক্তের সম্পর্ক থেকে, কেউ বলেন পারিপার্শ্বিক থেকে মন তার উপাদান আহরণ করে। যখন কোন ব্যাখা পাওয়া যায় না তখন তাকে গোত্রছাড়া বলা ছাড়া কোন উপায় নেই। এভাবেই ঈশ্বরের সৃষ্টি ক্রমশ স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে যা হয়তো এককালে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করতে সাহায্য করে। এই একটি ব্যাপারে

সে স্বয়ম্ভূ।

প্রবরের ব্যাপার স্যাপার দেখে পারমিতা প্রচণ্ড ঘাবড়ে গিয়েছিল। স্বামীকে সেই দিদিমণির সন্ধানে পাঠানো ছাড়া অন্য পথ সে দেখতে পাচ্ছিল না। সুধাময় বললেন, 'এরকম তো সচরাচর হয় না, একটু বাড়াবাড়ি, কিন্তু নরম মনে যখন আঘাত লেগেছে তখন যাও, একবার ভদ্রমহিলাকে অনুরোধ কর, যদি আসেন।'

স্কুল থেকে অঞ্জনা মিত্রের ঠিকানা পেতে অসুবিধে হল না প্রবালের। এটি অঞ্জনার পৈতৃক বাড়ি। অঞ্জনার বাবা সব শুনে বললেন, 'মেয়ে তো এখন শ্বশুরবাড়িতে। আর ওরা বেশ কনজারভেটিভ তাই বিয়ের পর চাকরি ছাড়তে হল। আমার মনে হয় অঞ্জনাকে একেবারে অপরিচিত বাড়িতে ওরা পাঠাবেন না। বরং আপনার ছেলে সুস্থ হলে আমায় টেলিফোন করবেন, আমি আপনাদের নিয়ে যাব সেখানে।'

প্রবালের মনে হল ভদ্রলোকের কথায় যুক্তি আছে। সে নিজে গিয়ে কি বলতে পারত? এই যে, আপনাকে দেখতে না পেয়ে আমার ছেলে কেঁদে ককিয়ে জ্বরে পড়ে গিয়েছে। তাকে সামলাতে আমার বাড়িতে চলুন। ননসেন্স। নিজের কানেই বিশ্রী শোনাচ্ছে। সে বাড়িতে ফিরে এসে জানাল অঞ্জনা প্রবরকে সুস্থ হলে নিয়ে যেতে বলেছে। ডাক্তারের ওষুধে কাজ হচ্ছিল, তার ওপর মনোরমা এবং পারমিতা প্রবালের আশ্বাসবাক্য প্রবরের কানের কাছে বারংবার বলে একটু একটু করে উৎফুল্ল করে তুলল। দিন তিনেক বাদেই ভাত খেয়ে সে বায়না ধরল যাওয়ার জন্যে। টেলিফোন করে প্রবাল অঞ্জনার বাবার সঙ্গে সময় স্থির করে নিল।

পারমিতা গেলে ভাল হত, কিন্তু সে যেতে চায়নি। প্রবালেরও নিজের একবিন্দু ইচ্ছে ছিল না যাওয়ার। এসব দেখে সুধাময় রাজী হয়ে গেলেন। নাতিকে নিয়ে অঞ্জনার শ্বশুরের সঙ্গে মিলিত হলে তিনি বললেন, 'বড্ড মায়া, বুঝলেন, আমার মেয়েটাকে যে দেখে সে-ই মায়ায় পড়ে যায়। শিশুরা তো পড়বেই।'

প্রবর অধীর হয়ে উঠছিল। দুই বৃদ্ধের কথাবার্তা তার ভাল লাগার নয়। ট্যাক্সি করে মধ্য কলকাতার এক প্রাচীন পাড়ায় আসতে হল। বাইরের ঘরে একটা তক্তাপোষ, কয়েকটা চেয়ার। অঞ্জনার শ্বশুর বেয়াইমশাইকে আপ্যায়ন করলেন, 'আরে আসুন, আসুন। শুনলাম আপনি খবর পাঠিয়েছেন আসবেন বলে।'

হ্যাঁ। এই ছেলেটি একবার অঞ্জনার দেখা পেতে চায়।'

'ছেলেটি কে? এঁকে চিনলাম না তো?'

সুধাময় নমস্কার করে নিজের পরিচয় দিলেন, 'এই নাতির জন্যে আপনাদের বিরক্ত করতে হল!'

'অদ্ভুত ব্যাপার। বাপের জন্মে কখনও শুনিনি এমন ঘটনা। না, না, এইসব আবদারে প্রশ্রয় দেওয়া অনুচিত হয়েছে। ফ্রয়েড পড়েছেন আপনারা?' ভদ্রলোক গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করলেন।

সুধাময় বললেন, 'না। সেসব ব্যাপার নয়। এতো নিতান্তই ছেলেমানুষ।'

'ছেলেমানুষ ? মনের মধ্যে অনেক পাপবোধ এভাবেই আর একটা ছেলেমানুষী আচরণের আড়ালে ক্রমশ বড় হতে আরম্ভ করে। বউমা কি একে স্পেশ্যাল যত্ন করত ?'

অঞ্জনার বাবা বললেন, 'আর পাঁচটা বাচ্চাকে যেভাবে দেখত একে তার বেশী দেখার কি কারণ আছে ? সবাইকে ও খুব ভালবাসত।'

হঠাৎ প্রবর বলে উঠল, 'আমাকে সবচেয়ে বেশী।'

অঞ্জনার শ্বশুর বললেন, 'হুম্। ঠিক আছে, আপনার মেয়ে, আপনি এসেছেন, আমি কেন না বলতে যাব। বসুন, আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

তিনি ভেতরে চলে গেলেন বিদ্যাসাগরী চটিতে শব্দ তুলে। প্রবর উশখুশ করছিল। সুধাময় একটু গম্ভীর গলায় বললেন, 'শান্ত হয়ে বসো।'

'আমি তো কিছু করছি না।' প্রবর জবাব দিল।

অঞ্জনার বাবা হেসে ফেললেন, 'এ ছেলের মুখে দেখছি খই ফোটে।'

তখনই অঞ্জনা এল, মাথায় গোমটা, 'কেমন আছ বাবা ?'

'ভাল। তুই কেমন মা ?'

'ঠিক আছি। মা ভাল আছে ?'

'হ্যাঁ। জামাই কোথায় ?'

'একটু আগে অফিস থেকে ফিরেছে। বাথরুমে। এঁরা— ?'

'এই ছেলেটি তোর ছাত্র ছিল। তোকে দেখতে চায়।'

'কেন ?' অঞ্জনা প্রবরের দিকে তাকাল, 'ও, তুমি ! কি ব্যাপার ?'

প্রবর অঞ্জনাকে দেখামাত্র উঠে দাঁড়িয়েছিল। এখন প্রশ্নের জবাব দিতে ঠোঁট নাড়ল, কিন্তু কথা বলতে পারল না।

সুধাময় বললেন, 'এ আমার নাতি। আপনি চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন শুনে খুব আপসেট হয়ে পড়ে, অসুখ বাধায়। আমরা খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।'

'সেকি ? অদ্ভুত ব্যাপার তো।'

'আপনি যদি কিছু বলে দেন—।' সুধাময় আবেদনের ভঙ্গীতে বললেন।

'কি বলব ? এই, তুমি মন দিয়ে পড়াশুনা করবে, কেমন ? বাবা, তুমি মাকে বলবে সামনের রবিবার যেন দোলাকে একটু পাঠিয়ে দেয়। তোমরা বসো, আমি একটু ওদিকটা দেখে আসি।' অঞ্জনা বেশ ব্যস্ত হয়ে ভেতরে চলে গেল।

সুধাময় এবার উঠে দাঁড়ালেন, 'আমরা এবার চলি। কাজটা হয়ে গেল। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। নমস্কার।' নাতির হাত ধরে টানতেই তিনি লক্ষ্য করলেন বিনা বাক্যব্যয়ে সে তাঁকে অনুসরণ করছে। চিবুক বুকের ওপর ঠেকানো।

বাইরে বেরিয়ে তিনি একটিও ট্যাক্সি দেখতে পেলেন না। নাতির মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁর খুব কষ্ট হচ্ছিল। যে দিদিমণির জন্যে কদিন কেঁদে ভাসিয়েছে তাকে দেখার পর সে একটাও কথা বলেনি। অঞ্জনা যা করল তাতে তাকে দোষ দিতে পারছেন না তিনি। এটাই তো স্বাভাবিক। তিনি ভেবেছিলেন দিদিমণিকে দেখামাত্র প্রবর একটা কিছু কাজ কববে। অথচ কিছুই করল না ছেলেটা। আর এই ঘাড়গুঁজে কাঠ হয়ে হাঁটা থেকে তো বোঝা যায়

ওর মনে এখন বড়রকম টালমাটাল হচ্ছে। সুধাময় দেখলেন, রাস্তার পাশে একটা পার্কে ছেলেরা খেলছে। নাতির হাত ধরে সেখানে ঢুকে একটা বেঞ্চিও পেয়ে গেলেন।

তিনি সস্নেহে বললেন, 'দিদিমণির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, তাহলে মুখ গম্ভীর কেন?'

এক ঝটকায় মুখ অন্যদিকে ফেরাল প্রবর, 'ও আমার দিদিমণি নয়।'

'সেকি? ইনিই তো তোমাদের পড়াতেন।'

'না। সেই দিদিমণি আলাদা।'

'বুঝতে পেরেছি। মাথায় ঘোমটা ছিল বলে তোমার চিনতে অসুবিধে হয়েছে, না?'

মুখে কিছু না বলে ঘন ঘন মাথা নেড়ে না বলল প্রবর।

সুধাময় আর কথা খুঁজে পাচ্ছিলেন না।

হঠাৎ প্রবর বলল, 'আমি বাড়ি যাব।'

'বাড়ি? বেশ, চল। শোন, তুমি মন খারাপ করো না। দিদিমণি যা বললেন তাই মন দিয়ে করো। যখন অনেক বড় হবে তখন বুঝতে পারবে উনি ঠিক বলেছেন।'

'বললাম তো, উনি অন্যলোক।'

'একথা কেন মনে হচ্ছে?'

'জানি না।'

হঠাৎ মনটা আরও বেদনার্ত হয়ে উঠল সুধাময়ের। নাতির কাঁধে হাত রেখে তিনি বললেন, 'যখন উনি তোমাদের পড়াতেন তখন ওঁর অন্য জীবন ছিল। এখন বিয়ের পর একেবারে আলাদা জীবন। যখন বড় হবে তখন বুঝতে পারবে মানুষকে এইসব পরিবর্তন মেনে নিতে হয়। যা ছুটে যায় তাকে তো তুমি জোর করে আঁকড়ে রাখতে পারো না। এতে শুধু শুধু দুঃখ পেতে হয় দাদু।'

'আমার কিছু হয়নি। আমি বাড়ি যাব।' কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে প্রবর উঠে দাঁড়াল। ছেলেটার শক্ত হয়ে যাওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে সুধাময়ের মনে হল এই শিশুটিকে তিনি বুঝতে পারছেন না। হঠাৎ যেন অনেকটা বয়স বেড়ে গেছে ওর।

রাত্রে ঘুমন্ত প্রবরের দিকে তাকিয়ে প্রবাল বলল, 'ছেলেটা এই বয়সেই প্রথম ধাক্কা খেল। আমি তখনই নিষেধ করেছিলাম নিয়ে যেতে।'

পারমিতা ছেলের পাশে শুয়েছিল। বলল, 'সেই মহিলাই বা কেমন? একটু ভাল মুখে ওর সঙ্গে গল্প করলে এমন কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত?'

প্রবাল হাসল, কিছু বলল না। পাশের ঘরে মনোরমা তখন স্বামীকে মনে করিয়ে দিচ্ছেন, আগামীকাল নাতির ঠিকুজি আনতে যাওয়ার কথা। খারাপ কিছু থাকলে সবাইকে বলার দরকার নেই। সুধাময় জবাব দিলেন না। তাঁর মন ভাল ছিল না।

সপ্তমী

প্রবালকে প্রধানশিক্ষক ডেকে পাঠিয়েছিলেন। আপ্যায়ন করে বললেন, 'একটা ব্যাপারে আপনার সঙ্গে কথা বলব বলেই আসতে বলেছিলাম। প্রবর অত্যন্ত মেধাবী। স্মরণশক্তি দারুণ। যা শোনে তাই মনে রাখে। কিন্তু একটি দশ বছরের ছেলে অত গম্ভীর হয়ে থাকে কেন?'

'বাড়িতে-মাথা নাড়ল, 'ওর স্বভাবটাই ওই রকম। ছেলেবেলা থেকেই।'

'প্রবাল আপনাদের সঙ্গে কথা বলে না?'

'তেমন না। যা সম্পর্ক তা শুধু ওর মায়ের সঙ্গে।'

'অদ্ভুত। ক্লাশে ওর কোন বন্ধু নেই। অন্য ছেলেরা যখন হৈহৈ করে তখন সে গম্ভীর মুখে দূরে সরে থাকে। কোন খেলাধূলায় পার্টিসিপেট করে না। ওই বয়সের ছেলেদের তুলনায় ওকে বেশী ম্যাচিওরড মনে হয়। এটা নর্মলি নয়।'

'আমি জানি। কিন্তু কি করব বলুন?'

'সাইকিয়াটিস্ট দেখাতে পারেন।'

'সেই পর্যায়ে গিয়েছে বলে আপনি মনে করছেন?'

'সেই পর্যায় মানে? এদেশে সবাই ভাবে পাগল হলে তবে সাইকিয়াটিস্টের কাছে যেতে হয়। কখনই নয়। জ্বর হলেও তো আমরা ডাক্তার ডাকি। তাই না? আচ্ছা, বাড়িতে ও পড়ার বই ছাড়া আর কি পড়ে?'

'এ ব্যাপারে আমার বাবা ওকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন।'

'সেইটে ঠিক হয়নি। ও বঙ্কিম শরৎ পড়ে ফেলেছে। ওর ক্লাশের অন্য ছেলে যা পারে না তা ও কোট করতে পারে। অথচ ঠাকুমার ঝুলি জাতীয় বই পড়েনি। এত কথা বলছি কারণ প্রবর আমার স্কুলের গর্ব হতে পারে। ও যে মার্কস পায় তা যদি না কমে তাহলে ফাইন্যাল পরীক্ষায় স্ট্যান্ড করবে আশা করা যায়। আপনারা চেষ্টা করুন ওকে স্বাভাবিক করে তুলতে।' হেডমাস্টার মশাই উপদেশ দিয়েছিলেন।

ছেলের আড়ালে কথাগুলো বাড়িতে এসে বলেছিল প্রবাল। সুধাময় আপত্তি তুলেছিলে, 'দ্যাখো, হাতের পাঁচ আঙুল সমান হয় না। ওর খেলাধুলায় আগ্রহ নেই, কম কথা বলে মানেই ও এ্যাবনর্মল এসব বাজে কথা। ও অনেক কিছু জানে, আরও জানতে চায় তাই বই পড়তে দিয়েছি। দ্যাটস অল।'

রাত্রে ছেলে তার মায়ের কাছে শোয়। এই নিয়ে স্বামী স্ত্রীর অশান্তি লেগেই আছে। প্রবালের ইচ্ছে ছেলে পাশের খালি খাটটায় শোওয়ার অভ্যেস করুক। যথেষ্ট বড় হয়ে গেছে, একা শোওয়ার কোন অসুবিধে হবে না।

পারমিতা প্রবরকে কথাগুলো বলতে পারছে না। যে ছেলে সারাক্ষণ বই মুখে গুঁজে বসে থাকে, তিনটে প্রশ্ন করতে একটাই জবাব দেয় তার ভাল লাগার জায়গা কমিয়ে দিতে খুব খারাপ লাগছে পারমিতার। ছুটির দিনে দুপুরে পারমিতা একা থাকলে ছেলে এসে চুপচাপ তার কোল ঘেঁষে শুয়ে পড়বে। সেই ভঙ্গি দেখেই বোঝা যায় ওর মনের ছেলেমানুষটা শুধু মায়ের জন্যেই রেখে দিয়েছে। তাছাড়া ছেলে পাশে শুলে পারমিতার নিজেরও যে ভাল লাগে

একথা প্রবালকে সে বলেছে। প্রবালের আপত্তি সেই কারণেও।

এই রকম সময়ে মনে হবে ছেলে বাবার শত্রু। যুদ্ধটা একজন তার কাছে সোচ্চার ভাবে করছে, অন্যজন চুপচাপ। অথচ কেউ কাউকে সরাসরি কিছু বলছে না। পারমিতা জানে ছেলেকে প্রবাল অন্য সময় অত্যন্ত ভালবাসে? ছেলে কি করলে ভাল থাকবে তারই চেষ্টা করে সবসময়। প্রতি মাসে নানান ধরনের বই এনে দিচ্ছে, রিডার ডাইজেস্টের গ্রাহক করে দিয়েছে। ওই পত্রিকার বিশেষ সংকলনগুলো মাঝে মাঝেই মোটা টাকা পাঠিয়ে ছেলের জন্যে আনায়। এই কারণে পারমিতা কখনও কখনও আপত্তি করেছে। তখন এই প্রবালই বলেছে, 'আরে সামান্য কটা টাকা তো। ওর তো আর কোন আবদার নেই।'

বিছানায় শোওয়ামাত্র প্রবর চোখ বন্ধ করে আর টুপ করে ঘুম এসে যায়। সে বিছানায় আসে পারমিতা শোয়ার পরে। মায়ের গায়ে হাত রেখে শোওয়ামাত্র তার অদ্ভুত আরামবোধ হয়। একটা গন্ধ নাকে আসে। এই অতি পরিচিত গন্ধটা তাকে যেন আশ্বস্ত করে। এবং ওই মিষ্টি গন্ধ এবং মায়ের স্পর্শ তার ঘুম আনতে চটজলদি সাহায্য করে।

আজও সে ঘুমিয়ে পড়েছিল সাড়ে দশটা নাগাদ। হঠাৎ যেন স্বপ্ন দেখতে শুরু করল সে। নীল আলো। সাদা ধোঁয়া। একটা লাল ঘোড়া তার মাঝখানে টগবগিয়ে ছুটে চলেছে। ঘোড়াটার পেছনে সে সমানে দৌড়ে যাচ্ছে। একবার লাগামটা ধরতে পারলেই এক লাফে পিঠে চড়ে বসতে পারবে। কিন্তু কিছুতেই লাগামটা তার হাতের মুঠোয় আসছে না। এই সময় পাশ থেকে কেউ চাপা স্বরে বলল, 'না।'

সঙ্গে সঙ্গে আর একজন বলল, 'হ্যাঁ। বেশী বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে।'

'এত বড় একটা ছেলে ঘরে শুয়ে আছে, তুমি ভুলে যাচ্ছ!'

'ওর জন্যে চিন্তা করো না।'

'মানে?'

'ও একবার ঘুমিয়ে পড়লে ভোরের আগে জাগে না।'

'কিন্তু যদি জাগে?'

'আঃ, বলছি জাগবে না?'

'আমার ভাল লাগছে না।'

'দ্যাখো, তুমি ওকে পাশের ঘরে পাঠাবেও না আবার এইসব বলবে। আমাদের সম্পর্কটা কি সেটা খোলাখুলি বলে দাও।'

এখন আর নীল আলো সাদা ধোঁয়া অথবা লাল ঘোড়া সামনে নেই। তার চোখের পাতায় শুধু অন্ধকার। পাশ ফিরে শোওয়া অবস্থায় সে ধীরে ধীরে চোখ খুলতেই দেখল অন্ধকার সমস্ত ঘর জুড়ে। তার হাতে মায়ের আঙুলের স্পর্শ লাগতেই সে আবার চোখ বন্ধ করল। ধীরে ধীরে হাতটাকে বিছানায় নামিয়ে রাখা হল। একটু চুপচাপ। চোখ বন্ধ অবস্থায় প্রবর টের পেল মা পাশ থেকে উঠে যাচ্ছে সন্তর্পণে। এরকম ভাবে মা কখনই চলাফেরা করে না। ওর খুব ইচ্ছে করছিল মাকে জিজ্ঞাসা করতে, কোথায় যাচ্ছে। এই সময় বাবার গলা কানে এল, 'গুড। তুমি মিছিমিছি ভয় পাচ্ছিলে।'

ভয় ? মা কাকে ভয় করতে যাবে ? মাথামুণ্ডু বুঝতে পারছিল না সে। কিন্তু ওরা ঘর অন্ধকার করে কথা বলছে কেন ? সে আবার চোখ খুলল। প্রথমে বড্ড ঘন মনে হয়েছিল এখন ততটা অন্ধকার মনে হচ্ছে না। খোলা জানলা দিয়ে আকাশের এক ধরনের ঘোলাটে আলো ঘরে ঢুকে সেই অন্ধকারকে সামান্য সরিয়েছে। প্রবর ঘাড় ঘুরিয়ে ওদের খুঁজছিল। কোথাও দেখতে পাচ্ছে না কিন্তু শব্দ আসছে। চুম্বনের শব্দ। বাবা কি মাকে চুমু খাচ্ছে ? নাকি, মা বাবাকে ? ওই শব্দ আবার কানে আসামাত্র সে স্থির হয়ে গেল। চোখ বন্ধ করল। হঠাৎ হঠাৎই কষ্ট জমতে শুরু করল বুকের পাঁজরের তলায়। তার মনে হচ্ছিল সে সব কিছু থেকে বঞ্চিত। মায়ের যে স্পর্শ এবং গন্ধ একমাত্র তার নিজের সম্পত্তি বলে এতকাল মনে করত সেটা মিথ্যে, একদম মিথ্যে। মা যে তাকে জড়িয়ে ধরে আদর করে সেটাও ঠিক নয়। কারণ মা এখন তাকে ভুলেও চুমু খায় না। যেটা এখন বাবার সঙ্গে সচ্ছন্দে পারছে সেটা তার সঙ্গে মা করে না। বিছানা থেকে উঠে যাওয়ার আগে মা বাবাকে বলেছে তার ভয় করছে। কি জন্যে ভয় এখন খানিকটা আন্দাজ করতে পারছে সে। তাকে লুকিয়ে মা বাবার কাছে গিয়েছে। বাবাকে যে মা বেশী ভালবাসে তা যদি সে জেনে যায় তাহলে সে কষ্ট পেতে পারে, মায়ের ভয় এইটেই। অর্থাৎ তার সঙ্গে লুকোছাপা করছে মা। হঠাৎ চোখ উপছে জল বেরিয়ে এল প্রবরের। বুকের কষ্টটা ফোঁপানি হয়ে গলতে চাইল। প্রাণপণে নিজেকে সংযত রাখতে চেষ্টা করছিল সে। কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারল না।

শব্দ কানে যেতেই পারমিতা কাঠ। প্রবাল স্থির। যেটুকু সময় লাগে নিজেকে তৈরী করতে তার বেশী নিল না পারমিতা। সোজা ছেলের পাশে এসে বসল, 'কি হয়েছে টুকু ? কাঁদছিস কেন ? এই টুকলু ?'

এবার তার কান্না গলায় আটকে গেল। দূর থেকে প্রবালের গলা ভেসে এল, 'বোধহয় স্বপ্ন দেখেছে। হরর স্টোরিস বইটা পড়েছে নিশ্চয়ই।'

'কেন ওসব কিনে দাও ?' পারমিতা বিরক্ত হল, 'শান্ত হয়ে শো। আমি পাশে আছি।'

ততক্ষণে নিজেকে অনেকটাই শান্ত করতে পেরেছে প্রবর। ঠিক যে ভঙ্গীতে সে শুয়েছিল তার পরিবর্তন করল না। সে টের পেল মা এবার তার পাশে শুয়ে পড়ল। একটা হাত তার পিঠের ওপর নিয়ে এসে ধীরে ধীরে বোলাতে লাগল। প্রবর এক ইঞ্চিও নড়ল না। ঠিক মড়ার মত পড়ে রইল। অভিমানে তার ছোট্ট বুক উত্তাল হয়ে গেলেও সে একটি শব্দও উচ্চারণ করল না। ধীরে ধীরে একটা আচ্ছন্নভাব তাকে ঘিরে ধরল।

কতক্ষণ এভাবে কেটেছিল তা তার জানা নেই। কিন্তু আচ্ছন্নভাবটা চলে গেল আচমকাই। তার কিছুতেই ঘুম আসছিল না। একই অবস্থায় শায়িত থেকে সে প্রবালের নাসিকাগর্জন শুনতে পেল। অন্ধকার ঘরে সেই শব্দটি এক নাগাড়ে পাক খাচ্ছে। আধ ইঞ্চি দূরে শোওয়া মায়ের শরীর নিথর। সে ধীরে ধীরে উঠে বসল। মা ঘুমাচ্ছে নিশ্চিত মুখে। ওপাশে বাবা শুয়ে আছে চিৎ হয়ে। তার খুব রাগ হচ্ছিল। এই রাগ কিজন্যে এখন সেই ভাবনাটাও মাথায় নেই। অন্ধকারে চুপচাপ বসে সে ঠিক করল এদের সঙ্গে আর কখনই

সে শোবে না। মায়ের সঙ্গে কথনই না। নিঃশ্বাস ফেলে মা থেকে খানিকটা দূরত্ব বাড়িয়ে সে উল্টো দিকে পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল আবার। কখন ঘুম এল তা টেরও পেল না।

সারাটা সকাল প্রবর নিজের টেবিলে। পারমিতা দু-একবার কথা বলার চেষ্টা করে হুঁ হাঁ শুনেছিল। ছেলেকে সে বারংবার ঘুরে ঘুরে দেখে গেছে। সন্দেহটা কেবলই বুকে ছোবল মারছে? সেইসঙ্গে প্রবালের ওপর রাগ বাড়ছে। ছেলে জেগে উঠে অন্ধকারে কিছু দেখল কিনা সে বুঝতে পারছে না। তেমন কিছু হয়ে গেলে—ছি ছি ছি। সে একবার পাশে এসে দাঁড়াল, 'কি বই দেখি। আমাকে দিয়ে যাস তো।'

'বই মানে?'

'তোর বাবা বলছিল হরর স্টোরি পড়ে রাত্রে স্বপ্ন দেখে ভয় পাচ্ছিস?'

'ভয় পাওয়ানোর জন্যেই তো ওইসব গল্প লেখা হয়।'

'বইটা দেখি না!'

'ওই আলমারিতে আছে।'

পারমিতা আলমারি খুলে বইটা বের করল। বেশ মোটাসোটা। কিন্তু আর কোন কথা খুঁজে পেল না। অদ্ভুত ধন্দে রইল সে।

বছরখানেক আগে পর্যন্ত সুধাময় নাতিকে স্কুলে পৌঁছে দিতো। এখন পাড়ার স্কুল নয়। ট্রাম বাসে উঠতে হয়। একদিন ভিড়-ট্রামে উঠতে গিয়ে তাঁর মাথা ঘুরে গিয়েছিল। সেদিন বাড়ি ফিরে প্রবর ঘোষণা করেছিল কাল থেকে সে একাই স্কুলে যাবে। ঠাকুমা বা মায়ের আপত্তি শুনতে চায়নি। বলেছিল, 'আমি এখন যথেষ্ট বড় হয়ে গিয়েছি। আমার জন্যে দাদুর শরীর কেন খারাপ হবে? তাছাড়া আমার ক্লাসের অনেকেই একাই স্কুলে যায়।' প্রবাল তাকে সমর্থন করেছিল,' ঠিক বলেছে। তাছাড়া এখনই ওকে একা না ছাড়লে কনফিডেন্স গ্রো করবে কি করে?'

আজ স্কুলে যাওয়ার আগে মায়ের কাছে এসে দাঁড়াল ছেলে, 'আমার পড়ার টেবিলটায় জায়গা হচ্ছে না। ওটা বদলানো দরকার।'

পারমিতা চিন্তিত হল, 'এঘরে এত জিনিসপত্র তার ওপর বড় টেবিল ঢোকালে হাঁটাচলার অসুবিধে হবে না?'

'এঘরে বড় টেবিল আমার কি দরকার। পাশের ঘরে টেবিলটায় পড়ব। ওখানে আমার ব্যবস্থা করে দাও। এখন থেকে আমি ওই ঘরে থাকব।' প্রবর ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে গেল। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকল পারমিতা। ব্যবস্থাটা মেনে নিতে তার খুব কষ্ট হচ্ছিল। কালকের রাত্রের ঘটনাটার পর ছেলের প্রস্তাব শুনে অস্বস্তি আরও প্রবল হল। খাটে বসেই সে দেখল প্রবরের পড়ার টেবিলে বই স্তূপ হয়ে আছে। জায়গা যে কম হচ্ছে সেটাও সত্যি। কিন্তু ছেলে বলল শুধু ওঘরে গিয়ে পড়বে না, থাকবেও। কেন? তাহলে তার সন্দেহটা কি ঠিক? সে কেঁদে ফেলল।

'একি? কাঁদছ কেন? কি হয়েছে?' মনোরমার অবাক হওয়া গলা কানে আসতেই আঁচলে চোখ মুছল পারমিতা। গাঢ় গলায় বলল, 'আপনার নাতি ওঘরে শুতে চাইছে।'

মনোরমা হাসলেন, 'এতে কষ্ট পাচ্ছ কেন ? ও বড় হচ্ছে। শরীরে পরিবর্তন এলে মনও পাল্টায়। এটা তো আমাদের মেনে নিতেই হবে।'

অনেক, অনেকদিন ধরে সেই অস্পষ্ট ছবি এবং শব্দ তার মনে এঁটুলির মত লেগেছিল। যখনই সে একা হত তখনই ওগুলো তাকে যেন তাড়া করত। কাউকে কিছু বলাও সম্ভব ছিল না। আসলে বলতে পারার মত কোন বন্ধুও তার নেই। এইসময় ক্লাশে একটি নতুন ছেলে ভর্তি হল। ওর বাবা বদলি হয়ে কলকাতায় এসেছেন। নাম সূর্য। দেখতে ভাল কিন্তু বেশী কথা বলে। প্রথমদিনেই অনেকের সঙ্গে ভাব করে ফেলল সূর্য। দ্বিতীয় দিনে তার কাছে এসে বলল, 'তুমি প্রবর ? আমাদের ফার্স্ট বয় ? এবার থেকে তোমাকে সেকেন্ড হতে হবে।'

এমনভাবে কাউকে কথা বলতে শোনেনি প্রবর। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

সূর্য বলল, 'আমি শালা জীবনে কখনও সেকেন্ড হইনি। আমি সূর্য। স্কুলের খাতায় অবশ্য তারপরে নারায়ণ লেখা আছে কিন্তু আমি এটাকে উড়িয়ে দিতে চাই।'

প্রবর হেসে বলেছিল, 'ভালই করেছ।'

'গুড। তোমার নাকি খুব পড়াশুনা ?'

'একদম না।'

অ্যাডাল্ট বই পড় ?'

'যেমন ?'

'ধরো বাংলায় চরিত্রহীন।'

'ত্যাডাল্ট মানে কি বলতে চাইছ ?'

'আছে যেসব বইতে বড়দের ব্যাপার স্যাপার আছে। চুমু খাওয়া টাওয়ার গল্প।'

সঙ্গে সঙ্গে প্রবরের মনে পড়ে গিয়েছিল। বড়রা পরস্পরকে চুমু খেলে ত্যাডাল্ট ব্যাপার হয় বুঝি ? সে বুঝতে পারছে না মনে করে সূর্য বলল, 'ইংরেজি সিনেমা দ্যাখো ? সেখানে সবাই টপাটপ চুমু খায়। কেউ কিছু মনেও করে না। বাংলাতে সেটা খারাপ ব্যাপার। চরিত্রহীনে দিবাকরকে তার বউদি চুমু খেয়েছে। আমাকে মা পড়তে দেয়নি। আমার এক মাসতুতো দিদি সেটা পড়ে শুনিয়েছিল। তুমি পড়েছ ?'

'হ্যাঁ। কিন্তু খারাপ লাগেনি আমার।'

'আরে খারাপ লাগলে অ্যাডাল্টরা চুমু খাবে কেন ? তুমি কাউকে খেয়েছ ?'

'কি ?'

'চুমু ?'

'সবাই ছেলেবেলায় খায়।'

তুমি আমার কথা বুঝতে পারছ না। সেই খাওয়া নয়।'

'না। আমি কোন বড় মেয়েকে চুমু খাইনি।'

'আমি খেয়েছি। সেই মাসতুতো দিদিকে। প্রথম প্রথম খারাপ লাগত,

পরে ফাইন।'

হঠাৎ খুব রাগ হয়ে গেল প্রবরের। সে জিজ্ঞাসা করল, 'এসব কথা আমাকে বলা কেন ? তোমার মাসতুতো দিদিকে তো আমি চুমু খাচ্ছি না।'

সূর্য হেসে চলে গিয়েছিল। কিন্তু তারপর থেকে রোজই তার সঙ্গে কথা বলত। কথা বলার বিষয়ের অভাব হত না ছেলেটার এবং সেসবই নরনারীর শরীর নিয়ে। সে তার বাবা মাকে নগ্ন অবস্থায় শুয়ে থাকতে দেখেছে এ গল্প করতেও দ্বিধা করল না। এবং চেষ্টা করেছিল ওকে এড়িয়ে থাকতে। কিন্তু সূর্য নাছোড়বান্দা। মুখে এইসব কথা বললেও সূর্য যে ছাত্র হিসেবে ভাল তা কিছুদিনের মধ্যেই বোঝা যাচ্ছিল। হাফ ইয়ার্লি পরীক্ষার পর দেখা গেল সূর্য প্রবরের থেকে চার নম্বর বেশী পেয়ে প্রথম হয়েছে। প্রচণ্ড ধাক্কা খেল প্রবর। এইরকম বাজে কথা বলে যে ছেলে সে কি করে এত ভাল ফল করে ? আর তখন থেকেই সূর্যর সঙ্গে ওর একটু করে ঘনিষ্ঠতা বাড়তে লাগল।

ক্লাশ নাইনে যখন তখন প্রবরের ঠোঁটের ওপর কালচে লোমের শুরু। ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকে যে শরীরটা শুধু বেড়েই চলেছিল তার কিছু কিছু পরিবর্তন আসছে। গলার সরু স্বর ভেঙে ফেলা হচ্ছে। এইসময় সূর্য একদিন তাকে একটা বই এনে দিল। দিয়ে বলল, 'কাউকে দেখাস না।'

বইটির মলাট নেই। ওপরে একটা সাদা কাগজে লেখা ট্রপিক অফ ক্যানসার। প্রবর অবাক হল। সে মনে করল এটি ক্যানসার রোগ সম্পর্কিত বই এবং তা না দেখানোর কি আছে ? রাত্রে পড়তে বই-এর আড়ালে বইটি পড়তে গিয়ে সে খুব হোঁচট খাচ্ছিল। ভাষা বেশ খটমটে লাগছিল বেং ক্রমশ আদিরসের ঘোরালো পরিবেশ তাকে বিভ্রান্ত করলে। তার মনে হল এই বই পড়তে হলে বেশ পরিশ্রম করতে হবে এবং তার বিনিময়ে তেমন লাভ হবে না। বরং সূর্য এর আগেরবার একটি কাব্য দিয়েছিল, ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর। ছন্দে লেখা, ভাষাও প্রাচীন কিন্তু পড়লে শরীরে উত্তাপ আসে। বস্তুত শরীরের মধ্যে আর এক শরীর, যার জন্ম বারো তেরো বছর বয়সে, সে আবিষ্কার করেছিল এইসব বই পড়ে। সূর্যর বাবার সংগ্রহে অনেকরকম বই আছে এবং সে তাঁদের লুকিয়ে নিজে পড়ে এবং তাকে পাড়ায়। কিন্তু সূর্যর সঙ্গে ভাল সম্পর্ক হওয়া সত্ত্বেও তার একটিই আক্ষেপ থেকে গেছে, এখন পর্যন্ত কোন পরীক্ষায় সে প্রথম হতে পারেনি। সূর্য বরাবর পাঁচ থেকে দশ নম্বর এগিয়ে আছে। পারমিতা তাকে বলেছিল, 'ছেলেটা কি করে এত ভাল করছে জেনেনে ? ও কি বই পড়ে, কি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে সেটা লক্ষ্য কর। দেখবি, তুই ঠিক পারবি।' প্রবর মাকে বলতে পারেনি কিছু। সূর্যর সেই মাসতুতো দিদির বিয়ে হয়ে গিয়েছে। বিয়ের পর যখন ফিরে এসেছিল তখন সেই মাসতুতো দিদি সূর্যকে একটা বই পড়তে দিয়েছিল। মহিলাকে তার স্বামী দিয়েছিলেন। সূর্যর মতে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেহবাদের গল্প। বড় বড় হরফে ছাপা চটি বই, বাংলায়। পড়লেই গা গুলিয়ে যায়। মলাট নেই তাই নামও নেই। প্রবর ঠিক করল এ ধরনের বই সে আর পড়বে না, সূর্য দিলেও না। এইসব বই একবার পড়লে দু-তিনদিন অন্য কিছুতে মন দেয়ো যায় না। পড়াশুনোয় ক্ষতি হয়। সূর্য যে কিভাবে এগুলো পড়েও একদম স্বাভাবিক

থাকে তা সে কিছুতেই বুঝতে পারে না।

সুধাময়ের শরীর খারাপ চলছিল কিছুদিন থেকেই। বুকে ব্যথা হয়। ডাক্তার, ওষুধপত্র চলছে। একটু বড় হওয়ার পর দাদুর সঙ্গেই সে যা কথা বলে বাড়িতে থাকতে। রোজ সকালে স্টেটসম্যান পড়েন সুধাময়। আর ভুল ত্রুটি দেখলেই সম্পাদককে চিঠি লেখেন। সেই চিঠি নাতির হাতে দেন পোস্ট করতে। বিকেলে স্কুল থেকে ফিরে দাদুর পাশে কিছুক্ষণ বসে প্রবর। বেশী কথা বলা বারণ সত্ত্বেও সুধাময় বকর বকর করেন। আজকাল প্রায়ই তিনি মৃত্যুর কথা বলেন। জানো দাদু, শরীরটা ক্রমশ জঙ ধরে যাচ্ছে। শৈশবে জন্মাবার পর নিজের ইচ্ছায় শিশু শরীর নাড়াতে পারে না, আবার দ্যাখো, এই বৃদ্ধ বয়সে কোন কোন অঙ্গ তেমনি অচল হয়ে যাচ্ছে। পঁচাত্তর বছর ধরে ব্যবহার করতে করতে ক্ষয় তো হবেই। আমার বুকের যন্ত্রটির সেই অবস্থা।'

প্রবর জিজ্ঞাসা করেছিল, 'এইসব ভাবতে খুব কষ্ট হচ্ছে, না ?'

'সেতো হবেই। এতদিন পৃথিবীতে আছি, ছেড়ে যেতে কষ্ট হবে না ?'

'ছেড়ে যাবে কেন ?'

'এটাই নিয়ম। গাছে কুঁড়ি ধরে, তা থেকে ফুল ফোটে, তারপর ফুল ঝরে যায়। যদি কোন ফুল না ঝরতো তাহলে নতুন কুঁড়ি ধরার জায়গাই হতো না গাছে। ছেলে নাতিদের জায়গা ছেড়ে দিয়ে চলে যেতেই হয়।' সুধাময় এখন যখন কথা বলেন তখন ভুলে যান যে তিনি পনের বছরের ছেলের সঙ্গে কথা বলছেন।

প্রবরের ভাল লাগছিল না কথাগুলো। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'কোথায় যেতে হয় ?'

'অ্যাঁ ?' সুধাময় হাসলেন, 'ওটাই হল রহস্য। কেউ জানে না। কোথা থেকে এসেছি কোথায় যাব তা মানুষ আজ পর্যন্ত আবিষ্কার করতে পারেনি। পারেনি বলেই নানারকম গল্প তৈরী করে নিজেকে ভুলিয়ে রাখে। তোমার ঠাকুমার ধারণা পুজোঅর্চনা করলে তিনি স্বর্গে গিয়ে দেবতাদের সঙ্গে থাকবেন। স্বর্গে দেবতা আছে কিনা জিজ্ঞাসা করলে রেগে যাবেন। কিন্তু ওই ভাবনা তাঁর মনকে শান্তিতে রাখে। এই জন্যে মানুষ ভাবে। কিন্তু কেউ কিছু জানে না। আমরা হিন্দুরা শরীর পুড়িয়ে ফেলি। কেন ? শরীর ছোট্ট হয়ে জন্মেছিল, একটু একটু করে বড় এবং শক্তিশালী হল, পৃথিবীর জল হাওয়ায় এক সময় পুরোন হয়ে জীর্ণ হতে লাগল, সেই শরীর ছেড়ে প্রাণ চলে গেলে তাকে পুড়িয়ে ছাই করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দাও। মুসলমান বা খ্রিষ্টানদের ধারণা অন্যরকম। তাঁরা মৃত মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা জানান শরীর সমাধি দিয়ে। সেই সমাধিবেদী তাঁদের স্মরণ করিয়ে দেয় ভালবাসার লোকটি ওখানে মাটির নিচে শায়িত আছেন। আমি চলে গেলে তোমরা ইলেকট্রিক চুল্লিতে দেবে। নিয়ে যাবে সৎকার সমিতির গাড়িতে। কেউ গলায় কাচা দেবে না, ন্যাড়া হবে না। যদি লোক ডেকে শ্রাদ্ধের খাওয়া খাওয়াও তাহলে আমাকে চরম অপমান করা হবে। এসব আমি লিখে গেছি, তুমি দেখবে এগুলো যেন মানা হয়। তোমার ঠাকুমা শুনবে না। তিনি যেন শাড়ি পরেন এবং এখন যেমন মাছ মাংস খাচ্ছেন তাই খান। বুঝলে ?'

প্রবর হেসে ফেলল, 'তুমি এমন করে বলছ যেন এখনই চলে যাচ্ছ।'

তখনও সে জানত না সময় বেশী নেই সুধাময়ের। সেই রাত্রেই খাওয়া দাওয়া সেরে সুধাময় বিছানায় শুয়েছেন। মনোরমা বাথরুমে। প্রবর এল দাদুর কাছে। এসে দেখল সুধাময়ের মুখে যন্ত্রণার ছাপ, হাত বুকে। সামলাতে চেষ্টা করছেন। সে জিজ্ঞাসা করল উদ্বেগ নিয়ে, 'কি হয়েছে দাদু? কষ্ট হচ্ছে?' সুধাময় মাথা নাড়লেন হ্যাঁ। তারপর বলতে চেষ্টা করলেন, 'সরবে-সরবে'। আন্দাজে বুঝে নিয়ে ঝটপট বালিশের পাশ থেকে ওষুধের শিশি থেকে একটা বের করে প্রবর দাদুর মুখে দিতে গেল। দিতে দিতেই সে লক্ষ্য করল জিভটা হঠাৎই স্থির হয়ে গেল। সুধাময়ের হাঁ করা মুখে বিন্দুমাত্র কাঁপন নেই। মাথাটা একটু কাত হল এই যা। প্রবর নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। এর নাম মৃত্যু? সে নাড়া খেয়ে চিৎকার করে উঠল, 'মা!'

তারপর মনোরমা যখন পাগলের মত সুধাময়ের শরীরে উপুড় হয়ে কান্নাকাটি করছেন, পারমিতা ডুকরে ডুকরে উঠছে আর প্রবাল হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল তখন প্রবর ধীরে ধীরে চলে এল নিজের ঘরে। তার খুব কষ্ট হচ্ছিল কান্না পাচ্ছিল না। দাদু মরে গেল এই সত্যিটাই তার কাছে অবিশ্বাস্য ছিল। একটা মানুষ তার হাত ধরে স্কুলে নিয়ে যেতেন, আজ বিকেলেও কত কথা বলেছেন, তিনি আর পৃথিবীতে নেই। মানুষের শরীর আর প্রাণ প্রায় একই সঙ্গে মায়ের গর্ভে জন্মায়। শরীর গঠিত হবার আগেই প্রাণের প্রকাশ ঘটে। অথচ মৃত্যুর সময় প্রাণ আগে চলে যায়, শরীর থাকে পড়ে। ওষুধটা দেবার সময় তার আঙ্গুলে কি গরম হাওয়া লেগেছিল? সেইরকম একটা অনুভূতি এখনও আঙ্গুলে লেগে আছে। সেইটে কি দাদুর প্রাণ? সে জানলা দিয়ে আকাশের দিকে তাকাল। দাদুর প্রাণ এখন কোথায় চলে যাচ্ছে? মানুষ যদি এই খোঁজটা পেত? সে আবার ফিরে এল সুধাময়ের ঘরে। তিনি পড়ে আছেন স্থির হয়ে। পারমিতা ক্রন্দনরত অবস্থাতেই জড়িয়ে ধরেছে প্রবরকে। তাকে দেখে ছুটে এল প্রবাল, কান্না নিয়েই জিজ্ঞাসা করল, 'তুই আমাদের ডাকলি না কেন?'

প্রবর মাথা নিচু করল, 'সময় পাইনি। হঠাৎই ওষুধ দিতে বললেন। দেবার আগেই—। তখনই তো ডাকলাম।'

'তখন ডেকে আর কি হবে। উঃ, আমি ভাবতে পারছি না বাবা নেই। হঠাৎ মানুষটা চলে গেল? উঃ, ভগবান। একটা সুযোগ পর্যন্ত পেলাম না।' প্রবাল আবার টলতে টলতে ফিরে যাচ্ছিল সুধাময়ের দিকে।

প্রবর দাদুর মুখের দিকে তাকাল। পঁচাত্তর বছর বেঁচে ছিলেন দাদু। ইদানীং প্রায়ই ঠাকুমার সঙ্গে ঝগড়া করতেন। খুব তুচ্ছ কারণ সেগুলো। মায়ের হয়ে বাবাকেও বকতেন। প্রবর ছাড়া কেউ ওঁর বই-এ হাত দিলে রেগে যেতেন। আমার বই কেউ স্পর্শ করবে না বলে চেঁচাতেন। সেই বই এখন তেমনি পড়ে আছে। শুধু উনি নেই। এখন ওই চিৎকার করে আমার আমার বলা কেমন অর্থহীন হয়ে গেল।

ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে বাড়িটা মানুষ ভর্তি হয়ে গেল। এত আত্মীয়স্বজন

বন্ধুবান্ধবকে একসঙ্গে এ বাড়িতে আগে কখনও দ্যাখেনি প্রবর। একজন বয়স্কা মহিলা খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে কাঁদতে কাঁদতে সুধাময়ের কাছে পৌঁছে এমন জোরে বিলাপ করতে বসলেন যে প্রবর হতভম্ব। এই প্রবীণাকে সে আগে কখনও দ্যাখেনি। অথচ দাদুর জন্যে এমন শোকগ্রস্ত ? পারমিতা তাঁকে শান্ত করতে চেষ্টা করলে তিনি ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, 'তুমি থামো ! কদিন এসেছ এই সংসারে ? তোমার শাশুড়ি নদাকে যা না জানে আমি তার ঢের বেশী জানি। আমরা একসঙ্গে এক্কাদোক্কা খেলেছি তা জানো ? এতদিন কর্তা আসতে দিতেন না বলে আসিনি কিন্তু আজ খবরটা শোনামাত্র না এসে পারলাম না। নদাগো, তোমাকে সে সময় কত কষ্ট দিয়েছি গো।' সুর করে তিনি কাঁদতে লাগলেন সুধাময়ের মাথার কাছে বসে। প্রবর দেখল সেই কান্নার শব্দে মনোরমাও কেমন চুপ মেরে গেছেন।

মড়াকে রাত পেরিয়ে বাসি করে নাকি সাধারণত নিয়ে যাওয়া হয় না। এইসব কথা হচ্ছিল।

একটু আগে ডাক্তার এসে পরীক্ষা করে সার্টিফিকেট দিয়ে গেছেন। এখন যাত্রা করলেই হয়। সুধাময় এত তাড়াতাড়ি মড়া হয়ে গেলেন এদের কাছে, প্রবরের খুব রাগ হচ্ছিল। শ্মশান খুব কাছে নয়। তাছাড়া কলকাতার রাস্তার যা হাল হয়েছে তাতে খালি পায়ে মড়া কাঁধে নিয়ে যাওয়াও উচিত নয়। প্রবালের এক জেঠতুতো দাদাই আয়োজন করছিলেন। একটা লরি এবং ফুল আনতে পাঠাচ্ছিলেন তিনি। প্রবাল মাথায় হাত দিয়ে বসেছিল। প্রবর সোজা বাবার কাছে এগিয়ে এল, 'দাদুকে লরিতে করে নিয়ে যাবে না।'

প্রবাল চমকে তাকাল ছেলের দিকে। অনেকেই কথাগুলো শুনতে পেয়েছিল। প্রবরের মামা যিনি তার মুখে ভাত দিয়েছিলেন এককালে, বললেন, 'একথা বলছ কেন ?'

'দাদুকে কাঁচের গাড়িতে নিয়ে যেতে হবে।' প্রবর জেদী গলায় বলল।

'কাঁচের গাড়ি ? কেন ? সাধারণত যাদের লোকবল কম তারাই হিন্দু সৎকার সমিতির গাড়িতে নিয়ে যায়। ওঁর মত মানুষকে খোলা ট্রাকে ফুলে সাজিয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত।'

'না। কখনো নয়।'

এবার প্রবালের জেঠতুতো দাদা এগিয়ে এলেন, 'তোমার আপত্তির কারণ কি ?'

'আমাকে আজই দাদু বলেছে মরে গেলে যেন ওঁকে কাঁচের গাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। আমাকে দাদু বলেছে তোমার ওপর দায়িত্ব রইল।' ঘাড় শক্ত করে বলল প্রবর।

বড়দের সামনে এসে এমন জেদী ভঙ্গীতে ছেলেকে কথা বলতে শুনে শোকভাব কমে আসছিল প্রবালের। তার মনে হচ্ছিল যথেষ্ট প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে ছেলেকে। কিন্তু সুধাময়ের কথা শোনামাত্র সে থমকে গেল। জিজ্ঞাসা করল, 'আর কি বলেছে বাবা ?'

'ইলেকট্রিক চুল্লিতে দাহ করতে হবে।'

'সেটা ঠিক আছে। অনেক ঝামেলা কম। চোখের ওপর দেখতেও হয়

না।' সেই জেঠতুতো দাদা মন্তব্য করলেন। প্রবরের মামা জিজ্ঞাসা করল, 'আর কি কথা হয়েছে?'

'দাদু বলেছে সব লিখে রেখেছেন।'

'কোথায়?'

'দাদু ডায়েরি লিখত।'

সঙ্গে সঙ্গে ডায়েরির সন্ধান শুরু হল। সেটা পেতে দেরিও হল না। আজ সকালেও ডায়েরি লিখেছেন সুধাময়, 'এখন সংসারে বাস করতে ইচ্ছে হয় না। কেন এককালে পঞ্চাশ পেরিয়ে গেলে বনে যাওয়ার নির্দেশ থাকত তা এখন বুঝতে পারছি। বিবর্তনের জন্যে পঞ্চাশকে সত্তর করা উচিত। এখন আমি একটি দ্বীপের মত বাস করছি। ছেলে আমাকে অশ্রদ্ধা করে না কিন্তু সে স্বাবলম্বী হবার পর ধীরে ধীরে আমার সঙ্গে কিরকম দূরত্ব তৈরী হয়ে গেল। এখন তাকে আমি বুঝতে পারি না। মনোরমা আমাকে ভালবাসে কিন্তু বোঝে না। বউমা ভাল মেয়ে কিন্তু আমার সঙ্গে দূরত্ব তো রাখবেই। ভরসা শুধু নাতি। তাও বা কদিন।' বিকেলে আবার লিখেছেন, 'একটু আগে নাতিকে বললাম। তথাকথিত হিন্দুমত বলে যেভাবে মৃতের সৎকার করা হয় তা আমার কাছে বীভৎস বলে মনে হয়। মৃত আত্মীয়ের মুখে পিণ্ড গুঁজে দিতে হয় শ্মশানে, এ আমি ভাবতেও পারি না। আমি নাতিকে বলেছি, আমায় হিন্দুসৎকার সমিতির কাঁচের গাড়িতে যেন নিয়ে যাওয়া হয়। কাচা নেওয়া বা মাথা ন্যাড়া করা আমি একদম পছন্দ করি না। তাই কেউ ও কাজ করবে না। আমার শ্রাদ্ধের নাম করে ব্রাহ্মণ বা আত্মীয়রা এসে গণ্ডেপিণ্ডে খাবে তা আমি চাই না। এগুলো যেন না করা হয়। আমার নাতি এসব শুনে বলল, এমন করে বলছ যেন এখনই মরে যাচ্ছ। সত্যি তো। এখনও কতদিন থাকতে হবে। মাথায় আসে তাই বলি।'

প্রবরের মামা বলে উঠলেন, 'বাঃ। গাইড লাইন পাওয়া গেল যখন তখন সেইমত ব্যবস্থা করা যাক। এতে ওঁর আত্মা তৃপ্তি পাবে।'

জেঠতুতো দাদা আপত্তি করলেন, 'তাই বলে শ্রাদ্ধ হবে না? কাঁচের গাড়ি বা ইলেকট্রিক চুল্লি ঠিক আছে। পয়সা ধরে দিলে চুল কামাতে হয় না, কাচাও না হয় নিতে হবে না। কিন্তু শ্রাদ্ধ—, ঠিক আছে, যা ভাল বোঝ কর।'

কাঁচের গাড়ির পেছন পেছন আত্মীয়রদের আনা গাড়িতে প্রবর শ্মশানে গেল। পারমিতা আপত্তি করতে গিয়েও করেনি। জীবনে প্রথমবার শ্মশানে পৌঁছে প্রবর দেখল সেখানে আরও তিনটি মৃতদেহ এসেছে। দুটিকে দাহ করা হবে চিতা সাজিয়ে। তাঁদের শরীর শুইয়ে রেখে শ্মশানযাত্রীরা চা খাওয়ার জন্যে ছোটাছুটি করছে। একটি মৃতদেহের কাছে কেউ নেই, অন্যটির পাশে দুজন বসে সিগারেট খাচ্ছে। সুধাময়কে তাড়াতাড়ি চুল্লিতে ঢোকানোর জন্যে মামা তদ্বির করছিলেন। বাবা দাদুকে স্পর্শ করে মাথা নিচু করে বসে আছেন। দাদুর শরীর আর খানিক পরে থাকবে না।

এত আত্মীয় স্বজন, যাদের অনেককেই সে প্রথম দেখছে, এসে কিরকম অভিভাবকের মতন ব্যবস্থাই করছেন। এঁরা যদি রোজ আসতো তাহলে নিশ্চয়ই মা খুশী হত না। কারণ চা দিতে দিতে মা জেরবার হয়ে যেত। কিন্তু

এখন এদের খুব মূল্যবান মনে হচ্ছে। এঁরা এসেছেন বলে বাবা খুব নিশ্চিন্ত। অন্যসময় হলে নিশ্চয়ই আনন্দিত হত না।

পুরোহিত তাঁর অভ্যস্ত কাজকর্ম করতে গেলে মামা বাধা দিলেন। সুধাময়কে ট্রে-তে শুইয়ে দেওয়ার পর সেটি যখন চুল্লির লাল আগুনে ঢুকে যাচ্ছিল তখন প্রবাল চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল। আর তখনই, সেই প্রথম শরীর কাঁপিয়ে টপটপ করে জল ঝরতে লাগল প্রবরের চোখ থেকে। জলে অন্ধ হয়ে সে বাবাকে জড়িয়ে ধরল। পুত্রকে দুই হাতের মধ্যে পেয়ে প্রবাল নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করছিল প্রাণপণে। জেঠতুতো ভাই ধরা গলায় বলে উঠলো, বল হরি, হরি বল। দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

এখন ওই বন্ধ চুল্লিতে ঠিক কিভাবে সুধাময় ভস্ম হয়ে যাচ্ছেন তা জানার কোন উপায় নেই। কান্না থামিয়ে প্রবর সেই লম্বা খুপরিটার দিকে তাকিয়ে ছিল একদৃষ্টিতে। শব্দ হচ্ছে। মামা তাকে বাবার হাত থেকে সরিয়ে ধীরে ধীরে শ্মশানের বাইরে খোলা আকাশের নিচে নিয়ে এল। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। এই সময়েও দোকানগুলোর রেডিওতে হিন্দী গান বাজছে। পৃথিবীর সর্বত্র বোধহয় ঠিকঠাক একই জীবন চলছে, শুধু দাদু নেই। মামা সস্নেহে জিজ্ঞাসা করলেন, 'খুব কষ্ট হচ্ছে?'

প্রবর মাথা নেড়ে বলল, 'না।'

মনোরমা কেমন জবুথবু হয়ে গেলেন। স্বামীর শ্রাদ্ধ হয়নি, তাঁকে স্মরণ করে শ্রদ্ধাসঙ্গীতের ব্যবস্থা করেছিল ছেলে, এটা তিনি মেনে নিতে পারেননি। প্রবাল তাঁকে বলেছে মন থেকে সে এসব করছে না, বাবার নির্দেশই মানছে। যে মানুষটার বেঁচে থাকতে কোন বাস্তবজ্ঞান ছিল না, মরে যাওয়ার পর তাঁর নির্দেশ মানতে হবে এ কেমন কথা? মনোরমা চিরকাল সুধাময়কে তাঁর ভুল ধরিয়ে দিয়ে আগলে আগলে রেখেছিলেন। আশ্চর্য, মরার আগে সেই মানুষটাই ডায়েরিতে লিখে গেল তিনি তাঁকে বোঝেননি। তাহলে বুঝলটা কে? সারাজীবন ধরে হাড়ে হাড়ে বুঝতে হয়েছে তো তাঁকেই।

মৃত্যুর তিন চার দিন পর থেকেই অশান্তি শুরু হয়েছিল। শেষপর্যন্ত পণ্ডিতদের মতামত নেওয়া হল। তাঁরা বললেন শাস্ত্রমতে শ্রাদ্ধ করা যুক্তিসঙ্গত। তবে অন্য ধর্মাবলম্বীরা তো একই কাজ করে না। সুধাময় যখন বিশেষ নির্দেশ দিয়ে গেছেন যখন তাঁকে অন্য ধর্মাবলম্বী ভাবলে এটি বর্জন করা যেতে পারে। মনোরমা নিজের কানে কথাগুলো শোনেননি। তাই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করেনি! মেনে নিয়েছেন বাধ্য হয়ে কিন্তু চুপ মেরে গিয়েছেন।

আর একটি অশান্তির কারণ হয়েছে প্রবর। সে মাছ মাংস ডিম খাওয়া বন্ধ করেছে। সে পণ করেছে ঠাকুমা ওগুলো না খেলে সে-ও খাবে না। দাদু তাঁকে নির্দেশ দিয়ে গেছেন ঠাকুমাকে আগের মত রাখতে। অনেক বলেও সে মনোরমার মন জয় করতে পারেনি। নিজের সঞ্চয়ে যে কটি সাদা শাড়ি ছিল তাই গায়ে তুলেছেন। কিন্তু যেভাবে লোকে অশৌচ পালন করে ঠিক সেইভাবে রয়েছেন। খাওয়া দাওয়া একেবারে নিয়ন্ত্রিত। ফলে বাড়িতে আমিষ ঢুকছে না। ছেলে না খেলে বাবা মা খায় কি করে? ব্যাপারটা মনোরমা জানেন। চাপ পড়ছে তাঁর মনে। শেষপর্যন্ত শ্রাদ্ধের দিনটি পেরিয়ে গেলে

পারমিতা বলল, 'মা, আজকাল কেউ এ নিয়ে বাদবিচার করে না। আমার কাকিমাও তো খান। আপনি না খেলে টুকলুকে রাজি করানো যাবে না।' মনোরমা কেঁদে উঠলেন। কিন্তু সেদিন নিতান্ত বাধ্য হয়েই মাছের টুকরো দাঁতে কাটলেন। দীর্ঘ জীবন যিনি আমিষে অভ্যস্ত, এই কদিন শোক এবং নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন তাঁর শরীরে বমিবমি ভাব এনে দিল। মনের চাপ এমন প্রবল হয়ে উঠল যে তিনি আর ঘর থেকে বের হন না। যেচে কথা না বললে কথা বলেন না।

ঠাকুমার এই পরিবর্তন প্রবরকে চিন্তিত করেছিল। ইতিমধ্যে তার কানে এসেছে যে দাদুকে ভীষণ ভালবাসতেন বলেই তাঁর চলে যাওয়াতে ঠাকুমা অমন হয়ে গেছেন। ইতিমধ্যে দাদু যা যা ব্যবহার করতেন তা ঠাকুমা আলমারিতে তুলে রেখেছেন। এমন কি চটিজোড়া পর্যন্ত। কেউ কাউকে ভালবাসলে তার কথা শোনে। তাহলে দাদুর কথা কেন শুনছেন না ঠাকুমা? কেন নিজের মতন করে সব কিছু ভাবছেন? হঠাৎ তার মনে হল, দাদু তো ঠাকুমাকে কোন নির্দেশ দিয়ে যাননি। কেন দেননি? দাদু কি জানতেন ঠাকুমাকে নির্দেশ দিলেও কোন কাজ হবে না? আর এদিকে দাদু তাঁকে কিছু বলেননি বলেই ঠাকুমা কষ্ট পেয়েছেন হয়তো, আর সেই কষ্ট থেকে অশান্তি করে গিয়েছেন। প্রবর এই জটিল ব্যাপারটা নিজের মত করে সমাধান করতে চেয়েও পারছিল না।

জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষার কিছু আগে আগে যখন এই বিপত্তি তখন প্রবালের ধারণা ছিল রেজাল্ট ভাল হতে পারে না। কিন্তু সবচেয়ে চমকে গেল সূর্য। ফাইন্যালে প্রবর তার থেকে তিন নম্বর পেয়ে টেনথ হয়েছে। ওই তিনের মধ্যে আরও চারজন থাকায় সে পনের নম্বরে জায়গা পেয়েছে। হেডমাস্টারমশাই ফল ঘোষণা করলে সূর্য সোজা এগিয়ে এসে প্রবরের হাতে হাত মিলিয়েছিল, 'অভিনন্দন।'

হঠাৎ প্রবরের মনে হল কাজটা ঠিক হয়নি। সূর্য আর একটু বেশী খাটলে তার থেকে এক নম্বর বেশী পেতে পারত। তাহলে কখনও দ্বিতীয় না হওয়া রেকর্ড বজায় থাকত ওর। এখন কেমন করুণ হয়ে গেছে সূর্যর মুখ। প্রথম বিভাগে এবং বেশ কয়েকটা স্টার যেন আর ধর্তব্যের বিষয় নয়। সে হেরে গিয়ে অভিনন্দন জানাচ্ছে। যেভাবে অনেকদিন এক নম্বরে থাকা টেনিস প্লেয়ার ম্যাচে হেরে বিজয়ী প্রতিপক্ষের সঙ্গে সৌজন্য দেখিয়ে হাত মেলাতে বাধ্য হয় এও তেমনি। দশম না হয়ে ষোলতে নাম থাকলে তার এমন কি ক্ষতি হত। সূর্যর সঙ্গে আর তার প্রতিযোগিতা হবে না। ও বিজ্ঞান নিচ্ছে না, প্রবর বিজ্ঞান নিয়েই পড়বে। দাদুর ইচ্ছে ছিল সে ডাক্তার হোক, তার নিজেরও খারাপ লাগে না। সূর্য বলে, 'আমি ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক হতে চাই।' তাহলে পথ এখন থেকে আলাদা। কি রকম উদাস উদাস হয়ে যাচ্ছিল প্রবরের মন।

বাড়িতে এখন শান্তির আবহাওয়া। মা বাবা খুব খুশী। এমন কি ঠাকুমাও খবর শুনে অনেকদিন বাদে সামান্য হাসলেন। খাওয়ার টেবিলে বসে প্রবাল

বলল, 'এখন তুই সাবালক। আগে সবাই কলেজে যেত ওই বয়সে। এবার তুই মুখটা সাফ কর। আমি ভাল রেজর প্রেজেন্ট করছি, সেভ করে ফেল।'

পারমিতা আপত্তি করল, 'নারে। একদম দাড়ি কামাবি না। নরম দাড়িতে সুন্দর দেখাচ্ছে তোকে। একবার কামাতে আরম্ভ করলে সারাজীবনে নিস্তার পাবি না।'

সে বড় হয়ে গেছে। প্রবরের প্রায়ই এই কথা মনে হয়। আজকাল গম্ভীর হয়ে থাকতেই ভাল লাগে। কথা না বলার অভ্যেসটা অবশ্য অনেক কেটেছে। আজ পড়ার টেবিলে বসে জানলা দিয়ে বাইরে তাকাতেই নতুন ফ্ল্যাট বাড়িটার দিকে নজর গেল। চোখের সামনে একটু একটু করে বাড়িটাকে তৈরী করে ফেলল প্রমোটার। কদিন থেকেই লোক আসছে বিভিন্ন ফ্ল্যাটে। আজ একেবারে সামনের ফ্ল্যাটের জানলায় পর্দা পড়ে গেছে। প্রবর দেখল কেউ একজন পর্দাটা সরালো। ফর্সা সুন্দর একটি মুখ জানলা দিয়ে এগিয়ে এসে নিচের দিকে তাকাল। তারপর মুখ তুলতেই তার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। দুই কি তিন মুহূর্ত। হঠাৎ মেয়েটি ফিক্ করে হেসে ভেতরে চলে গেল। বুকের ভেতরটা কেমন চনমনিয়ে উঠল প্রবরের। মেয়েটা তাকে দেখে ওইভাবে হাসল কেন? এমন হাসি তার দিকে তাকিয়ে কেউ হাসেনি আজ পর্যন্ত। তার খুব ইচ্ছে করছিল মেয়েটিকে আর একবার দেখতে। ঠায় বসে রইল সে কিন্তু মেয়েটা আর জানলায় আসছিল না। পারমিতা যখন তাকে প্রয়োজনে ডাকল তখন জানলা ছেড়ে উঠে যেতে ইচ্ছে করছিল না প্রবরের।

এখন সারাদিন কেমন জ্বরজ্বর ভাব আর শরীরের তাপ একটুও বাড়েনি। সবসময় তাকে পড়ার টেবিল টানছে। চেয়ারে বসলেই নজর চলে যাচ্ছে জানলার বাইরে। সেই মেয়েটিকে আর একবার দেখতে পেয়েছে। সূর্য সুনীল গাঙ্গুলির কবিতা আবৃত্তি করত। রবীন্দ্রনাথ কিংবা জীবনানন্দ নয়, একেবারে আজকের কবি। এতে যে ও প্রচণ্ড আধুনিক তা প্রমাণিত হয়ে যেত। সেই কবিতার একটা লাইন যেন ঠিকঠাক মিলে গেল এখন, ভূপল্লভ ডাক দিলে দেখা হবে চন্দনের বনে। মেয়েটি যেভাবে ভ্রু তুলে তার দিকে তাকিয়েছিল তাতে সেইরকম আহ্বান ছিল বলে মনে হচ্ছিল প্রবরের।

আজ সারাদিন কোথাও যায়নি সে। পারমিতা বলেছে, 'এই তো সবে রেজাল্ট বের হল, এখনই কি এত পড়াশুনো করছিস?'

প্রবর হেসে বলেছিল, 'তুমি বুঝবে না।'

দ্বিতীয় দিনে এই পরিবারটির মোটামুটি একটা চেহারা পেয়ে গেল সে নিজের চেয়ারে বসেই। চারজনের সংসার। একটি চাকরও আছে। বাবার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। মা পারমিতার বয়সী এবং বেশ গিন্নিবান্নি। ওরা দুটো বোন। একজন হাসে অন্যজন গম্ভীর হয়ে থাকে। যে গম্ভীর সে খুবই সাধারণ। জানলায় এলে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। কে বড় তা প্রবর বুঝতে পারছে না। কিন্তু এর মধ্যে যার জন্যে এত অপেক্ষা তার দেখা সে কয়েকবার পেয়েছে। আর দেখা হলেই সেই হাসি যা আলোর মত ধুইয়ে দেয়।

এ এক অন্যরকম অনুভূতি যা এর আগে কখনও হয়নি। রাত্রে একা

বিছানায় শুয়ে চোখ বন্ধ করলেও ওই হাসি যেন সামনে থেকে মুছতে চায় না। ঘুম আসে না। হঠাৎ মনে হল ওর সঙ্গে কথা বলতেই হবে। কি ভাবে সামনে যাওয়া যায় ? কেমন ভয় ভয় করতে লাগল। যদি সামনে গিয়ে কথা বললে মেয়েটি রেগে যায়। যদি ওর বাড়ির লোকজন এ বাড়িতে নালিশ জানাতে আসে ? রীতিমত ঘেমে উঠল প্রবর। তার মনে হল কারো সঙ্গে এ-ব্যাপারে আলোচনা করা দরকার। মা তার খুবই বন্ধু, কিন্তু এসব কথা যে মায়ের সঙ্গে বলা যায় না তা সে বুঝতে পারছে। সূর্যকে বলা যায়। এখন ছুটির সময়। আলোচনা করতে হলে সূর্যর বাড়িতে যেতে হয়। সে জানে সূর্যর অনেক মেয়েবন্ধু আছে। তারা নাকি সবই ওর প্রেমে পড়ার জন্যে লাইন দিয়ে অপেক্ষা করছে। অতএব সূর্য তার অভিজ্ঞতা থেকে তাকে সাহায্য করতে পারে। এতদিন সূর্য প্রবরের কোন মেয়েবন্ধু নেই বলে ঠাট্টা করত। আজ একটা যোগ্য জাবাব দেওয়া যাবে। ভাবনাটা এমন হওয়ার পরে নিশ্চিন্তে ঘুম এল।

পরদিন সকালে জানলায় দাঁড়াতেই মন খারাপ হয়ে গেল। সে দাঁড়িয়েছিল আগে থেকেই। প্রবরের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই ঠোঁট দুটো বেঁকিয়ে অদ্ভুত ভঙ্গী করে সরে গেল জানলা থেকে। কেন এমন করল। একটুও না হেসে চলে যাওয়া মানে তাকে অপছন্দ করা। প্রবর ছটফট করতে লাগল। অদ্ভুত একটা কষ্টের স্বাদ পেল সে। ইচ্ছে হচ্ছিল ছুটে গিয়ে মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করে তুমি কেন অমন ভঙ্গী করলে ?

আটটা নাগাদ সূর্যর বাড়িতে যাচ্ছে বলে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল। এখন তার যাতায়াতের উপর পারমিতা কোন বিধিনিষেধ আরোপ করে না শুধু ঠিক সময়ে ফিরে এলেই হল। রাস্তায় নেমেই পা যেন ভারি ভারি ঠেকল। নতুন ফ্ল্যাটবাড়িটার সামনে পৌঁছে সে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। খুব শান্ত বাড়ি। এখনও সব বাসিন্দা আসেনি। যে যদি সোজা ওপরে উঠে গিয়ে মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করে কেন ওভাবে চলে গেলে তাহলে কেমন হয় ? খুব ইচ্ছে করছিল কিন্তু সাহসে কুলালো না। হঠাৎ সে দেখতে পেল ভদ্রলোককে। হাতে ছোট ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে আসছেন ফ্ল্যাট বাড়ি থেকে। একেই সে জানলায় দেখেছে। মনে হয় ওই মেয়েদের বাবা। সে চট করে সামনে থেকে সরে গেল। একটা গাড়ি দাঁড়িয়েছিল রাস্তায়। ভদ্রলোক সেটায় উঠে বসতেই গাড়িটা বেরিয়ে গেল। ওদের তাহলে গাড়ি আছে। কিন্তু গাড়িটা তো ভেতরেই থাকতে পারত, বাইরের রাস্তায় অপেক্ষা করবে কেন ?

সূর্য বাড়িতেই ছিল। এ বাড়িতে সে বেশ কয়েকবার এসেছে। সূর্য তাকে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে গল্প করেছে। সেসময় দরজাটা ভেজিয়ে রাখত সে। সূর্যদের চাকর খাবার এনে দিত। আজ সূর্যর মা বাইরের ঘরে বসে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছিলেন। তাকে দেখতে পেয়ে বললেন, 'কনগ্রাচুলেশন'।

প্রবর লজ্জা পেল। ভদ্রমহিলা বললেন, 'যাও, ও ভেতরেই আছে। মাসতুতো বোনেরা এসেছে, তাদের সাথে গল্প করছে। যাও।' প্রবর মাথা নিচু করে ভেতরে ঢুকে গেল। সূর্যর ঘরের রাস্তা সে চেনে।

দরজাটা ভেজানো ছিল। ভেতর থেকে হাসির আওয়াজ ছিটকে আসছে। মেয়েদের গলা খুবই তীব্র। একটু ইতস্তত করে প্রবর দরজায় টোকা দিল। হাসি থামল এবং সূর্যর গলা শোনা গেল, 'কে ?'

'আমি, প্রবর।'

সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেল এবং একটি শাড়ি পরা অল্পবয়সী মেয়ে দুহাতে দরজার পাল্লা ধরে বলে উঠল, 'এ আবার কে !'

এইসময় সূর্যকে দেখা গেল, 'হোয়াট এ সারপ্রাইজ। আয় ভেতরে আয়। এ হল প্রবর, খুব ভাল ছাত্র, আমার বন্ধু। আর এরা আমার মাসতুতো বোন, গান আর স্লোগান।'

দরজায় দাঁড়ানো মেয়েটি দৌড়ে গিয়ে সূর্যর জামা আঁকড়ে ধরল, আর একটি স্কার্ট পরা মেয়ে একই সময়ে চিৎকার করে সূর্যকে বকতে লাগল। হাত তুলে হার স্বীকার করার ভঙ্গীতে সূর্য বলল, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে বাবা, উইথড্র করে নিচ্ছি। এই শাড়ি পরাটি হচ্ছে তান, আর ইনি গান।'

মুক্ত হয়ে জামা ঠিক করতে করতে সূর্য বলল, 'ভয় পাস না, এদের মন খুব ভাল।'

শাড়ি পরা মেয়েটি বলল, 'এরকম নাম এর আগে কখনও শুনেছেন ?'

মাথা নাড়ল প্রবর, না। তার মন খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। সে ভেবেছিল সূর্যকে একা পাওয়া যাবে।

স্কার্ট পরা বলল, 'একদম এক্সেপশনাল। নামের মত আমরাও।'

সূর্য জিজ্ঞাসা করল, 'কেন ? প্রবর নামটা এর আগে শুনেছিস ?'

শাড়ি পরা বলল, 'না। তবে কেমন ফানিফানি।'

প্রবর শান্ত গলায় বলল, 'গান কিংবা তান অবশ্য খুব সিরিয়াস নাম।'

যার নাম গান তার পরনে স্কার্ট, বলল, 'সত্যি কি সমঝদার !'

সূর্য প্রবরকে টেনে নিয়ে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিল, 'এবার সন্ধি। বল কি ব্যাপার, হঠাৎ এই সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিস ?'

প্রবর নিচু গলায় বলল, 'একটু কথা ছিল।'

'বল।' সূর্য স্বাভাবিক ভাবেই বলল।

প্রবর মুখ তুলে তাকাতেই প্রথমে তান পরে গানের সঙ্গে চোখাচোখি হল। হঠাৎ এই দুই কিশোরী তাকে যেন খুব নার্ভাস করে দিল। সে বলল, 'থাক। পরে বলব।'

'আরে থাকবে কেন ? ও, ওরা আছে বলে ? দূর ! আমরা খুব বন্ধু। ওদের সামনে সঙ্কোচ করিস না। বলে ফ্যাল। প্রব্লেমটা কি ?' সূর্য জিজ্ঞাসা করল।

তান বলল, 'না বাবা, চল গান, আমরা অন্যঘরে যাই। মনে হচ্ছে খুব প্রাইভেট কথা।'

প্রবর তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'না, সেরকম ব্যাপার নয়।'

'কি রকম ব্যাপার ? গান জিজ্ঞাসা করল।

মুখে রক্ত জমল প্রবরের। ওর মনে হল এখানে না এলে সে বেঁচে যেত। এবার তান ওকে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, বলুন তো, আপনি কি প্রেমে পড়েছেন ?'

'প্রেমে !' হকচকিয়ে গেল প্রবর। সঙ্গে সঙ্গে হো হো করে হেসে উঠল সূর্য।

'কেন ? হাসির কি হল ?' তান জানতে চাইল।

সূর্য হাসতে হাসতেই বলল, 'প্রবর এত গুড বয় যে ওর কোন মেয়েবন্ধু নেই তো প্রেমে পড়বে ! ইন ফ্যাক্ট আমিই ওর একমাত্র ছেলে বন্ধু। প্রেমট্রেম ওর আসে না।'

'এমা, তাই ?' গান খিলখিল করে হেসে উঠল।

প্রবরের খুব রাগ হয়ে গেল। সে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি মোচার ঘন্ট রাঁধতে পারেন ?'

গান অবাক হয়ে বলল, না।'

'আপনি প্যারাসুট নিয়ে লাফাতে পারেন ?'

'না।'

'আপনি প্লেন চালাতে পারেন ?'

'কখনও চান্সই পাইনি, পেলে চেষ্টা করতাম।'

'ঠিক। আমিও কখনও চান্স পাইনি।'

তান কোমরে হাত রেখে কথাগুলো শুনছিল। এবার বলল, 'বাঃ। এতো দেখছি খুব স্মার্ট। ভাল কথা বলে। চান্স কেউ দেয় না মশাই, করে নিতে হয়।'

'অ্যাদ্দিন আমার সেই ইচ্ছে হয়নি।' প্রবর গম্ভীর গলায় বলল।

'এখন হয়েছে ?' তান হাসল। কাকে দেখে ? আমাদের দুজনকে দেখে নাকি ?'

গান বলল, 'এ্যাই দিদি ! যাঃ। খালি ফাজলামি। দেখছিস না মুখ কেমন হয়ে গিয়েছে। ওটা হলে বাইরে কোথায় হয়েছে তাই বন্ধুর কাছে কথা বলতে এসেছেন।'

সূর্য বলল, 'কিরে, তাই নাকি ? ইন্টারেস্টিং। তুই শেষ পর্যন্ত ? না বিশ্বাস করতে পারছি না ! বল, বল, খু ল বল। প্রব্লেম সলভ করে দিচ্ছি।'

তান এসে বসল গানের পাশে, 'নির্দ্বিধায় বলুন। সূর্য যেটা সলভ করতে পারবে না আমরা তা পারব। জানেন তো মেয়েদের তিনটে চোখ থাকে।'

প্রবর ওদের দিকে তাকাল। তানের বয়স তাদের সমান হতে পারে কিন্তু গান পনের পার হয়েছে কিনা সন্দেহ। অথচ ওরা এমন ভান করছে যে কত অভিজ্ঞ। কোথায় যেন সে পড়েছিল মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে আরো পরিপক্ক হয়। অর্থাৎ বেশী পাকা হয়। তা হোক। এরা যদি শুধুই ঠাট্টা না করে যায় তাহলে ভাল বুদ্ধি দিতেও তো পারে। কিন্তু তবু তার অস্বস্তি হচ্ছিল। সদ্য পরিচিত মেয়েদের কি এসব কথা বলা যায় ?

সূর্য বলল, 'শোন, আমার লাস্ট প্রেম-হল তানের এক বন্ধুর সঙ্গে। কিন্তু তান চেষ্টা করেও সেই প্রেমকে বাঁচাতে পারেনি। কিন্তু চেষ্টা যে করেছিল তা স্বীকার করতেই হয়।'

তান ফোঁস করে উঠল, 'বাঃ। তার আগে তুই ওর আর এক বন্ধুর পেছনে লাইন দিয়েছিলি। সেটা জেনেই তো কেটে গেল। তাছাড়া ওর একটা স্টেডি

বয়ফ্রেন্ড আছে।'

'থাক। তাই নিয়ে থাক। আমি আর ইন্টারেস্টেড নই।' সূর্য মুখ বাঁকালো।

'আঙুরফল টক।' গান হাসল।

সূর্য মন্তব্যটিকে উপেক্ষা করে বলল, 'তোর ব্যাপারটা বল।'

এইসব কথাবার্তা শুনে একটু যেন ভরসা পাচ্ছিল প্রবর। এরা কি স্বচ্ছন্দ! যেহেতু তাদের বাড়িতে কোন সমবয়সী মেয়ে নেই তাই তার জড়তা আসছে এদের সামনে। সে বলল, 'তেমন কিছু নয়।'

সূর্য জিজ্ঞাসা করল, 'মেয়েটা নিশ্চয়ই স্কুলে পড়ে?'

'হয়তো। কি পড়ে আমি জানি না।'

তান জিজ্ঞাসা করল, 'কি নাম ওর?'

'আমি জানি না।'

একটু বাঁকা গলায় গান বলল, 'সেকি? আলাপ হয়েছে অথচ নাম জানেন না!'

'আমার সঙ্গে আলাপ হয়নি।'

তিনজনের মুখ থেকেই বিস্ময়সূচক শব্দ বের হল। সূর্য জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার বলতো? আলাপ হয়নি, নাম জানিস না, কোথায় থাকে জানিস?'

'জানি। আমাদের উল্টো দিকে একটা নতুন ফ্ল্যাট বাড়ি হয়েছে। সেখানেই ওরা এসেছে দু'দিন হল। বললাম তো, তেমন কিছু ব্যাপার নয়।'

এবার একটু হালকা লাগল প্রবরের।

তান বলল, 'ও বুঝতে পেরেছি। শুধু চোখে চোখে কথা বলা আরম্ভ হয়েছে?'

প্রবরের মুখ থেকে বেরিয়ে এল, 'কি করে বুঝলেন?'

'জানি মশাই, জানি। রাস্তায় দেখা হয়েছে না জানলা দিয়ে?'

'জানলা দিয়ে।'

'তারপর মাঝে মধ্যে আসছে আবার হাওয়া হয়ে যাচ্ছে, তাই তো?'

'ঠিক তাই।'

'সবসময় হাসছে না কোন ইশারা করছে?'

'না, সেসব কিছু করেনি। তবে আজ দেখা হতেই খুব গম্ভীর হয়ে সরে গেল।'

'সেকেন্ড স্টেজ। আপনার ইন্টারেস্ট আছে কিনা যাচাই করছে। এগুলো খুব কমন ব্যাপার। আমি অনেক করেছি। সামনে পড়লে এমন ভান করেছি যেন চিনিই না। ওর মুখোমুখি হলে দেখবেন ঠিক তাই করবে। আপনার এখন অন্যরকম লাগছে সবকিছু?'

তান যে এতটা জানে আন্দাজ করতে পারেনি প্রবর। সে চুপ করে রইল। তান বলল, 'আপনি এক কাজ করুন। বাড়িতে গিয়ে আপনার ওই জানলাটা বন্ধ করে দিন। একদিন একদম খুলবেন না। ও দেখুক আপনি ব্যাপারটা পছন্দ করছেন না। এর ফল উল্টো হতে পারে।'

সূর্য বলল, 'বুঝেছি। এর পর যখন জানলা খুলবে সেদিন মেয়েটি—।'

'দূর !' তান বলল, 'মেয়েটা অপমানিত বোধ করবে। আর সেটা হলে রাস্তায় দেখা হলে নিজে থেকে কথা বলে পাল্টা আলাপ করতে চাইবে। তারপর রাগ থেকে অনুরাগ।'

'কিন্তু রাস্তায় দেখা হবে কি করে ?' প্রবর জানতে চাইল।

'একটু লক্ষ্য রাখলেই দেখতে পাবেন ও বেড়াতে যাওয়ার অছিলায় বিকেলে বাড়ির সামনে পায়চারি করতে শুরু করবে।' তান জানাল।

এবার গান বলল, 'এসবের কিছুই যদি না হয় ?'

'না হয় মানে ?' তান বোনের দিকে তাকাল।

'উনি জানলা বন্ধ করে দিলেন। মেয়েটাও আর ওর সম্পর্কে আগ্রহী হল না।'

'তাহলে চুকে গেল। পরে কষ্ট পেতে হবে না।'

সূর্য জিজ্ঞাসা করল, 'দেখতে কেমন রে ?'

অন্যমনস্ক প্রবর বলল, 'আমি শুধু মুখ দেখেছি।'

'বাবা ! মুখ ছাড়াও অন্যকিছু দ্যাখেন নাকি আপনি ?' তান খোঁচা দিল। আবার মুখে রক্ত জমল প্রবরের। গান বলল, 'অ্যাই দিদি, অসভ্যতা করিস না। হ্যাঁ, মুখটা কেমন ?'

'ভালই।'

'ভালই ?' সূর্য গলা তুলল, 'শুধু ভাল হলে তুই এতদূর ছুটে আসতিস ? উঃ, আমার খুব দেখতে ইচ্ছে করছে।'

তান বলল, 'গেলেই হয়। দেখে আসা যেতে পারে।'

সূর্য জিজ্ঞাসা করল, 'কি ভাবে ?'

তান একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'আজ বিকেলে চল আমরা তিনজনে ওখানে যাই। সোজা ওদের ফ্ল্যাটের দরজায় নক করি। কেউ দরজা খুললে বলব, আমরা ওখানেই থাকি, ওরা নতুন এসেছে বলে আলাপ করতে এলাম।'

গান বলল, 'তিনজন কেন ? ইনি যাবেন না ?'

'না। ওর কেস কি হয়ে আছে তাতো আমরা জানি না। হয়তো মেয়েটা তার মাকে বলেছে উল্টোদিকের বাড়ির একটা ছেলে সারাক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থাকে। তাই রিস্ক নেওয়া উচিত হবে না। ওর মা নিশ্চয়ই প্রশ্ন করবে আমাদের সম্পর্কে। যা সত্যি তাই বলব। শুধু মিথ্যেটুকু হল আমরা ওই পাড়াতেই থাকি।' তান হাসল।

সূর্য বলল, 'গুড। একটা অ্যাডভেঞ্চার হবে। ওখান থেকে বেরিয়ে আমরা তোদের বাড়িতে যাব। মেয়েটা যদি চালু হয় তবে ওকেও নিয়ে যেতে পারি। তুই আজ আর বাড়ি থেকে বের হবি না। আমরা চারটে নাগাদ ওখানে যাব। ঠিকানাটা বল।'

প্রবর খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। সূর্য এবং ওর বোনেরা যে তার জন্যে এত করবে তা সে ভাবতে পারেনি। সে সূর্যকে মেয়েটির ফ্ল্যাটের অবস্থান ভালভাবে বুঝিয়ে দিল।

দুপুর থেকেই বুকের মধ্যে ড্রাম বাজছিল প্রবরের। তান যেরকম মেয়ে

তাতে সব কিছু করতে পারে। হয়তো বুঝিয়ে সুঝিয়ে মেয়েটাকে এ বাড়িতে নিয়েও আসতে পারে। সেরকম হলে সে কি করবে ? তান বা গান সম্পর্কে পরিচয় দেওয়া যাবে কিন্তু সেই মেয়েটার কি পরিচয় দেবে মায়ের কাছে। উল্টোদিকের ফ্ল্যাটে থাকে বললে তো অনেক প্রশ্ন হবে। এক, গান যদি বলে ওরা একসঙ্গে পড়ে তাহলে ম্যানেজ হবে। গান কি তা বলতে পারবে ? ওই নিয়ে তখন আলোচনা করেনি বলে এখন আফসোস হচ্ছে।

ঘড়িতে এখন মাত্র দুটো। বন্ধ জানলার দিকে তাকাল সে। তানের কথামত বাড়িতে ফিরেই সে জানলাটা বন্ধ করে দিয়েছে। বন্ধ করার সময় অবশ্য ওই জানলায় কেউ ছিল না। জানলা বন্ধ করায় ঘরের আলো অবশ্য কমেছে। তা কমুক। কিন্তু মেয়েটা নিশ্চয়ই এতক্ষণ বন্ধ জানলা দেখে সাত-পাঁচ ভাবতে আরম্ভ করেছে। আচ্ছা, মেয়েটা কি ধরনের মেয়ে ? তান কিংবা গানের মতো স্মার্ট ? ঝরঝরে কথা বলে ? অবশ্য গান একটু চাপা। চোখের চাহনিও অন্যরকম। গানের সঙ্গে দূর থেকে দেখা হলেও কি একই অবস্থা হত ?

'কিরে ? ঘর অন্ধকার করে বসে আছিস কেন ?' পারমিতা ঘরে ঢুকল।

'অন্ধকার কোথায় ?' গলার স্বর জড়িয়ে গেল প্রবরের।

'জানলা বন্ধ কেন ? খুলে দে।'

'বড্ড ধুলো আসছে।'

'ধুলো ? এত ওপরে ? কি যাতা বলছিস ?'

'আসছে, তুমি জানো না।'

'শোন, তোকে আজ একটা কাজ করতে হবে .!'

'কি কাজ ?' বিরক্ত হল প্রবর।

'তোর ঠাকুমার বাঁ হাতটা কদিন ধরে কাঁপছে। জোর পাচ্ছেন না। নার্ভের ব্যাপার। তোর বাবা অফিস থেকে সোজা ডক্টর মুখার্জির চেম্বারে চলে যাবে। তুই তোর ঠাকুমাকে নিয়ে ট্যাক্সিতে ঠিক সাড়ে চারটের সময় ওখানে পৌঁছে যাবি। ডক্টর মুখার্জির চেম্বার কোথায় মনে আছে তো ? ওয়েলিংটনে। একবার তো গিয়েছিলি।'

মাথায় বাজ পড়ল প্রবরের। সে বলল, 'অসম্ভব।'

'অসম্ভব মানে ?'

'আজ বিকেলে সূর্যরা এবাড়িতে আসবে। চারটের পরে।'

'সূর্যরা মানে ?'

'সূর্য আর ওর বোনটোন।'

'সেকি ? আগে বলিসনি তো ?'

'এইতো আমি যখন গিয়েছিলাম তখনই জানতে পারলাম।'

'তাহলে কি হবে ? তোর বাবা যে অপেক্ষা করবে।'

'মা, তুমি ঠাকুমাকে নিয়ে যাও, আমি ট্যাক্সি ডেকে দেব।' আদুরে গলায় বলল প্রবর। পারমিতার এই প্রস্তাব একদম পছন্দ হচ্ছিল না। সে বলল, 'সূর্যদের বাড়িতে তো ফোন আছে। ফোন করে বলে দে অন্যদিন আসতে।'

'যাঃ। তা কি হয় ? নিজে থেকে বলেছে আসবে আর তখন আমি না

বলিনি। এখন বললে ভাববে আমি ইচ্ছে করে এড়াতে চাইছি।' প্রবর অসহায় গলায় বলল। তার মন খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। পারমিতা বিরক্ত হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল সে ছেলের ওপর অসন্তুষ্ট। প্রবর কি করবে বুঝতে পারছিল না। এতদিন প্রবাল কিংবা পারমিতা কখনই কোন কাজ করতে বলত না। এই সংসারের সমস্ত কাজের ঝক্কি থেকে তাকে রেহাই দেওয়া হত। ইদানীং পরীক্ষার পর পারমিতা তাকে দিয়ে টুকটাক কাজ করিয়ে নিচ্ছে। একদিন বাজারেও পাঠিয়েছিল। এসব মন্দ লাগছিল না প্রবরের। নিজেকে বড় বলে ভাবতে ভাল লাগছিল। কিন্তু সেসব করেছে তখন হাতে কোন কাজ নেই, কারো জন্যে অপেক্ষা করতে হচ্ছে না। আজ এমন বিশেষ দিন এটা মাকে বোঝানো যাবে না। নিজের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ লড়াই করল সে। ডাক্তার যদি চটপট ঠাকুমাকে দেখে দেয় তাহলেও সে পৌনে ছটার আগে বাড়িতে ফিরে আসতে পারছে না। ততক্ষণ সূর্যরা থাকবে না। সূর্য যদি একা হত তাহলে আলাদাভাবে ভাবা যেত কিন্তু তান এবং গান আসবে সঙ্গে। ওরা কেন তার জন্যে অপেক্ষা করবে? আর সত্যি সত্যি যদি ওরা তাকে নিয়ে আসে এবং সে বাড়িতে না থাকে তাহলে? ছটফট করতে লাগল সে।

প্রবর ঠাকুমার ঘরে গেল। মনোরমা শুয়ে আছেন চুপচাপ, চোখ খোলা। প্রবর জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন আছ? তোমার নার্ভে খুব ব্যথা লাগছে?'

মাথা নাড়লো মনোরমা, হ্যাঁ। নাতিকে দেখে একটু খুশীও হলেন, 'তুই আমাকে নিয়ে যাবি?'

প্রবর মাথা নামালো। তারপর ঠোঁট টিপে হ্যাঁ বলল।

'বাচ্চা! কত বড় হয়ে গেছিস। এই সেদিন জন্মালি, তোর মুখে ভাত দেওয়া হল আর আজ আমার গার্জেন হয়ে তুই আমাকে নিয়ে যাচ্ছিস। তোর দাদু বেঁচে থাকলে কত খুশী হত। লক্ষ্মী ছেলে। মনোরমা প্রবরের গায়ে হাত বুলিয়ে দিলেন।

আর কিছু করার নেই। মায়ের ঘরে ঢুকে টেলিফোনের দিকে এগোল প্রবর। রিসিভার তুলে নাম্বার ঘোরাতে যাবে পারমিতার গলা পাওয়া গেল, কি ব্যাপার, কাকে ফোন?'

'সূর্যকে। নিষেধ করব।' গম্ভীর গলায় বলল প্রবর।

'দরকার নেই। ওরা এলে কমলাকে বলবে চা-জলখাবার দিতে।'

'তার মানে?' প্রবরের আচমকা আনন্দ এল মনে, 'ঠাকুমাকে কে নিয়ে যাবে?'

'কি করা যাবে! আমিই দিয়ে যাব।' পারমিতা উদাস গলায় জানাল।

'আমি তো রাজি ছিলামই!'

'সেটা মুখ দেখেই বুঝতে পারছি। তোমার বাবার সঙ্গে আমার কথা হয়ে গেছে। তুমি শুধু একটা ট্যাক্সি ডেকে দিলেই হবে।'

মায়ের মনে কোন কারণে যখন সামান্য অভিমানও জমে তখন তুমি বলে। নইলে তুই। রিসিভার নামিয়ে রেখে সে ধীর পায়ে নিজের ঘরে চলে এসেই লাফিয়ে উঠল। উঃ! কি বিশাল একটা পাহাড় যেন বুক থেকে নেমে গেল। আর দারুণ হালকা লাগছে এখন। দুপাক ঘুরে বন্ধ জানলার দিকে তাকাল

প্রবর। থাক, বন্ধ থাক। নিজের বিছানায় টান টান শুয়েই খেয়াল হল পোশাকের কথা। আজ কি পোশাক পরা যায় ? বাড়িতে সে এখনও হাফপ্যান্ট অথবা পাজামা পরে। বাটিকের কাজ করা দুটো পাঞ্জাবি আছে তার। বেশ রঙচঙে। সেগুলো পরে বাড়িতে বসে থাকা যায় না। সে ঠিক করল জিনসের প্যান্ট আর টিসার্ট পরবে।

বুড়ো এক ট্যাক্সিওয়ালার গাড়িতে মা এবং ঠাকুমাকে যত্ন করে তুলে দিয়ে নিজেদের ফ্ল্যাটে ফিরে এল প্রবর। এখন আবার তার একটু খারাপ লাগছে। যদি সূর্যের সঙ্গে কথা না হয়ে যেত তাহলে সে নিশ্চই ঠাকুমার সঙ্গী হত। দিনটা অন্যদিন যে কেন হল না !

চারটে বেজে গেছে অনেকক্ষণ। সাজগোজ করে বাড়িতে বসে ছিল প্রবর। এক জায়গায় স্থির হয়ে বসা যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে নিজের ঘরের বন্ধ জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। ওটা খুললে হয়তো দেখতে পাওয়া যেত ওই বাড়িতে সূর্যরা এসেছে কিনা। পাঁচটা বাজল। এতক্ষণ কি করছে ওরা ? কত গল্প ? নাকি খাবার টাবার দিয়েছে ? প্রবর আর অপেক্ষা করতে পারছিল না। ইতিমধ্যে কমলাদিকে সে বলেছে খাবার তৈরি করতে। সাড়ে পাঁচটা বেজে গেল। প্রবর আর পারছিল না। ইচ্ছে হচ্ছিল সোজা নতুন ফ্ল্যাট বাড়িতে গিয়ে সূর্যকে জিজ্ঞাসা করে এত কি কথা বলছে ওরা ? শেষ পর্যন্ত বাইরের ঘরের সোফায় বসে পড়ল সে। খুব ভারী হয়ে উঠছিল বুকের ভেতরটা। এইসময় টেলিফোন বাজতেই সে তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। নিশ্চয়ই সূর্যর টেলিফোন। তবে কি ওরা আজ বাড়ি থেকে বের হয়নি। কাঁপা হাতে রিসিভার তুলে হ্যালো বলতেই বাবার গলা কানে এল, 'টুকলু, তোমার বন্ধুরা কি এসেছে ?'

নিঃশ্বাস ফেলল সে, 'না, এখনও না।'

'ও। শোন, আমাদের একটু দেরি হবে। সাতটার আগে মনে হচ্ছে বেরুতে পারব না। তোমার মা বললেন ওদের বুঝিয়ে বলতে যেন কিছু মনে না করে।' প্রবাল বললেন।

'ঠিক আছে।'

টেলিফোন রেখে দেওয়ামাত্র আর একটা খারাপ লাগায় আক্রান্ত হল সে। যদি সূর্যরা আজ না আসে, আর সেটার সম্ভাবনাও নেই, ঠাকুমা কি মনে করলেন ? মায়ের কাছেও তো সে মিথ্যেবাদী হয়ে যাবে। সে আবার ছুটে গেল রিসিভারের কাছে। সূর্যর বাড়িতে ফোন করতে। ডায়াল ঘোরাতেই বেল বাজল বেশ জোরে। চট করে রিসিভার নামিয়ে রাখল সে। তার হৃদপিণ্ডের আওয়াজ যেন শুনতে পাচ্ছিল এবার। দুহাতে সার্ট ঠিক করতে করতে সে এগিয়ে গেল দরজার দিকে। দু-পায়ে জোর পাচ্ছিল না একটুও।

'সরি, বহুৎ লেট হয়ে গেল।' দরজা খুলতেই সূর্যর গলা শুনতে পেল প্রবর। সূর্যের দুই বোন ওর পেছনে। নিজেকে কোনমতে সংযত করে প্রবর বলল, 'আয় ভেতরে আয়।'

ওরা ভেতরে এল। সূর্য জিজ্ঞাসা করল, 'কাকিমা কোথায় ?'

'মা ঠাকুমাকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে গিয়েছে'। এখানে বসবি ?'

'নাঃ। তোর ঘরে চল।' সূর্য এর আগেও এসেছে তাই নিজেই হাঁটতে লাগল। প্রবর দেখল গান এবং তান দারুণ স্কার্ট পরেছে। তাদের রঙ এবং ছাঁট খুব কায়দা করা। তান জিজ্ঞাসা করল, 'তাহলে বাড়িতে আপনি একলা ?'

সে ঘাড় নাড়তেই গানের সঙ্গে চোখাচোখি হল। গান চোখের কোণে কৌতুক নিয়ে তাকে দেখছিল। চোখ পড়তেই চোখ সরিয়ে নিল।

ঘরে ঢোকামাত্র সূর্যর গলা শোনা গেল, 'এইটেই সেই জানলা, না ?'

প্রবর লজ্জা পেল, 'হ্যাঁ, মানে, ওদিকেই ফ্ল্যাটবাড়ি।'

একেবারে প্রবরের খাটে গিয়ে লম্বা হল সূর্য, 'খুলে দিতে পারিস এখন।'

সন্ধ্যে হয়ে গেছে। ঘরে আলো জ্বালতে হল। কিন্তু তাই বলে এমন অন্ধকার হয়নি যে ওই বাড়ি থেকে বোঝা যাবে না জানলা বন্ধ না খোলা। তান বিছানার এক কোণে গিয়ে বসেছে, গান প্রবরের চেয়ারে। তান বলল, 'খুব এক্সাইটেড, না ?'

গান বলল, 'হবেই তো। আসার কথা কখন, আর এলে কখন !'

'বাঃ, আমাদের দোষ নাকি ?' তান হাসল।

গান বলল, "দিদি, একটা ফোন করে দেওয়া উচিত।'

তান বলল, 'আপনাদের বাড়িতে টেলিফোন আছে ?

'হ্যাঁ।' প্রবর কিছুই আঁচ করতে পারছিল না।

'যানারে, তুই করে দে।' তান গানকে অনুরোধ করল। গান চেয়ার ছেড়ে উঠতেই প্রবর তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এল মায়ের ঘরে। টেলিফোনের সামনে পৌঁছে গান বলল, 'এটা আপনার বাবামায়ের ঘর ?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে তো মুশকিলের ব্যাপার হল।' গান হাসল।

'কেন ? মুশকিল কেন ?'

'বাঃ। আপনার কোন গার্ল ফ্রেন্ড ফোন করলে এখানে দাঁড়িয়ে সহজে কথা বলতে পারবেন না। ঘন ঘন টেলিফোন করলে ডেকে দেবার সময় আপনার মা প্রশ্ন করতে পারেন। সেটা সমস্যা নয় ?' গান রিসিভার তুলে ডায়াল করতে লাগল।

এই ব্যাপারটা কোনদিন ভাবেনি প্রবর। এখন পর্যন্ত তার টেলিফোন খুব একটা আসেও না। কিন্তু গান যা বলল সেরকম হলে তো সমস্যা হবেই। মায়ের সামনে সে কি করে কথা বলবে ? আর মা এই ঘরেই বেশিক্ষণ থাকে। টেলিফোনটাকে বাইরের ঘরে নিয়ে যাওয়া উচিত। কি করে সেটা হবে ? মা-বাবাকে বললে কারণ জানতে চাইবে। সে টেলিফোনের তারের দিকে তাকাল। যদি তার কেটে রাখা হয় এই ঘরের, নাঃ, তাতে কোন লাভ হবে না। টেলিফোন অফিসের লোক এসে ঠিক জুড়ে দিয়ে যাবে।

'হেলো, আমি গান বলছি। হ্যাঁ। সাড়ে সাতটার মধ্যে ফিরব। ঠিক আছে।' গান রিসিভার নাগিয়ে রাখতেই প্রবর জিজ্ঞাসা করল, 'বাড়িতে কথা বললেন ?'

'কেন ? আপনি কি ভেবেছিলেন কোন বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে কথা বলছি ?'

না, না, তা ভাবিনি।'

'আমরা আজ নিজেদের বাড়িতে ফিরে যাব। মা সূর্যদার বাড়িতে অপেক্ষা করছে।'

'ও। আপনাদের বাড়ি কোথায়?'

'সাউথ এন্ড পার্ক। লেকের কাছে। বলুন।' গান ভাইবোনের কাছে ফিরে যেতেই প্রবর কমলাদিকে বলল, 'তাড়াতাড়ি জলখাবার দাও, ওরা চলে যাবে।' সে এবার রুমালে মুখ মুছল। এখনও বোঝা যাচ্ছে না ওবাড়িতে কি কথা হল! নিজে থেকে জিজ্ঞাসা করতেও লজ্জা করছে। সূর্যটা তো স্বভাব পাল্টালো না।

ঘরে ঢুকে দেখল খাটে শুয়ে সূর্য সিগারেট খাচ্ছে। তার দিকে প্যাকেট বাড়িয়ে বলল, 'খা।'

'না। আমি সিগারেট খাই না।'

'এতদিন খেতিস না, এখন খাওয়ার বয়স হয়েছে। কাকিমা তো বাড়িতে নেই।'

'দূর! আমার ভাল লাগে না।'

'বুঝলাম। একটা অ্যাসট্রে দে।'

অ্যাসট্রে রয়েছে বাইরের ঘরে। তাড়াতাড়ি সেটা এনে দিয়ে প্রবর বলল, 'কমলাদি যখন খাবার দিতে আসবে তখন লুকিয়ে রাখিস।'

'কমলাদি? ও কাজের লোক? তাকে লুকোবার কি আছে?'

'মাকে বলে দেবে।' প্রবর কথাটা বলামাত্র তান হেসে উঠল, 'আপনি তাহলে এখনও নাবালক আছেন। খুব ভাল।'

'সেই অর্থে প্রাপ্তবয়স্ক হইনি, এটা তো সত্যিকথাই।'

সূর্য কাত হয়ে অ্যাসট্রেতে সিগারেটের ছাই ফেলে বলল, 'তোর গার্ল ফ্রেন্ডকে দেখলাম।'

সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভেতর ড্রাম বাজতে লাগল প্রবরের। কিন্তু সে চেষ্টা করে নিজের মুখ নির্বিকার করে রাখতে। দুই বোন এখন তার দিকে তাকিয়ে আছে।

সূর্য বলল, 'আমরা একটু দেরি করে গিয়েছিলাম। বেরুবার আগে ওদের মা এসে গিয়েছিলেন তাই দেরি হয়েছিল। তো, দরজা খুলল ওদের মা। তান বলল যা প্ল্যান করে গিয়েছিলাম। ভদ্রমহিলা খুব খুশী হলেন। নতুন জায়গায় এসে এখনও কারও সঙ্গে আলাপ হয়নি। আগে ছিলেন বেলেঘাটায়। তান ঝটপট গুল মেরে গেল। কোথায় থাকি, কি নাম সব। ভদ্রমহিলা তাঁর সমস্যার কথা বললেন। কাছাকাছি একটা নাচের স্কুলে মেয়েদের ভর্তি করতে চান। দুই মেয়ে। তান বলল, সে সাহায্য করতে পারে। এরপরে উনি মেয়েদের ডেকে আলাপ করিয়ে দিলেন। এবার তান, তুই বল।'

তান হাসল, 'দুই বোনের নাম নমিতা আর প্রমিতা। নমিতা একটু গম্ভীর, গায়ের রঙ ময়লা, দেখতে তেমন ভাল নয়। ওকে আপনি দেখেছেন?'

মাথা নাড়ল প্রবর, 'এক আধবার।'

'নমিতাই কিন্তু আমাদের সঙ্গে কথা বলছিল। ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে। ইতিহাস নিয়ে। প্রমিতা চুপ করেছিল অনেকক্ষণ। মেয়েটার আলগা চটক আছে।

তান থামল।

আলগা চটক মানে কি ? দেখতে তেমন ভাল নয় ? হাসিটা ? প্রবরের মনে হল মেয়েরা মেয়েদের চেহারার প্রশংসা কখনই করতে পারে না। টিভিতে কোন সুন্দরী অভিনেত্রীকে দেখলেই মা তার একটা না একটা খুঁত বের করবেই।

'প্রমিতা চুপচাপ হাসছিল।' তান শুরু করল, 'হাসিটা সত্যিই মিষ্টি। কিন্তু যেই ও মুখ খুলল অমনি আমরা চমকে উঠেছিলাম।'

'কেন ? প্রশ্নটা একেবারে অজান্তেই ছিটকে এল প্রবরের মুখ থেকে।

তানকে এবার গম্ভীর দেখাল, 'ওর মা বললেন, ছেলেবেলায় ওর স্বরনালিতে কি একটা প্রব্লেম হয়েছিল। তারপর থেকেই গলার স্বর খোনা হয়ে গেছে। অন্ধকারে শুনলে পেত্নী বলে ভয় পাওয়া অস্বাভাবিক নয়। ওর কোন কথাই কান খাড়া না করে শুনলে বোঝা যায় না।'

প্রবর হতভম্ব হয়ে গেল। আর এইসময় কমলাদির গলা পাওয়া গেল বাইরে থেকে, 'টুকলু'।

'হ্যাঁ, নিয়ে এস।' কোনরকমে নড়েচড়ে উঠল প্রবর।

'আপনার ডাকনাম টুকলু বুঝি ? সুন্দর।' গান বলল। কিন্তু সেদিকে মন ছিল না প্রবরের, তার খুব কষ্ট হচ্ছিল। প্রমিতা স্বাভাবিক গলায় কথা বলে না ? তারপরেই সন্দেহ হল, ব্যাপারটা এরা বানিয়ে বলছে না তো যাতে সে নিরাশ হয়।

কমলাদি খাবার দেবার আগেই সিগারেট শেষ হয়ে গিয়েছিল সূর্যর। খাবার দেখে বলল, 'বাপরে। এতো দেখছি ডিনার।'

গান বলল, 'আমি কিন্তু আধখানা ফ্রাই খাব।'

তান কমলাদিকে বলল, 'আমরা দুজনে একটা ফ্রাই ভাগ করে নিচ্ছি। আপনি আর যা আছে তা নিয়ে যান। আমরা খেতে পারব না।'

কমলাদি বলল, 'বউদি শুনলে কিন্তু খুব রাগ করবেন।'

গান বলল, 'বউদির ছেলেকে বলে যাচ্ছি মাকে বুঝিয়ে বলতে।'

কমলাদি চলে যাওয়ার পর খাবার খেতে খেতে সূর্য বলল, 'এখন তোর ইচ্ছে। তুই যদি একটা খোনা মেয়ের সঙ্গে প্রেম করতে চাস করতে পারিস। ও পড়ে শিয়ালদার লরেটোতে। সামনের সোমবার স্কুল খুলবে। ওর বাবা দিয়ে আসবেন আর মা যাবেন ছুটির সময়। এটা সাময়িক ব্যবস্থা। তুই যদি ওই ফাঁকে কথা বলতে চাস তো বলতে পারিস।'

প্রবর গুম হয়ে রইল। তার কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছিল না। তান সেটা লক্ষ্য করে বলল, 'আপনার মনে হচ্ছে ঠিক শুনছেন না, তাই না ?'

'না, মানে— !'

'একটা কাজ করলে আপনার দ্বিধা মিটে যেতে পারে। চলুন।'

'কোথায় ?

'টেলিফোন করব।'

অগত্যা তানকে নিয়ে যেতে হল। ছোট্ট পার্স থেকে কাগজ বের করল তান, তাতে টেলিফোন নম্বর লেখা। ডায়াল করে সে বলল, 'হেলো, মাসীমা

বলছেন ? আমি স্বপ্না বলছি, খানিক আগে গিয়েছিলাম আপনাদের বাড়িতে। হ্যাঁ, বাড়িতেই ফিরে এসেছি। আপনি একটু প্রমিতাকে জিজ্ঞাসা করুন তো ওদের ক্লাসে রঞ্জনা নামে কোন মেয়ে পড়ে কিনা ! রঞ্জনা লরেটোতে পড়ে। ওদের গাড়ি আছে। ওর মা চাইছেন কেউ শেয়ার করুক। আমার সঙ্গে রঞ্জনার দেখা হয়নি। যদি এক ক্লাশ হয় তাহলে—, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমিও তো সেই কথাই বলছি। প্রমিতাকে দিচ্ছেন ? ঠিক আছে।' রিসিভারে হাত চাপা দিয়ে তান বলল, 'এখন প্রমিতার গলা শুনতে পারেন নিজের কানে।' হাত সরিয়ে বলল, 'কে প্রমিতা ? আমি স্বপ্না, একটু আস্তে আস্তে বল ভাই। রঞ্জনাকে চেনো ? চেনো না। তাহলে তো মুশকিল হল। ওরা থাকে তোমাদের ঠিক পেছনের বাড়িতে। হয়তো জানলায় দাঁড়ালে দেখতেও পাবে ওদের ফ্ল্যাট।' কথাটা বলেই ঝটপট তান রিসিভার ধরিয়ে দিল প্রবরের হাতে। প্রবর কান রাখল। একি ? এতো ভুতুড়ে গলা। খ্যানখেনে। যেটুকু বোঝা গেল তা হল, 'কি জানি বাবা, হবে হয়তো। জানলায় দাঁড়াতেই দেখি একটা ছেলে ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে আছে অসভ্যের মত। এত রাগ হয় তাই জানলায় যাই না।' ওই স্বরে এই কথাগুলো যেন প্রবরের কানে গরম সীসে ঢেলে দিল। সে ঝটপট রিসিভার নামিয়ে রাখতেই তান জিজ্ঞাসা করল, 'কি হল ?'

'কিছু না।' প্রবর ঠোঁট কামড়াল।

এবার তান তার কনুই ধরল, 'অ্যাই বোকামি করো না। চেনো না, জানো না, দূর থেকে দেখে একটা মেয়ের প্রেমে কখনও পড়তে হয় ? আগে ভাল করে জানবে সে তোমাকে চাইছে কিনা তোমার নিজের কতখানি ভাল লাগছে তারপর ওইসব চিন্তা করবে। আর সত্যি যদি কেউ কাউকে ভালবাসে তাহলে শরীরের কোন খুঁত বাধা হয়ে দাঁড়ায় না।'

'সেজন্যে নয়।' প্রবরের গলা বুজে আসছিল, আমি নাকি ড্যাবড্যাবিয়ে অসভ্যের মত তাকিয়ে থাকি, এসব বলছিল। তাহলে হাসছ কেন ?' হঠাৎ খুব নিজেকে অপমানিত বলে মনে করল প্রবর। কান্না চেপে রাখা মুশকিল হচ্ছিল। তান তাকে আলতো জড়িয়ে ধরল, 'একদম ভুলে যাও। জীবন তো ছোট নয়, তোমাকে সত্যিকারের ভালবাসবে এমন মেয়ের দেখা ঠিক পেয়ে যাবে। তুমি তো আর সূর্যর মত হালকা নও।'

তানের এই শেষ বাক্যটিতে অদ্ভুত শক্তি পেল প্রবর। সে সহজ হবার চেষ্টা করল। তান বলল, 'গুড। আজ আমরা নিজেদের বাড়িতে চলে যাচ্ছি। দাঁড়াও।' পার্স থেকে আর একটা কাগজ বের করে ঝটপট ঠিকানা লিখে সে প্রবরের হাতে দিল, 'ঠিকানা আর টেলিফোন নম্বর রইল। যখনই ইচ্ছে হবে যোগাযোগ করতে পার। মা ধরলে কোন সঙ্কোচ করো না। মা আমাদের বন্ধুর মত। চল।'

ওরা আরও মিনিট পনের ছিল। তান শুধু বলেছিল প্রমিতার সঙ্গে কথা হয়েছে। প্রবর তার কথা নিজের কানে শুনেছে। প্রমিতার মনে প্রেমট্রেম নেই। অতএব ল্যাটা চুকে গেল। প্রবর চুপচাপ বসেছিল। গান তাকে দুবার বলেছে, 'কি, এখনও গম্ভীর হয়ে থাকবেন ?' অথবা, 'আপনি কিন্তু ভুলতে পারছেন না।' যাওয়ার সময় চোখের কোণায় তাকিয়ে হেসে বলেছিল,

'আসবেন।'

ওরা চলে যাওয়ার পর কান্নাটা এল। একা ঘরে কিছুক্ষণ শুয়ে রইল প্রবর। সে অসভ্য ? তাহলে কেন অত হাসি ? তরুণ বয়সের প্রথম বসন্তের হাওয়া পেয়ে পাতারা যখন দোল খেতে চায় তখনই ঝড় উঠল যেন। পাওয়ার লোভ দেখিয়েই কেড়ে নেওয়া কেন ? সে ঝটপট বিছানা থেকে উঠে জানলা খুলে দিল টানটান করে। আর কি বাতাস। সে নতুন বাড়িটার দিকে তাকাল। আলো জ্বলছে। জানলায় কেউ নেই। হঠাৎ তার মানে পড়ল যে চিরকুট দেখে তান ওবাড়িতে ফোন করেছিল সেটা রিসিভারের পাশেই পড়ে আছে। এক দৌড়ে সে মায়ের ঘরে গিয়ে কাগজটা তুলে কুটি কুটি করে ছিড়ে ফেলল।

অষ্টমী

'তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ তাহা কেহ জানে না, তুমি কোথায় যাইবে তাহাও জানা নাই। শুধু মধ্যবর্তী সময়টুকু তোমার খেলিবার কারণে নির্দিষ্ট। এই খেলিবার সময়টুকু কতখানি তাহাও ঘোষিত নয়। তোমার কাজ শুধু খেলিয়া যাওয়া। এই খেলা কি ? সুখ দুঃখ কান্না হাসি গ্রহণ বর্জন ইত্যাদি মানবজীবনের যাবতীয় কর্ম করিয়া যাওয়ার নামই খেলা। কোন কোন উচ্চমার্গের মানুষ এই খেলাকে পূজার পর্যায়ে লইয়া গিয়াছেন। বোধনে যার শুরু বিসর্জনে তার শেষ। বেশীরভাগ মানুষই জাগতিক সুখ দুঃখে কাতর হইয়া আমার আমার বলিতে বলিতে আবিষ্কার করে তাহার খেলা শেষ, তখন আফসোস করিবারও সময় থাকে না। বহু পুণ্যজীবনের সুকর্মফলে তুমি মানবজীবন প্রাপ্ত হইয়াছ। ইহাকে অবহেলায় নষ্ট করিও না।'

এখন সন্ধ্যেবেলা। গঙ্গার ওপর দিয়ে ফুরফুরে বাতাস বয়ে যাচ্ছে। রেলিং-এ ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে প্রবর ওই বাণী শুনছিল। একজন বয়স্ক মানুষ, কপালে চন্দন আঁকা, উপস্থিত শ্রোতাভক্তদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিচ্ছিলেন। গঙ্গার ধারে সান্ধ্য আসরগুলোতে যেসব ধর্মসভা বসে এটি তার একটি। প্রবরের শুনতে মজা লাগছিল। শ্রোতাদের সে ভাল করে খুঁটিয়ে দেখেছে। এঁদের অধিকাংশই সত্তর পেরিয়ে গেছেন। সংখ্যায় বৃদ্ধা এবং বিধবারাই বেশী। তার কেবলই মনে হচ্ছিল অধিকাংশই ওই বাণীর মর্ম বুঝছেন না অথচ মাথা নিচু করে ভক্তিভরে শুনে যাচ্ছেন। এদের আর খেলার সময় বেশী নেই। অতএব অবহেলায় নষ্ট করার সুযোগও নেই। তবু বক্তা এঁদের সেই উপদেশ দিচ্ছেন। যেন ভিখিরিকে কয়েকহাজার টাকা নিয়মিত রোজগারের পর কিভাবে খরচ করলে বেহিসাবী বলা হবে না সেই শিক্ষা দেওয়া।

তার মজা লাগছিল আর একটি কারণে। যার শুরু এবং শেষ জানা নেই কারো তাকে নিয়ে এত দুশ্চিন্তা কেন পণ্ডিতদের ? মহাত্মা গান্ধী এবং নাথুরাম গডসে এখন কোথায় কি করছেন তা কেউ বলতে পারবেন ? সেই ছেলেবেলায় যেসব পাঠ শিশুকে দেওয়া হয় তাই তো যথেষ্ট। ভাল ভাবে থাকবে, কারো সঙ্গে ঝগড়া করবে না, সবাইকে মিত্র ভাববে, কারো দুঃখের কারণ হবে না।

এই উপদেশ বাল্যকালে হলেও মানুষ বিশ্বযুদ্ধ থেকে শুরু করে প্রতিবেশীর সঙ্গে কাক-তাড়ানো চিৎকার ঝগড়া করতে দ্বিধা করে না। উপদেশে যখন সারা জীবন কাজ হয় না তখন জীবনের শেষে এসে ওই একই কথা অন্যভাবে শুনে কি উপকার হবে। কাজ করার দিন তো ফুরিয়ে গেছে। প্রবরের মনে হল এই লোকগুলো খুব ভয় পেয়েছে। এতদিন যে যার জীবনযাপন করে এসে মৃত্যুর ছায়া দেখে বা সমবয়সীদের মরে যেতে দেখে অসহায় বোধ করছে বলেই একটা ছাতার সন্ধান করছে। এই ছাতার নাম ঈশ্বর। এই সময় ঈশ্বরের নামগান করলে, পবিত্র বাণী শুনলেই যেন পরলোকের জিনিসপত্র কেনার জন্যে যে তহবিল ভারি হয়ে যাবে। অথচ পরলোক বলে কিছু আছে কিনা তাই কারো জানা নেই। কে যেন বলেছিল, জীবন হল পেঁয়াজের মত। দিন যাচ্ছে আর তুমি পেঁয়াজ ছাড়িয়ে যাচ্ছ। কর্মফলের পরিণতি শূন্য। প্রতিটি মানুষ শূন্যের জন্যে পরিশ্রম করে যায়। প্রবরের ইচ্ছে হচ্ছিল বক্তা এবং শ্রোতাদের এইসব কথা চিৎকার করে বলে। সে দেখল বক্তার একজন সহকারি ঘুরে ঘুরে দান গ্রহণ করছে। এই দানের ওপর বক্তার সংসার চলবে। ভবিষ্যতের ভয় দেখালে যদি বর্তমান সুস্থির হয় তবে ভদ্রলোক নিশ্চয়ই সেই ব্যবসা করতে পারেন। এইসময় গান বলল, 'চল, দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

প্রবর গানের দিকে তাকাল। পরমাসুন্দরী বলতে ঠিক কি বোঝায় তা প্রবর জানে না কিন্তু গানের দিকে তাকালেই মনে হয় মন ভরে গেল। এখনও গান পূর্ণ যুবতী নয়। তরুণ বয়সের চাঞ্চল্য এবং কিছুটা শীর্ণতা আছে। তা হোক। কিন্তু পথ চললেই সবার চোখ ওর দিকে ঘুরে আসে। প্রবর বলল, 'আর একটু থাকি না।'

'কেন ? এসব শুনতে ভাল লাগছে ?'

'মজা লাগছে। মানুষ সবসময় কিছু না কিছু দিয়ে নিজেকে ভুলিয়ে রাখতে ভালবাসে।'

'তুমি ওই শুনে নিজেকে ভোলাচ্ছ ?'

'আমি নই। ওঁরা।'

'অনেক হয়েছে। আমাকে এই বাগবাজার থেকে সাউথ এন্ড পার্কে যেতে হবে। কটা বাজল খেয়াল আছে। প্লিজ আর দেরি করো না।' গান প্রবরের হাত ধরে আলতো টানল।

প্রবর হাসল, 'আচ্ছা, ধরো, আমরা যদি ফিরে না যাই ?'

'মানে ?'

'ধরো, আমরা এখান থেকেই হারিয়ে গেলাম। কাগজে বের হল একজন হাউস সার্জেনের সঙ্গে এম এ পাঠরতা তরুণী উধাও। কদিন হৈচৈ হল, তারপর সবাই চুপচাপ হয়ে যাবে। কেমন হয় ?'

গান কোন কথা না বলে আচমকা হাঁটা শুরু করল। গঙ্গার ঘাটের মানুষজন এখন জায়গায় জায়গায় ধর্মালোচনা শুনছে। মাইকে ভক্তিগীতি হচ্ছে। অথচ একটা পচা গন্ধ ভেসে আসছে বাতাসে। গান নাকে রুমাল চেপে হনহনিয়ে হাঁটছিল। প্রবর একটু দৌড়েই তার পাশে পৌঁছে গেল, 'চল, চক্ররেলে যাই।'

'তুমি যাও। আউটরাম ঘাট থেকে এইসময় আমি বাস ধরব না।'

'আমি সঙ্গে থাকলেও না ?'

গান জবাব দিল না। ওরা ততক্ষণে ট্রেন লাইনের ওপর এসে দাঁড়িয়েছিল। গান বলল, 'আচ্ছা, এরকম জায়গায় কেউ বেড়াতে আসে ? তোমার মাথা ঠিক আছে তো ?'

'ক্ষমা চাইছি। বাগবাজারের গঙ্গার ধার, শীতল বাতাস ইত্যাদির গল্প এত শুনেছি যে মনে হয়েছিল বেশ রোম্যান্টিক ব্যাপার হবে।'

'অদ্ভুত !'

'মনে হচ্ছে একটা ট্রেন আসছে। এসো।' চটপট দুটো টিকিট কিনে নিয়ে এল প্রবর। প্ল্যাটফর্ম ফাঁকা। বিরাট লম্বা প্ল্যাটফর্মে শুনলে জনা দশেকের বেশী মানুষ হবে না। পাশাপাশি প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে প্রবর বলল, 'কলকাতার ভেতরে এমন একটা জায়গার নাম বলো যেখানে ভদ্রভাবে বেড়ানো যায় ? গড়ের মাঠ, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ? শুনলেই হাসি পায়। ভাবলাম এদিকের গঙ্গার ধার খারাপ লাগবে না।'

গান এতক্ষণ পরে হাসল, 'বেড়ানোর নিশ্চিত জায়গা নির্জনতায় নয়, জনতায়।'

'অর্থাৎ ?'

'ধরো, আমরা যদি কোন রাজনৈতিক দলের বিশাল মিটিং-এ বসে গল্প করি তাহলে কেউ বিরক্ত করবে না, ছুরি দেখিয়ে টাকা চাইবে না, এক পয়সা খরচও নেই।'

প্রবর হেসে ফেলল। কদিন আগেই এমন একটা ঘটনা ঘটেছে। আউটরাম ঘাট থেকে বাস ধরবে বলে ওরা হাঁটছিল ইডেনের পাশের রাস্তা দিয়ে। হঠাৎ দুটো ছেলে অন্ধকার থেকে ছিটকে এল সামনে, 'পকেটে যা আছে দিয়ে দিন নইলে ফাঁসিয়ে দেব।'

প্রবর বলেছিল, 'পকেটে থাকলেই দিতে হবে ?'

ছেলেটা অদ্ভুত গলায় বলেছিল, 'প্রেম করতে এসেছেন আর ট্যাক্স দেবেন না ? দিন।'

ঠিক সেইসময় একটা পুলিশের জিপ দুর্ঘটনাক্রমে ওই রাস্তায় এসে পড়ায় ছেলেদুটো যেভাবে এসেছিল সেইভাবেই হাওয়া হয়ে যায়। জিপটা পাশে এসে থামে এবং অফিসার জিজ্ঞাসা করেন, 'কি হয়েছে ?' গান পুলিশ দেখে ভরসা পেয়ে এগিয়ে গিয়ে ঘটনাটা বলে।

অফিসার জিজ্ঞাসা করেন, 'এতরাত্রে এখানে আপনারা কি করছিলেন ?'

প্রবর জবাব দিয়েছিল, 'রাত তো বেশী হয়নি। মাত্র সাড়ে সাতটা। আমরা এখানে বেড়াতে এসেছিলাম। বাস ধরব বলে যাচ্ছি।'

'এত জায়গা থাকতে এখানে বেড়াতে এসেছেন কেন ?'

'নিরিবিলি বলে।'

'নিরিবিলির ধান্ধা কেন ? কে হন আপনারা ?' অফিসারের গলা এখন অন্যরকম।

প্রবর জবাব দিয়েছিল, 'আমরা বন্ধু।'

'বন্ধু ? বাপ্‌স। থানায় চলুন, কি রকমের বন্ধুত্ব দেখব।' গলায় এবার

হুকুম।

গান প্রতিবাদ করেছিল, 'থানায় কেন যাব ? আমরা তো কোন অপরাধ করিনি। আপনি তো অদ্ভুত লোক ! যারা ছুরি দেখালো তাদের কিছু না বলে উল্টে আমাদের থানায় নিয়ে যেতে চাইছেন ? কি নাম আপনার ? কোন থানা ?'

'আসুন, থানায় গিয়ে সেসব জানতে পারবেন। এ্যাই তোল এদের।' অফিসার হুকুম করা মাত্র দুজন সেপাই জিপ থেকে নেমে এল। প্রবর বুঝতে পারছিল একটা বড় ঝামেলায় পড়তে যাচ্ছে। সে এগিয়ে গিয়ে অফিসারকে বলেছিল, 'আপনি কিন্তু একটা বড় বিপদে নিজেকে জড়িয়ে ফেলছেন। ও একজন ডি আই জি-র ভাইজি।'

'অ্যাঁ ! সেকি ! কথাটা আগে বলবেন তো ! অ্যাই, উঠ যাও গাড়িমে।' হুকুম শোনামাত্র সেপাই দুটো আবার উঠে পড়ল। জিপটা সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেল সামনে থেকে। বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত চুপচাপ হেঁটে এসেছিল গান। তারপর জিজ্ঞাসা করেছিল, 'তুমি লোকটাকে ঠিক কি বললে বল তো ? ওরকম বদলে গেল কেন ?'

প্রবর হেসে সত্যি কথা বলেছিল। সঙ্গে সঙ্গে রেগে গিয়েছিল গান, 'তুমি ওই মিথ্যেকথাটা বললে কেন ? ছিঃ। এমন অন্যায়ভাবে থানায় নিয়ে গিয়ে ও কি করত আমাদের ? দেশে কি ন্যায়বিচার বলে কিছু নেই ? ওকে বুঝিয়ে দিতে পারতাম যে ও অন্যায় করছে। বাড়িতে ফোন করতাম, কাগজের অফিসকে জানাতাম।'

'লোকটা যদি এসব কিছুই করার সুযোগ না দিয়ে সারারাত লক আপে রেখে দিত ?' গান থতমত হয়ে গেল। তারপর শান্ত গলায় বলেছিল, 'তাই থাকতাম। কিন্তু রাতটা তো একসময় সকাল হত। তাই না ?'

ভুতুড়ে ছবির মত একটা লম্বা ট্রেন প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়াল। দশজন যাত্রী উঠে গেল নিঃশব্দে। কেউ নামল না। বাগবাজার থেকে আউটরাম ঘাট। প্রবর আর গান তাদের সামনের কামরায় উঠে পড়ল।

উঠেই গান বলল, 'এ মা। একটাও লোক নেই।'

প্রবর বলল, 'কেন ? আমাকে কি লোক বলে মনে হচ্ছে না ?'

গান কাঁধ নাচালো, 'বাজে বকো না। এরকম ফাঁকা কামরায় যাওয়া যায় নাকি ?'

প্রবর হেসে বেঞ্চিতে বসল, 'মানুষ অদ্ভুত প্রাণী। কামরায় ভিড় দেখলে বিরক্ত হয় আবার ফাঁকা থাকলে অস্বস্তিতে পড়ে। কিন্তু ম্যাডাম, পুরো গাড়িটাই তো খালি।'

'ওই লোকগুলো যেখানে উঠল সেখানে চল।'

'কেন বলছ বলতো ?'

'আশ্চর্য ! কেউ যদি একটা ছুরি নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ায় তাহলে কি হবে বুঝতে পারছ ?'

'কি হবে ? আমার পকেটে ত্রিশ টাকা আছে আর এই ঘড়িটা। তোমার সম্পত্তি কত ?'

'বাজে বকো না। মেয়ে দেখলে অন্য কিছুও করতে পারে।'

অগত্যা প্রবর উঠল এবং তখনই ট্রেনটা ছেড়ে দিল। গান বলল, 'যাঃ।'

প্রবর এগিয়ে গিয়ে দুটো দরজাই ভেতর থেকে বন্ধ করে দিল। এখন খুলে না দিলে কেউ তাদের আক্রমণ করতে পারবে না। গান জানলার ধারে গিয়ে বসতেই সে পাশে এল, 'এখন মন ঠাণ্ডা হয়েছে তো?' সে বাইরে তাকাতেই চলমান ট্রেন থেকে গঙ্গা দেখতে পেল, 'ফ্যান্টাস্টিক। আঃ। এরকম দৃশ্য দেখতে পাব ভাবিনি।'

গানেরও এতক্ষণে ভাল লাগছিল। প্রবর তার কাঁধে হাত রেখে বলল, 'একটা গান শোনাও।'

'মানে? পাগল!'

'পাগল কেন হব? এরকম একটা রোম্যান্টিক পরিবেশ, ঠিক সিনেমার মত, এখানেই গান দারুণ জমবে। কলকাতার অন্য কোথাও, ঘরের বাইরে তুমি আমাকে গান শোনাবার চান্সই পাবে না। একটু আগে আফসোস করছিলাম, কিন্তু কলকাতার প্রেমিক প্রেমিকারা এই ট্রেনটির সন্ধান কেন পায়নি কে জানে।'

কথাগুলো বলে প্রবর একটু ঘনিষ্ট হল। গান বলল, 'সরে বসো।'

'কেন?'

'আমার অস্বস্তি হচ্ছে। বাইরেটা দেখতে দাও।'

প্রবর এবার গানকে জড়িয়ে ধরতেই সে বলে উঠল, 'আঃ কি করছ। জানলা খোলা মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি?'

'রানিং ট্রেনের ভিতরে কি হচ্ছে বাইরে থেকে ভাল করে বোঝা যায় নাকি?'

এই সময় ট্রেনের গতি শ্লথ হল। শোভাবাজার স্টেশনটি আসছে। গান উঠে দাঁড়াল,'চটপট চল। বেশীক্ষণ হয়তো ট্রেন দাঁড়াবে না এখানে।'

গানকে দরজা খুলে নামতে দেখে প্রবর অনুসরণ করল। দুটো কামরার পরেই জনা পাঁচেক মানুষ বসে। সেখানে উঠে গান বলল, 'বাঁচা গেল। বসো।'

প্রবর বলল, 'মেয়েদের দেখলে যারা অন্য কিছু করে তাদের দলে তুমি আমাকেও ফেললে?'

'মানে?' গান অবাক হয়ে তাকাল।

'দরজা বন্ধ করার পর আগের কামরায় বাইরে থেকে কোন বিপজ্জনক আশংকা ছিল না। তুমি নিশ্চয়ই আমাকে ভয় পেয়েছিলে তাই এখানে পালিয়ে এলে!' প্রবর অন্যদিকে মুখ ফেরাল।

'আমরা আগেই কামরা চেঞ্জ করতে চেয়েছিলাম। অত প্যাঁচালো বুদ্ধি আমার নয়।'

'তাহলে আমার বুদ্ধিই প্যাঁচালো।'

'তাই। কেন? এখানে বসে কথা বলতে তোমার অসুবিধে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ। হচ্ছে। ওই লোকগুলো সিনেমা দেখার মত এদিকে ড্যাবডেবিয়ে তাকিয়ে আছে। আসলে ওই নির্জন কামরায় তুমি আমাকেও ভয় পেয়েছিলে!'

'না। আমি অশোভন কিছু হোক চাইনি।'

'অশোভন ?' প্রবর রেগে গেল, 'আমরা মিশছি প্রায় পাঁচ ছয় বছর। দুজনে দুজনকে ভালবাসি। এই সম্পর্ক নিয়ে যদি তোমায় জড়িয়ে ধরে আদর করি তাহলে সেটা অশোভন ব্যাপার হবে ? পৃথিবীর সব মানুষ তাহলে অশোভন ব্যাপার করে ?'

'কারা কি করে আমি জানি না তবে সব কিছুর একটা পরিবেশ, জায়গা আছে। কসাই-এর দোকানে মাংস কিনতে গিয়ে তুমি নিশ্চয়ই একটা বাচ্চাকেও আদর করবে না।'

'তুমি যে এত রক্ষণশীল তা কে জানত।

রক্ষণশীল অনেক ভারি কথা। এটা রুচির প্রশ্ন।'

'বেশীমাত্রায় রুচি রুচি করা মানে মোমের পুতুল হয়ে থাকা। রক্তহীন।'

গান আর কথা বাড়ায়নি। একসময় ওরা ইডেনগার্ডেনের স্টেশনে পৌঁছে গেল। ট্রেন থেকে নেমে মনে হল একটা জমজমাট জায়গায় আসা গেল। প্রবর ট্যাক্সি ধরতে ছুটছিল কিন্তু গান তাকে বাধা দিল, আমি বাসে যাব। তোমাকে আর অতদূরে যেতে হবে না ?'

'বাসে অনেক সময় লাগবে।'

'রাত্রে বাস জোরে ছোটে।'

'তার মানে তুমি ট্যাক্সিতেও আমার পাশে একলা বসতে চাও না ?'

'তুমি কিন্তু নিজেই কথা তৈরি করছ।'

'তাছাড়া আর কি ? তোমার দেরি হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি বাড়িতে ফিরবে বলে খানিক আগে ছটফট করছিলে। ট্রেন থেকে নামামাত্র সেটা আর মাথায় নেই। আমাকে কি ভাবো ?'

'এত রাত্রে ঝগড়া করব না।'

'কিন্তু প্রশ্নটার জবাব তোমায় দিতেই হবে।'

'ওই বাসটায় উঠলে আমি বড় জোর ট্যাক্সির পাঁচ মিনিট পরে পৌঁছাবো। কিন্তু ট্যাক্সিতে গেলে কুড়িগুণ বেশী খরচ হবে। আমি একা এত রাত্রে ট্যাক্সিতে উঠব না। তাই তুমি উল্টো পথে সঙ্গে যাবে আবার ফিরে আসবে। এটা বাস্তব নয়।'

'আচ্ছা। অন্যদিন যখন ট্যাক্সিতে পৌঁছে দিয়ে আসি তখন এই চিন্তাটা কোথায় থাকে ? তখন বাস্তবের কথা বলো না তো ?'

'আজ মন ভাল নেই তাই বললাম।' প্রায় দৌড়েই চলন্ত বাসে উঠে পড়ল গান। হতাশা বিরক্তিতে অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল প্রবর। প্রতিদিনের মত মিলিয়ে যাওয়ার আগে গান হাত নাড়ল কিনা দেখল না।' অথচ এই মুহূর্তে ওইরকম করা নিয়মিত অভ্যেস ছিল। ভিড়ের জন্যে হাত নাড়তে পারেনি বলে একদিন গান বাস থেকে নেমে এসেছিল। আজ দুজনে সেরকম কিছুই করল না।

বাড়িতে ফেরার সময়টা আজকাল এক থাকে না। তবে কখনই এগারটার ওপারে ফেরে না প্রবর। পারমিতার শরীর ঠিকই আছে। পঞ্চাশের অনেক নিচে তার বয়স কিন্তু দেখলে চল্লিশ পেরিয়েছে কিনা সন্দেহ হয়। এখনও চুল

পাকেনি, দ্বিতীয় চিবুক দর্শন দেয়নি। তবে শরীরের কিছু অংশ ঈষৎ ভারি হয়েছে। তুলনায় প্রবালের যেন বয়স বেশী বেড়েছে। বেশ শ্লথ হয়ে পড়েছে সে। মধ্যদেশ এমন বিস্ফারিত যে বন্ধুরা উপদেশ দিচ্ছে ব্যাঙ্গালোরের হেল্‌থ ক্লিনিকে গিয়ে ওজন কমিয়ে আসতে। ভুঁড়ি বেড়ে যাওয়ায় উঠতে বসতে অসুবিধে হয়, হাঁটুতে ব্যথা জন্মেছে। পেটের গোলমালে ভুগছে সে। মাঝেমধ্যেই অসুখ হওয়ায় মেজাজ বেশ খিটখিটে হয়ে গেছে। মনোরমা এখনও জীবিত। কিন্তু তিনি বিছানা থেকে একা নামতে পারেন না। আগে ধরে ধরে তাঁকে বাথরুমে নিয়ে যাওয়া হত এখন সেটা বিছানাতেই করানো হয়। দিনরাতের আয়া রাখা হয়েছে তাঁর জন্যে। সুতরাং মনোরমার সেই সুস্বাস্থ্য আর নেই। শীর্ণা ওই বদ্ধির সঙ্গে দেওয়ালে টাঙানো মনোরমার ছবির কোন মিল নেই। কথাও বলেন চিঁচি করে। তাঁর নার্ভের কার্যক্ষমতা প্রায় নেই।

রাত দশটায় যখন প্রবর বাড়িতে ফিরল তখন দরজা খুলল পারমিতা, 'এত দেরি হল ? তোর তো আজ বিকেলে হসপিটাল ডিউটি ছিল না !'

'দেরি কোথায় ? মাত্র দশটা।'

'আশ্চর্য ! অন্যদিনের সঙ্গে আজকের তফাৎটা কোথায় সেটা জানিস না ?'

উত্তর না দিয়ে দরজা বন্ধ করল প্রবর। তার মনে পড়ল আজ কমলাদি চলে গিয়েছে। অনেক অনেক বছর চাকরি করার পর আজ থেকে দেশে গিয়ে স্থিতু হয়েছে। মা ওকে আটকাবার কম চেষ্টা করেনি। এর আগেও অনেকবার যাব যাব করেও যেতে পারেনি কমলাদি। এবার আর তাকে ঠেকানো যায়নি। কিন্তু যাওয়ার সময় একটি নতুন কাজের লোক দিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। সেই কাজের লোকের সন্ধান পাওয়া যায়নি। অতএব এতদিন বাদে মাকে সংসারের যাবতীয় কাজ নিজের হাতেই করতে হচ্ছে। মেজাজ ঠিক না থাকলে দোষ দেওয়া যাবে না।

প্রবর জিজ্ঞাসা করল, 'কাউকে পাওয়া গেল না ?'

'অত সোজা, না ? লোক তো প্রচুর আছে। পেটে কার কি মতলব জানব কি করে ? রাতদিনের লোক যদি কিছু করতে চায় স্বচ্ছন্দে করতে পারে।' পারমিতা বলল।

'তাহলে তো কাউকেই রাখা যায় না। কমলাদিকে রেখেছিলে কি করে ?'

'বাজে কথা বলিস না। ওকে তোর বড়মাসী পাঠিয়েছিল। ওর বোন বড়মাসীর বাড়িতে কাজ করত। একটা রেফারেন্স ছাড়া কাউকে রাখা যায় না। যা হাত মুখ ধুয়ে নে।'

খাওয়ার ইচ্ছে একদম হচ্ছিল না। কিন্তু খেতে হল। ওর কেবলই মনে হচ্ছিল বাড়িতে পৌঁছে গান নিশ্চয়ই একটা ফোন করার চেষ্টা করবে। করলে সে বাড়িতে ফেরার আগেই করেছে। কিন্তু মা যখন নিজে থেকে কিছু বলছে না তখন জিজ্ঞাসা করে কোন লাভ নেই। গান ফোন করলে মা বলতই। গানকে মা পছন্দ করে।

চেয়ারে বসে সিগারেট ধরাল প্রবর। আজকাল মাঝেমধ্যে সিগারেট খায় সে। একটা প্যাকেট কিনলে পাঁচ দিনেও অনেক সময় শেষ হয় না। ঘর

অন্ধকার। মনটা খুব খিঁচড়ে রয়েছে। সে জানলার বাইরে তাকাল। সে দেখল প্রমিতা জানলায় দাঁড়িয়ে আছে। চুপচাপ। মেয়েটা সম্পর্কে কোন খবর রাখে না সে। আর কোনদিন আগ্রহও হয়নি। এমন কি এক পাড়ায় থেকেও রাস্তায় দেখা হয়নি। খোনা মেয়েদের কি বিয়ে হয় ? নিশ্চয়ই হয়। হয়তো প্রমিতারও বিয়ে হয়ে যাবে।

কিন্তু গান আজ এটা কি করল। এতদিন ধরে মেশাটা কি অর্থহীন ? একটু বিশ্বাস করতে পারল না তাকে ? সে শুধু হাত রেখেছিল কাঁধে। চলন্ত ট্রেনের দরজা বন্ধ কামরায় তৃতীয় যাত্রীর অনুপস্থিতিতে একটু জড়িয়ে ধরেছিল। ব্যাস, তাতেই রুচির পুতুল গলে গেল ? অদ্ভুত ব্যাপার ! এর আগে রেস্টুরেন্টের কেবিনে, একদিন ওদের বাড়িতে ছাদে ওঠার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে সে গানের হাত ধরেছিল কিন্তু তখন এমন করতে দ্যাখেনি। কোন কোন মেয়ে দেহহীন প্রেমে বিশ্বাস করে। বেশ একটা প্লেটোনিক ব্যাপার হলে তারা তৃপ্তি পায়। কাঁঠালের আমসত্ত্ব। দেহ এবং প্রেম কখনও আলাদা হতে পারে ? প্রেমের স্মৃতি নিয়ে যে বেঁচে থাকে তারও একটা অবলম্বন দরকার। মমতাজ মারা যাওয়ার পরে শাজাহান তাজমহল তৈরি করেছিলেন যে কারণে। ঠিক আছে, গান যদি এরকমই চায় তাহলে সে দূরত্ব রাখবে। তাহলে প্রেম-প্রেম খেলাটা বন্ধ রাখা উচিত ওর। হঠাৎ মনে পড়ল সূর্যর কথা। অনেকদিন সূর্যর সঙ্গে দেখা হয়নি। ইতিমধ্যেই একটা মাঝারি চাকরিতে ঢুকে গেছে সে। ইতিমধ্যেই এক ডজন প্রেম করলেও কারও সঙ্গে সম্পর্ক স্টেডি হয়নি। সূর্য তাকে একসময় কিছু অশ্লীল বই পড়িয়েছিল। সেই বইগুলো পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই মন থেকে সরাতে পেরেছিল প্রবর। গানের সঙ্গে যোগাযোগ তৈরি হবার পর তার কখনই ওই বইগুলোর কথা মনে আসেনি। তবে কি সেগুলো মনের ভেতর ঘুমিয়ে ছিল ? শিউরে উঠল প্রবর। দূর ! তা কি কখনও হয় ? সে ট্রেনের বেঞ্চিতে বসে গানকে জড়িয়ে ধরতে চেয়েছিল, তার চেয়ে বেশি কিছু নয়। কিন্তু গান বলে গেল ওর রুচি আছে এবং তার নেই। প্রবরের চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করছিল পাথরবাটি পাথরেই তৈরি হয়, সোনায় নয়। দুটি ছেলেমেয়ে পরস্পরের প্রেমে পড়ে দুজনের দেখা হলেই। আর এই দেখার জন্যে শরীর দরকার।

শরীর ! প্রবর সিগারেট নিভিয়ে খাটে শুয়ে পড়ল। অদ্ভুত, এই শরীরটা তার নিজের, গানের শরীরটা ওর। হঠাৎ মনে পড়ল গঙ্গার ধারে শোনা কথাগুলো, তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ তাহা কেহ জানে না, কোথায় যাইবে তাহাও জানা নাই। শুধু মধ্যবর্তী সময়টুকু তোমার খেলিবার জন্য নির্দিষ্ট !' মনে পড়তেই কেমন একটা চিনচিনে অনুভূতি হল। কিছু একটা মনের গায়ে আঁচড় কাটছে অথচ সেটা সে ধরতে পারছে না। যেন কোন কাজ করার ছিল অথচ মনে আসছে না কি সেটা। মধ্যবর্তী সময়টুকু খেলার সময়। কি খেলা ? সেই খেলার মধ্যে নিশ্চয়ই প্রেম আছে ! তা হলে ? আর প্রেমেরও সময় নির্দিষ্ট। আচ্ছা, আজ যদি গান বলে পঞ্চাশ বছর পরে সে শারীরিক ভাবে মিলিত হবে তাহলে সেটা অসম্ভব ব্যাপার হয়ে যাবে না ? পঞ্চাশ বছর পরে বেঁচে থাকা যাবে কিনা তাই জানা নেই, থাকলেও সত্তর পেরিয়ে যাওয়া

শরীর ! আজ ঠাকুমার যে অবস্থা তাতে কোন প্রেম তার কাছে মূল্যবান বলে ভাবাই যায় না। তাই সময়ের জিনিস সময়েই করে যেতে হবে। যে খেলার যে সময়। চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকল সে। হঠাৎ সেই গঙ্গার ঘাটের বক্তার মুখ মনে পড়ল। এই শরীরটা একসময় ছোট ছিল। তার হামাগুড়ি দেওয়া ছবি মায়ের অ্যালবামে রয়েছে। আজকের এই শরীরটার সঙ্গেও কোন মিল নেই সেই ছবির শরীরের। কখন যে একটু একটু করে পাল্টে গেল। পাল্টে যেতে যেতে একসময় ওই মধ্যবর্তী সময়টুকু শেষ হয়ে যাবে। এই অবধি ভাবতেই কি একটা অনুভূতি শিরশির করে উঠল। প্রবর কিছুতেই তার অর্থ বুঝতে পারছিল না। কেমন একটা কষ্টবোধ সারা মনে ছড়িয়ে পড়ছিল। আর এই সময় গানের কথাও মনে আসছিল না।

প্রতিদিন বিদায়ের আগে ঠিক হয়ে থাকে পরের বার কোথায় কখন দেখা হবে, এবার হয়নি। বিকেলে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে সোজা সাউথ এন্ড পার্কে চলে এল প্রবর। দরজা খুলল তান। গত বছর বিয়ে হয়েছে তার। বিয়ের পরেই চেহারা বদলে গিয়েছে যেন। ভরভরন্ত ভারি। হাসিটি একই রকমের, 'আরে তুমি ? এসো এসো। একটু বাদে সূর্যও আসবে।'

'কবে এলে ?'

'আজই। এসেই গানকে জিজ্ঞাসা করেছি তোমার কথা। অঞ্জনও এল বলে। আজ জমবে।'

বাইরের ঘরে বসল প্রবর। গান কোথায় ? অঞ্জন তানের স্বামী। প্রেম করেই বিয়ে। বড় চাকরি করে অঞ্জন, একটু অহঙ্কারী। পাশে বসে তান বলল, 'বাড়িতে ফোন করে দাও।'

'কি কারণে ?'

'আজ তুমি আমাদের সঙ্গে খেয়ে যাবে।'

'আবার, কি কারণে ?'

'কোন কারণ নেই। অঞ্জন আমাদের বাইরে খাওয়াবে।'

'তোমার যদি আমার কথা মনে আসত তাহলে আগেই ফোনে খবর দিতে।'

'আঃ। সবসময় মনে থাকে নাকি ? অযথা জটিল করে নিচ্ছ কেন ?'

প্রবর হাসল, 'না ভাই, আজ বাড়িতে খেতে হবে। মায়ের নির্দেশ।'

'কেন ?'

'কাজের লোক দেশে গিয়েছে। মা নিজহস্তে রান্না করছেন, তাই।'

'মাসীমাকে আমি ফোন করছি।'

'উনি না বলবেন না তোমাকে কিন্তু কষ্ট পাবেন।' প্রবর মুখ তুলল, 'গান কোথায় ?'

তান বসে বসেই চিৎকার করে ডাকল, 'গান ! গান !'

সাদা শাড়ি আর সাদা ব্লাউজ পরে গান ঘরে এল, 'ও, কখন এলে ?'

'এইমাত্র।' প্রবর গম্ভীর গলায় জবাব দিল।

তান বলল, 'দ্যাখ না, ওকে আজ রাত্রে খেতে বলছি, রাজি হচ্ছে না।'

'অসুবিধে আছে নিশ্চয়ই।'

প্রবর আরও থিতিয়ে গেল। অনুরোধ করার বদলে গান তার উদাসীনতা দেখাল। এটা মোটেই ভাল লাগছিল না তার। এইসময় ওদের বাবা ঘরে এলেন, 'এই যে ডাক্তারবাবু এসে গেছেন!'

তান বলল, 'রোগের ফিরিস্তি দিতে আরম্ভ করো না বাবা!'

'না, না। তা কেন করব? আমার মাথায় কয়েকটা চিন্তা ক'দিন থেকে পাক খাচ্ছে। তার একটা হল, মানুষের শরীরের কোন কোন অসুখের ওষুধ আজ পর্যন্ত বিজ্ঞান আবিষ্কার করতে পারেনি?'

মনের এই অবস্থায় অন্য কথা বলার সুযোগ পেয়ে স্বস্তি হল প্রবরের, 'আপনার প্রশ্নটা বোধহয় এইরকম হলে ভাল হয়, কোন কোন রোগ একেবারে নির্মূল করার ওষুধ আবিষ্কৃত হয়নি, তাই না? কারণ কিছু রোগ সারানো যায় না কিন্তু দমিয়ে রাখা যায় কিছুদিন, কোন কোন রোগ শেষ পর্যন্ত থেকে গেলেও মাথা চাড়া দিতে পারে না। আবার কোনটাকে কিছুই করা যায় না।'

গানের বাবা খুশি হয়ে মাথা নাড়লেন, 'ঠিক বলেছ। চমৎকার।' তারপর উত্তর শোনার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন। প্রবর ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ধরুন সুগার। ঠিকঠাক ওষুধ খেলে নিয়মের মধ্যে থাকলে অনেককাল রোগটিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। একেবারে নির্মূল করার ওষুধ বিজ্ঞান এখনও আবিষ্কার করতে পারেনি। ব্লাডপ্রেশারও ঠিক তাই। রোজ ওষুধ খেয়ে গেলে কম থাকে, বন্ধ করলেই লাফিয়ে ওঠে। আবার ধরুন একজিমা। খুব পাজি রোগ। ওষুধে যদি সারে তাহলে কিছুদিন পরেই অন্য উপসর্গ নিয়ে দেখা দেয়। এরও কোন প্রতিবিধান বিজ্ঞান করতে পারেনি।'

তান বলল, 'আর ক্যানসার?'

'ক্যানসারের কথা আমরা সবাই জানি। যেটা জানি না সেটা হল এখন কিন্তু আমরা রোগটার বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে পারি। প্রাথমিক অবস্থায় পেলে সারানো না যাক বিস্তার বন্ধ করা যায়। মেয়েদের শরীরের কিছু অংশে ক্যানসার হলে আগে কিছুই করা যেত না, এখন যাচ্ছে। তাঁরা ভাল ভাবে বেঁচেও আছেন। তবে মাঝপর্বে লড়াই-এ নামলে কিছুই করা যায় না, এখন পর্যন্ত।' প্রবর বলল।

তানের বাবা বললেন, 'হুম্। আরও রোগ নিশ্চয়ই আছে। আমি একটা তালিকা করে তোমাকে দেব। আর হ্যাঁ, একটা কথা জিজ্ঞাসা করছিলাম, তোমরা বিয়ে করছ কবে? তোমরা হ্যাঁ না বললে তো আমি তোমার মা-বাবার সঙ্গে কথা বলতে যেতে পারছি না।'

প্রশ্নটি এভাবে আসবে আন্দাজও করতে পারেনি প্রবর। সে দেখল তান মৃদু হাসছে এবং গান ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। নিচুগলায় সে জানাল, 'আপনার মেয়েকে জিজ্ঞাসা করুন। সে যেরকমটি বলবে তাই হবে।'

'ও একা কি বলবে? তোমরা কথা বলে নাও। হ্যাঁরে তান?' বৃদ্ধ বড় মেয়েকে যেন দায়িত্ব দিয়ে চলে গেলেন, ভেতরে। প্রবর তানের দিকে তাকাল।

তান জিজ্ঞাসা করল, 'তোমাদের কিছু হয়েছে?'

'আমার হয়নি। হলে তোমার বোনের হতে পারে।'

'কি সেটা ?'

'আমি জানি না। ওকেই জিজ্ঞাসা কর।' প্রবর কথা শেষ করতেই গান আবার ঘরে ঢুকল, 'প্রবর। আমাকে কি জিজ্ঞাসা করতে বলছ ?'

'তোমার কিছু হয়েছে কিনা !'

'কিছুই হয়নি। তবে ঠিক এখনই বিয়ে করার বাসনা আমার নেই। পড়াশুনা শেষ করে চাকরি পাওয়ার পরে সেই চিন্তা করব। তা ছাড়া তুমিও তো এখনও রোজগারে নামোনি। এখন অন্যের ভরসায় বিয়ে করা ছাড়া কোন উপায় নেই। এককালে বাংলা সিনেমার নায়করা তাই করত অবশ্য।'

'আমি এখন বলতে এখনই বলছি না।' প্রবর প্রতিবাদ করল।

'যখন সময়টা আসবে তখনই কথাগুলো আলোচনা করা ভাল না ?'

'তোমার বাবাকে সেটাই বলে দিও। কথা আমি তুলিনি। উনিই আমাকে হঠাৎ প্রশ্নটা করলেন।' প্রবর উঠে দাঁড়াল, 'আজ চলি। একটু কাজ আছে।'

সে দরজার কাছে যেতেই গান বলল, 'একটু দাঁড়াও।'

প্রবর তাকাল। চট করে ভেতরে গিয়ে সামান্য তৈরি হয়ে এল গান।

বাইরে বেরিয়ে প্রবর জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার কোথাও যাওয়ার আছে ?'

'না। একটু কথা বলব বলে বের হলাম।' গান হাসবার চেষ্টা করল, 'দ্যাখো, আমরা খুব ভাল বন্ধু। এটা প্রমাণিত। কিন্তু বন্ধুত্ব এক জিনিস আর দাম্পত্যজীবন কিন্তু আর এক ধরনের। তোমার কি মনে হয় বিয়ের পরে আমরা ভাল থাকবো ?'

'সেটা না থাকলে বলব কি করে ?'

'অনুমান করা যায়, যায় না ?'

'তোমার কি মনে হচ্ছে ?'

'আমার ভয় করছে।'

'কারণ জানতে পারি ?' পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে ওরা কথা বলছিল।

'এখন নিজেদের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হলে চট করে যে যার বাড়িতে চলে যেতে পারি, তখন কিন্তু যাওয়ার জায়গা থাকবে না। সেই অবস্থায় একসঙ্গে থাকলে বিরোধ বাড়বেই। তুমি বুঝতে পারছ আমার কথা ?' গান মুখ তুলল।

'পৃথিবীর সব স্বামী-স্ত্রী যদি বিয়ের আগে এসব বোঝার চেষ্টা করত তাহলে কেউ বিয়েই করত না। প্লেনে উঠব না যদি ভেঙে পড়ে এইরকম ভাবনার মত।'

'কিন্তু তোমার কিছু ব্যবহার যে আমার পছন্দ হয় না।'

'সেইটে বল। আমাকে তোমার পছন্দ হয় না।'

'আশ্চর্য ! আমি সেই কথা বললাম। কিছু কিছু অপছন্দের।'

'আমাকে সেগুলো বললে ভেবে দেখব সংশোধন করা যায় কি না।'

'এগুলো বলা যায় না।'

'তাহলে তো অর্ডার দিয়ে প্রেমিক তৈরি করতে হয় যে ভবিষ্যতে স্বামী হবে ?'

'তুমি আমাকে ব্যঙ্গ করছ ?'

'সেই অধিকার আছে আমার !'

'শোন, তোমার ওই শারীরিক ব্যাপারটা আমি আদৌ পছন্দ করছি না। কিরকম পাশবিক মনে হয়। তুমি আমার যতই বন্ধু হও না কেন আমার শরীরের অধিকার আমারই। বিনা অনুমতিতে তুমি তার দখল নিতে পারো না। আমার মন মেজাজের সঙ্গে সেটা জড়িত। অথচ এই কথাটা পাঁচটা সাধারণ মানুষের মত তুমি মনে রাখো না।'

হঠাৎ একটা খারাপলাগাবোধে আক্রান্ত হল প্রবর। সে কি সত্যি পশুর মত আচরণ করেছিল। নাতো। কোন তৃতীয় ব্যক্তি নেই দেখে গানের কাঁধে হাত রেখেছিল। কথাগুলো সেই মুহূর্তে শুনলে বুঝিয়ে দিতে পারত সে। যে কোন রোমান্টিক দৃশ্যে নায়ক নায়িকাকে যতটুকু ঘনিষ্ঠ হতে দেখা যায় তার অনেক কম সে এগিয়েছিল।

প্রবর বলল, 'তুমি যে এত শুচিবায়ুগ্রস্ত তা আমি জানতাম না।'

'ও, তাই ? তাহলে একটি শরীরসর্বস্ব মেয়েকে খুঁজে নাও, আমাকে কেন ?'

রাগ হয়ে গেল প্রবরের। 'বেশ, তাই নেব।'

আচমকা দাঁড়িয়ে পড়ল গান, 'তোমার বাস স্ট্যান্ড এসে গেছে। আমি চললাম।'

কথা বলার সুযোগ না দিয়ে গান ফিরে যাচ্ছিল। প্রবর একবার তাকাল। খুব কষ্ট হচ্ছিল তার কিন্তু সেইসঙ্গে একধরনের অপমানবোধ সেই কষ্টটাকে অন্যরকম করে দিল। সে নড়ল না, একবার ফিরে আসার জন্যে ডাকল না। অসাড় হয়ে রইল।

রাত্রে ঘুম নেই, অস্বস্তি ছারপোকার মত কামড়ে যাচ্ছে। একবার মনে হল গানকে টেলিফোনে বলে উত্তেজনা কথাকে বিকৃত করেছে। কিন্তু ফোন তো বাবা-মায়ের শোওয়ার ঘরে। রাত বারোটায় ওই ঘরের দরজা খুলিয়ে টেলিফোনে এ সব বলা যাবে না। কিন্তু ঘুম এল একসময়। ভাঙল দেরিতে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল গানের কথা। তখনই দ্বিতীয় চিন্তা এল। ব্যাপারটা একতরফা হবে কেন ? গান নিজেও তো ফোন করতে পারে। কাল রাত্রে যদি সম্ভব না হয় আজ সকালে তো অসুবিধে নেই। যে নিজে ফিরে গিয়েছে তারই তো বেশি দায়িত্ব। অনেক চেষ্টায় নিজেকে সংবরণ করল প্রবর। ঠিক সময়ে হাসপাতালে গেল। কাজ করল। যাদের সঙ্গ সে এড়িয়ে চলত তাদের সঙ্গে যেচে কথা বলল। বিকেলে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আর সে পারল না। মনে হচ্ছিল ট্যাক্সি নিয়ে গানের বাড়িতে সে চলে গেলে ভাল লাগবে। কিন্তু—! সে ফোন করার সিদ্ধান্ত নিল। পাবলিক বুথ থেকে অনেক চেষ্টার পর যখন নাম্বার পেল তখন ওদের বাড়ির পরিচারিকা রিসিভার তুলে জানাল গানদিদি বাড়িতে নেই। কখন ফিরবে জানাও নেই। কে বলছেন জানতে চাইলে প্রবর নিজের নাম বলল না।

বিকেলবেলায় গান কোথায় যেতে পারে ? এই বিকেল এবং সন্ধ্যে গানের সঙ্গে কাটিয়ে একটা অভ্যেস তৈরি হয়ে গিয়েছে। খুব খারাপ লাগছিল প্রবরের। সে ঠিক করল সূর্যর সঙ্গে দেখা করবে। সূর্য চাকরি করছে।

সূর্যর বাড়িতে পৌঁছে জানতে পারল সাতটার আগে সে বাড়ি ফেরে না। সূর্যর মা ওকে চা খাওয়ালেন। দু-চারটে কথা বললেন। তার সবটাই সূর্যের

বিরুদ্ধে আক্ষেপ। নিয়মকানুন মানছে না। ওকে যেন প্রবর একটু বুঝিয়ে বলে।

সূর্য আজ এল একটু আগেই। বন্ধুকে অনেকদিন পরে দেখে খুশি হল। তার নাকি কোথায় একটা নেমন্তন্ন আছে, প্রবরকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইল। কিন্তু প্রবর আপত্তি জানাল। অজানা কারও বাড়িতে এভাবে যাওয়াটা শোভন নয়। সূর্য এসব যুক্তি উড়িয়ে দিল, 'দূর! সেরকম ব্যাপারই নয়। চল, গিয়ে দেখবি।'

বাড়িতে ফিরে এসেছিল সূর্য সাজগোজ করার জন্যে। একদম ইচ্ছে করছিল না প্রবরের। সে নিজের পোশাকের দোহাই দিল। কিন্তু সূর্য ঝড়ের মত সব আপত্তি উড়িয়ে দিল। বাইরে বেরিয়ে ট্যাক্সি নিল সূর্য। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'গানের সঙ্গে তোর কেমন চলছে?'

এই প্রসঙ্গেই আসতে চাইছিল প্রবর। সুযোগ পেয়ে সে সংঘাতের কথা বন্ধুকে জানাল। হঠাৎ সূর্য হো হো করে হেসে উঠল, 'ওটা চিরকালই ওই রকম। রবীন্দ্রনাথ পড়ে পড়ে হয়েছে। তান হলে এমনটা করত না। শী ইজ ডিফারেন্ট। এতদিন তোরা তাহলে শুধুই পুজো করে গেছিস? পারিস বটে। তা এখন কি করবি?'

'বুঝতে পারছি না।'

'ধাক্কা খেয়েছিস কিন্তু আরও বড় আঘাতের দিকে পা বাড়াস না।'

'মানে?'

'তুই গানকে ভালবাসিস, গান তোকে। ঠিক আছে বাবা, এই ভালবাসা মাথায় থাক। গানের ভালবাসা ঠাকুরঘরের বিগ্রহের মত, রাস্তায় নামানো দূরে থাক, বাথরুমেও নিয়ে যাবে না। বই-এ পড়ে মনে মনে বাহবা জানানো যায়, জীবনে অ্যাকসেপ্ট করা যায় না। ওদের জন্যে অন্য ছেলে আছে, মেয়ে মেয়ে ছেলে, স্বামী হিসেবে ভাল। তোর আমার কম্ম নয়। গানকে বিয়ে করিস না প্রবর। এটা বন্ধুর উপদেশ।' সূর্য হাসল।

'নিজের বোন সম্পর্কে এ সব বলছিস?'

'আশ্চর্য! আমার বোন যদি ট্যারা হয় তাহলে সেটা বলতে পারব না? দ্যাখ বাবা, আমরা লাল গামছা পরা ছেলে। প্লেটোনিক ব্যাপার আমাদের চলবে না। আসলে ভুলটা তুই করেছিস। গড়ে পিঠে নিসনি।'

'মানে?'

'গানের সঙ্গে তোর যখন প্রথম জমেছিল তখন ও ছিল কাদার তাল। তখন নিজের মত গড়ে নিতে পারতিস। তুই যা বলতিস তাই শুনতো তখন ও। ফলে মনের মত পেয়ে যেতিস। এখন সেটা অসম্ভব।'

'তাহলে তোকে এতগুলো প্রেম করতে হল কেন?'

সূর্য প্রশ্নটা শুনে হাসল, 'প্রতিটি প্রেমের আয়ু বেশিদিন ছিল না তাই। সিম্পল অ্যানসার। হয় আমার পার্টনার কিংবা আমি বুঝেছি ক্লিক করছে না, সরে এসেছি। কোন যুদ্ধ হয়নি। তবে নিজে এগিয়ে এসেও কেউ কেউ যাওয়ার সময় বলে গেছে, আপনি লম্পট, আমার ভালবাসা নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছেন, আমার চূড়ান্ত সর্বনাশ করেছেন। কিন্তু তারাই ক'মাস পরে বিয়ে থা

করে চমৎকার আছে। যার সর্বনাশ হয়ে যায় সে কি করে চমৎকার থাকে ?'

'তুই নিজের পক্ষে যুক্তি খুঁজছিস। প্রেম বার বার করা যায় না ?'

'ইডিয়ট। এটা গান তোকে বুঝিয়েছে নিশ্চয়ই। একটা মেয়ের সঙ্গে আলাপ হল, ভাল লাগল, ভাল বাসলি। সেও ভালবাসল। তারপর যদি দেখা যায় দুজনের মধ্যে হাজার বিষয়ে অমিল, সংঘাত হচ্ছে তবু তাকে আঁকড়ে থাকতে হবে প্রেম করেছিলি বলে ? যে প্রেম আর অবশিষ্ট নেই, কিন্তু পাবলিক জানে আছে, তাই ? তারপর ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলে দ্বিতীয় কোন মেয়ের দিকে তাকাতে পারবি না প্রথম প্রেমকে অসম্মান করা হবে বলে ? তোর মন যদি আর একটি মেয়ের মধ্যে আনন্দ খুঁজে পায় তাহলে তার মুখ চাপা দিবি ? হতভাগা।'

প্রবর জবাব দিল না। সূর্য যেভাবে কথা বলে তা সে বলতে পারে না। সূর্যর কথায় যে যুক্তি তা জীবনের একটা দিক। কিন্তু সবটা নয়। তাহলে শরৎচন্দ্র দেবদাস লিখতেন না। লোকটা আরও প্রেম করতে পারত অনায়াসে।

একটা পাঁচতলা বাড়ির সামনে ট্যাক্সি ছাড়ল সূর্য। প্রবর শেষবার চেষ্টা করল, 'না গেলে নয় ?'

'তোর যা ইচ্ছে।' গম্ভীর গলায় বলল সূর্য।

বলার মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল যে সটান ফিরে যেতে পারল না প্রবর। সূর্যর সঙ্গে লিফটে উঠল সে। তিনতলায় পৌঁছে সূর্য বাঁ দিকের ফ্ল্যাটের দরজার পাশের বোতাম টিপল। বাড়িটায় অনেকগুলো ফ্ল্যাট।

দরজা খুলল। একটি বছর আটেকের ছেলে দাঁড়িয়ে বলল, 'হাই আঙ্কল !'

'হাই গবু। কেমন আছ ?' ভেতরে ঢুকল সূর্য। ফ্ল্যাটটা মাঝারি কিন্তু নেমন্তন্ন বাড়ির আয়োজন কোথাও নেই। সূর্য তাকে সোফায় বসতে বলতেই এক ভদ্রমহিলা বেরিয়ে এলেন ভেতর থেকে। মহিলা সুন্দরী, সুদেহী, বছর পঁচিশেক বয়স। সূর্য তাকে বলল, 'আমার ছেলেবেলার বন্ধু, প্রবর। আর এ হল নীলিমা। আমার বন্ধু।' নীলিমা দু'হাত বুকের ওপর এনে নমস্কার করল। সূর্য বলল, 'ও ডাক্তার। এখন অবশ্য হাউস সার্জেন।'

'বাঃ। খুব ভাল লাগছে আপনাকে পেয়ে।' নীলিমা সামনে এসে সূর্যর পাশে বসলেন। প্রবর দেখল ওদের ব্যবধান খুব কম। নীলিমা বসেই একটু ধমকের গলায় বললেন, 'গবু, তোমাকে কিন্তু লেসনটা শেষ করতে হবে আজ।'

গবু বেঁকেচুরে দাঁড়াল, 'না। আঙ্কল এসেছে।'

'আঙ্কল এসেছে তো কি হয়েছে ? আঙ্কল তোমার হয়ে পরীক্ষা দেবেন ?'

সূর্য উঠে দাঁড়াল, 'দাঁড়াও। আমি ওর সঙ্গে গল্প করে আসি। এসো গবুবাবু। আমরা তোমার ঘরে যাই।' গবুর হাত ধরে সূর্য ভেতরে চলে গেল। ওর যাওয়ার ধরন দেখে প্রবর বুঝতে পারল এ বাড়িতে সূর্য অভ্যস্ত। সে জিজ্ঞাসা করল, 'ও কোন ক্লাসে পড়ে ?' নীলিমা হাসলেন, 'থ্রি। বড্ড দুষ্টু। সূর্যর কথা খুব শোনে। যাক, এই প্রথম সূর্যর কোন বন্ধুকে দেখলাম। কি খাবেন বলুন ?'

'এক কাপ চা হতে পারে।' প্রবর হাসল।

'সূর্য এই সময় আপনাকে চা খেতে অ্যালাউ করবে?' চোখের কোণে হাসলেন নীলিমা।

প্রবর অবাক হল, 'সূর্য বুঝি এই সময় এখানে চা খায় না?'

মাথা নেড়ে হাসলেন নীলিমা, 'আমরা কেউই খাই না। সপ্তাহে এই একটি দিন আমরা আড্ডায় বসি। আমি আর সূর্য। মাঝে মাঝে মিসেস দত্ত আসেন।'

'মিসেস দত্ত কে?'

'আমার প্রতিবেশী। বড় ব্যবসায়ীর স্ত্রী। তবে অনেক মহিলা সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। আজ আপনি এসেছেন, মিসেস দত্তকে অনুরোধ করব?' নীলিমা জানতে চাইলেন।

'আমি তো ভদ্রমহিলাকে দেখিইনি।'

'তা ঠিক। দেখার পর অন্য অভিজ্ঞতা হবে।' নীলিমা কথা শেষ করতেই সূর্য ফিরে এল, 'তোমার ছেলেকে টেবিলে বসিয়ে এসেছি।'

'কি করে তুমি ওকে বশ করেছ কি জানি!'

'প্রেমে।' সূর্য হাসল, 'প্রবর, নীলিমাকে কেমন দেখছিস?'

'ভাল।'

'শুধু ভাল? ওর মত মহিলার পক্ষে শুধু ভাল মানায় না। শী ইজ—।'

'ঠিক আছে, থাক।' নীলিমা বাধা দিলেন, 'এই, মিসেস দত্তকে ফোন করছি!'

'মিসেস দত্ত! করো। প্রবরের একটা এক্সপেরিয়েন্স হবে।' সূর্য হাসল।

নীলিমা উঠে টেলিফোনের কাছে গিয়ে ডায়াল করল। কয়েক সেকেন্ড বাদে তাঁর গলা শোনা গেল, 'মিসেস দত্ত আছেন? নীলিমা বলছি।' কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ। প্রবর দেখল নীলিমা সত্যি সুন্দরী। সামনাসামনি যতটা নয় পাশ থেকে তার চেয় বেশি। 'নীলিমা। কি করছ? হ্যাঁ। বোর হচ্ছ তো চলে এসো।' হেসে উঠলেন নীলিমা, 'না, না! আমরা দুজন নই, ওর এক বন্ধু এসেছে! স্মার্ট? হ্যাঁ, তা বলতে পার। আসছ তো? গুড।' রিসিভার রেখে ফিরে এলেন নীলিমা, 'আসছেন?'

হঠাৎ সূর্য উঠল, 'বলল, আমি নীলিমাকে বিয়ে করব।'

প্রবর চমকে উঠল। সে নীলিমার দিকে তাকাল। নীলিমা যেন একটু লজ্জিত। প্রবর বলল, 'এতো ভাল কথা। অভিনন্দন রইল।'

সূর্য মাথা নাড়ল, 'আমি চাইছি, কিন্তু নীলিমা এখনও হ্যাঁ বলছে না।'

নীলিমা বললেন, 'আমি আপনার বন্ধুকে ভাল করে ভেবে দেখতে বলছি।'

'অনেক ভেবেছি। ভাল করে আর কিভাবে ভাবা যায় তাই বুঝছি না।' সূর্য বলল।

নীলিমা সামনে এসে বসল, 'দেখুন, আমি জীবনে একবার ভুল করেছি। যার জন্যে ডিভোর্সের ঝামেলাও পোয়াতে হয়েছে। টোবাকো কোম্পানির চাকরিটা না থাকলে কোথায় ভেসে যেতাম। ভাইদের গলগ্রহ হতে কোন মেয়ে চায় না। আমাকে বিয়ে করে আপনার বন্ধু যদি পরে আফসোস করে

সেটা কি ঠিক ? আমি দ্বিতীয়বার ডিভোর্স চাই না। সেই কারণেই তোমায় ভাবতে বলছি স্যার।'

ওদের আলোচনা চলল অনেকক্ষণ। প্রবরকে সাক্ষী রেখে। সন্তানসহ নীলিমাকে বিয়ে করবে বলে সূর্যর কোন অস্বস্তি নেই এটাই শেষ পর্যন্ত স্থির হল। এর মধ্যে নীলিমা এবং সূর্য প্রায়ই উঠে গেছে গবুর তদারকিতে। তাকে রাত্রের খাওয়া খাইয়ে নিজের ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে নীলিমা বলল, 'আর দেরি করো না। তোমরা ঘরে গিয়ে বসো।'

ওরা যখন উঠছে তখনই বেল বাজল। নীলিমা এগিয়ে গেল দরজা খুলতে। প্রবর ভদ্রমহিলাকে দেখল। দুপুরবেলায় পার্ক স্ট্রীটের কোয়ালিটি রেস্টুরেন্টে কিছু সুখে লালিতা মহিলা আড্ডা জমাতে যান। তাঁদের শরীরে হালকা চর্বির ওপর হলুদ চামড়া অদ্ভুত বাতাবরণ তৈরি করে। মহিলা লম্বা এবং সেই শ্রেণীর। একদা সুন্দরী ছিলেন এখন চল্লিশের কাছাকাছি। নীলিমাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলেন তিনি। নীলিমা তাকে নিয়ে এল কাছে। সূর্য জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন আছেন ?'

'চলতা হ্যায় ?' ভদ্রমহিলা হাসলেন। হাসিটি এখনও বেঁচে আছে। পরনে আকাশ লাল সিল্ক, নীল জামা তৈরিতে কাপড়ের কার্পণ্য চোখে পড়ার মত। কোমরে ঈষৎ চর্বি এলেও অনেকটা মুক্তি পেয়ে মুখ এবং হাতের সঙ্গে ব্যালেন্স রেখেছে। নীলিমা পরিচয় করিয়ে দিল, 'সূর্যর বন্ধু প্রবর।'

হাত বাড়ালেন মিসেস দত্ত। বাধ্য হয়েই যেন হাত মেলাতে হল প্রবরকে। মিসেস দত্ত মাথা নাড়লেন, 'স্পর্শ ছাড়া দুটো মানুষের চেনাজানা হয় না। কিন্তু আপনার হাত এত নির্বাক কেন ? মেয়েদের পছন্দ করেন না ?'

প্রবর জবাব দেবার আগেই সূর্য বলল, 'করত। গতকালই জীবনের দ্বিতীয় ধাক্কাটা খেয়ে একটু অসাড় হয়ে গেছে।'

'দ্বিতীয় ধাক্কা মানে ?' নীলিমা প্রশ্ন করলেন।

'প্রথমটি একেবারে কিশোর বয়সে। দূরের জানলায় এক সুন্দরীকে দেখে হৃদয় কেঁপেছিল। পরে জানা গেল সে বেচারি ভাল করে কথা বলতে পারে না। দ্বিতীয়টি বোধহয় সেদিনই অঙ্কুরিত হয়। সম্পর্কে আমার বোন। এত বছর পরে সেই প্রেমের পতন।'

মিসেস দত্ত চোখ বড় করলেন, 'আপনার বোনের সঙ্গে ? পতন কেন ?'

'বেচারা এত দিন বাদে নির্জনে পেয়ে কাঁধে হাত দিতে গিয়েছিল কিন্তু আমার বোন সেটাকে অসভ্যতা মনে করেছে। সে দেহহীন প্রেমে বিশ্বাস করে বোধহয়।'

মিসেস দত্ত সূর্যর কথা শুনে হেসে উঠলেন শব্দ করে। নীলিমা বললেন, 'সেকি ? এতদিন মিশেও ভদ্রমহিলার মনের গঠন বুঝতে পারেননি প্রবরবাবু ?'

প্রবরের এসব ভাল লাগছিল না। সে বলল, 'পারিনি আমার অক্ষমতা। আর এ বিষয়ে আমি আলোচনাও করতে চাই না।'

মিসেস দত্ত বললেন, 'আই অ্যাপ্রিসিয়েট।' তিনি এগিয়ে এসে প্রবরের হাত ধরলেন, 'কিন্তু নীলিমা, সবার হাত খালি কেন ?'

নীলিমা বললেন, 'আসুন। সব তৈরি।'

ওরা পাশের দরজা দিয়ে ঢুকতেই সূর্য বলল, 'তোমরা আরম্ভ কর, আমি গবুবাবুকে লাস্টমিনিট টাস্ক দিয়ে আসি।' সূর্য উল্টোদিকে চলে গেল।

দরজাটা আপসেই বন্ধ হয়ে যায় ছেড়ে দিলে। ঘরে নীল আলো জ্বলছে। কোন ফার্নিচার নেই। পুরু কার্পেট এ দেওয়াল থেকে ও দেওয়ালে। একপাশের দেওয়ালবাক্সে মদের বোতল রাখা। তার পাশে ফ্রিজ। নীলিমা এগিয়ে গেল সেদিকে। ঘরের এককোণে স্টিরিও চালাবার ব্যবস্থা। মিসেস দত্ত সেটাকে সক্রিয় করতে গেলেন। ঘরটি বেশ বড়। বাজনা বেজে উঠল। খুব মৃদু এবং ধীর লয়ে বিদেশি বাজনা। নীলিমা ডাকলেন, 'প্রবরবাবু, আপনি জল না বরফ?'

প্রবর চুপচাপ এগিয়ে গেল ওঁর কাছে। নিচুগলায় বলল, 'আমি কিন্তু অভ্যস্ত নই।'

'সত্যি?' নীলিমাকে বিস্মিত দেখাল।

'হ্যাঁ।' মাথা নাড়ল প্রবর।

'ঠিক আছে, আপনি এটা হোল্ড করুন। আমি আপনাকে লক্ষ রাখব। নিন।' নীলিমা অনেকটা জল মেশানো হুইস্কি প্রবরের হাতে দিয়ে বললেন, 'এক ঘণ্টার আগে শেষ করবেন না।' ততক্ষণে মিসেস দত্ত এগিয়ে এসেছেন, 'কি কথা হচ্ছে?'

নীলিমা হাসলেন, 'প্রবর বরফে বিশ্বাস করে না।'

'তাই? জলজ প্রাণী? আমি ভাই বরফ হয়ে আছি। একমাত্র অ্যালকোহল ছাড়া কেউ সেই বরফ গলাতে পারে না।'

হঠাৎ প্রবরের ঠাট্টা করতে ইচ্ছে হল, 'মিস্টার দত্তও নয়?'

'দত্ত? গুলমার্গ গিয়েছেন? রাস্তার ধারে দেখবেন বরফের চাঁই-এর গায়ে ধুলো জমে জমে পাথরের চেহারা নিয়ে নিয়েছে। উনি তাই। যার নিজেরই কোনদিন গলার চান্স নেই তিনি আর অন্যকে কিভাবে গলাবেন?' হাসলেন মিসেস দত্ত, 'দাও। গলা শুকিয়ে গিয়েছে।'

প্রবর দেখল ভদ্রমহিলা গ্লাস হাতে নিয়ে হুইস্কির ওপর আধডোবা হয়ে থাকা বরফের টুকরোগুলোকে ঝাঁকিয়ে শব্দ তুললেন। তৃতীয়বারে ঈষৎ গুলতেই সেটা উপুড় করে দিলেন গলায়। বরফের বাকি টুকরোগুলো গ্লাসেই রয়ে গেল। নীলিমা বললেন, 'প্রথম ড্রিঙ্কটা এভাবে না খেলে ওঁর বেস হয় না।' তিনি গ্লাসটা ফেরত নিতেই মিসেস দত্ত বললেন, 'লেটস ড্যান্স।'

নাচ? জীবনে কখনও নাচেনি প্রবর। সে গুটিয়ে গেল। হাতের গ্লাস দেখিয়ে বলল, 'একটু বাদে হলে চলবে না?'

'হাতে গ্লাস নিয়েও নাচা যায়। আসুন দেখিয়ে দিচ্ছি।' নিজের গ্লাস নীলিমার কাছ থেকে নিয়ে তিনি ডান হাত বাড়ালেন। প্রবর দেখল নীলিমা তাকে ইশারা করছে এগিয়ে যেতে। হিন্দি সিনেমায় সে এই ধরনের পরিবেশের নাচ দেখেছে। মিসেস দত্ত তাকে শেখালেন কিভাবে গ্লাসের মদ গ্লাসে রেখে পা ফেলতে হয়। প্রবরের পা জড়িয়ে যাচ্ছিল। মিসেস দত্ত তাকে বললেন, 'ডোন্ট গেট নার্ভাস। কি করা হয়?'

'ডাক্তারি।'

'মাই গড। তাহলে তো প্রচুর মহিলাদের শরীর দেখা আছে।'

'সেসবে প্রাণ থাকে না।'

'ভাল উত্তর। চেষ্টা করে গেলে শেষ পর্যন্ত উতরে যাবে। আমার ছোঁয়াচে রোগ নেই।'

'মানে?'

'একটু ভাল করে ধরুন। গুড।'

পাঁচ মিনিটে প্রায় হাপিয়ে উঠেছিল প্রবর। হাততালি শুনে থেমে গেল। সূর্য এবার নীলিমার পাশে দাঁড়িয়ে হাততালি দিচ্ছে। ওরা দাঁড়াতেই সূর্য বলল, 'ধন্যবাদ মিসেস দত্ত, আমার বন্ধুটিকে আপনি সবল করছেন।'

'অনেক বাকি আছে।' দ্বিতীয় গ্লাসটি শেষ করলেন মিসেস দত্ত।

এবার সূর্য এগিয়ে এল ওর সঙ্গে নাচবে বলে। নীলিমা প্রবরকে ডাকল, 'আপনি এখানে এসে বসুন।' নীলিমা গ্লাস নিয়ে বসে পড়েছেন এক কোণে।

পাশে বসে নীলিমাকে জিজ্ঞাসা করল প্রবর, 'আপনি নাচবেন না?'

'নিশ্চয়ই। আগে মিসেস দত্ত টায়ার্ড হয়ে যান, তারপর।'

'কেন?'

'আফটার অল উনি গেস্ট।'

'ভদ্রমহিলা ভাল নাচেন।' প্রবর বলল।

'এবং তার চেয়ে ভাল নাচান।'

'তাই নাকি?'

'হুঁ। কিন্তু কখনই কোন অবস্থায় স্বামীকে ছেড়ে দেবেন না।' বলতে বলতে নীলিমা মুখ ফেরাল, 'এইসব দৃশ্য দেখলেই আমার রাগ হয়ে যায়।'

প্রবর তাকাল। সূর্যকে প্রায় শরীরের সঙ্গে মিশিয়ে নাচছেন মিসেস দত্ত। নীলিমার রাগ হওয়া স্বাভাবিক। সে হঠাৎ হাততালি দিয়ে উঠল। ওরা থেমে এদিকে তাকাতেই প্রবর বলল, 'এবার নীলিমা নাচবেন।'

সূর্য এগিয়ে এল, 'ওয়েলকাম।'

মিসেস দত্ত পাশে এসে বসলেন, 'অন্য মিউজিক নেই?'

'কেন?'

'একটু রিদম বাড়ালে ভাল লাগবে। আমার ড্রিঙ্ক!'

সূর্য ভদ্রমহিলাকে এগিয়ে দিল নতুন গ্লাস। মাঝেমাঝেই নাচ হচ্ছে। সেই সঙ্গে পান। সূর্যর অনুরোধে গ্লাস একটু একটু করে খালি হয়ে গেল প্রবরের। রাত দশটা নাগাদ ঘরের পরিবেশ পাল্টে গেল। মিসেস দত্ত এখন পুরো মাতাল হয়ে গেছেন। তাঁর নিজের শরীর সম্পর্কে কোন খেয়াল নেই। সূর্যর নেশা হলেও সে স্থির আছে। প্রবরের মনে হল নীলিমা একটুও বেটাল হননি।

এইরকম একটা নেমন্তন্ন খেতে সূর্য আসবে তা ভাবতে পারেনি প্রবর। নিজে দুটো গ্লাস শেষ করার পর আর কোনরকম অস্বস্তি হচ্ছে না। মাঝখানে নীলিমা তাকে নিচু গলায় নিষেধ করেছেন আর পান না করতে। মিসেস দত্ত প্রায় হামাগুড়ি দেবার ভঙ্গিতে এগিয়ে এলেন তার কাছে, 'প্রবর? দারুণ নাম। হ্যাঁ, কি বলছিলাম যেন?'

প্রবর হাসল, 'আপনি এখনও কিছু বলেননি।'

'না। বলেছি। মনে মনে বলেছি। হ্যাঁ, প্রেমিকার গায়ে হাত দিয়েছেন বলে সে চটে চলে গিয়েছে? প্রেম করবে অথচ শরীর ছুঁতে দেবে না? এ কি রকম প্রেম?'

'ঠিক আছে! আমরা অন্য কথা বলি।'

'বুঝেছি! আমার নেশা হয়ে গেছে মনে হচ্ছে, না?'

'না না। আমি কিছুই বলিনি।'

'বলেছেন।' টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালেন মিসেস দত্ত, 'আমি এখন যা নাচতে পারব আপনি তা পারবেন না? চ্যালেঞ্জ?'

'আমি হার মেনে নিচ্ছি।'

'দূর! যে পুরুষ মানুষ সহজেই হার মানে তাকে আমি অপছন্দ করি।'

মিসেস দত্ত এগিয়ে এলেন আর এক গ্লাস নিতে। প্রবরের মনে হল ভদ্রমহিলার আর খাওয়া উচিত নয়। এর পরে উনি আর হাঁটতে পারবেন না। সে সূর্যর দিকে তাকাল। মৃদু বাজনার তালে নীলিমাকে জড়িয়ে ধরে সূর্য দুলছে। ঠিক নাচ বলা যায় না ওটাকে। সে এগিয়ে গেল, 'আপনার আর খাওয়া উচিত নয়।'

'তাই?' ঘুরে দাঁড়ালেন মিসেস দত্ত, 'কি করব? আমি বোর হচ্ছি, ভীষণ!'

'আই অ্যাম সরি, কিন্তু—।'

'আপনি আমার সঙ্গে নাচছেন না, গল্প করছেন না। নীলিমা সূর্যকে নিয়ে বেশ আছে। আমি একদম একলা।' ভদ্রমহিলার গলার স্বর জড়ানো।

'ঠিক আছে, আসুন, নাচছি।'

'দ্যাটস লাইক এ গুড বয়।' মিসেস দত্ত দু'হাত বাড়ালেন।

এখন এটাকে আর নাচ বলা যায় না। দুটো পা দোলাবার সামান্য চেষ্টা করেছিলেন প্রথমে, পরে সেটিও ত্যাগ করে প্রবরের শরীরে নিজের শরীর ছেড়ে দিয়ে যেন ঘুমাতে লাগলেন। অনেক চেষ্টা করে সূর্যর দৃষ্টি আকর্ষণ করল প্রবর। সূর্য চেঁচালো, 'গুড। ইউ আর লাকি।'

প্রবর ইশারায় জিজ্ঞাসা করল, 'এখন কি হবে?'

'গো এহেড।' চিৎকার করল সূর্য।

ঠিক তখনই বেল বাজল। নীলিমা সোজা হলেন। সূর্যকে সরিয়ে দিয়ে তিনি চলে গেলেন বাইরের ঘরে। ফিরে এলেন প্রায় তখনই। মিসেস দত্তের কাছে এসে নিচুগলায় বললেন, 'মিস্টার দত্ত নিতে এসেছেন। অ্যাই?'

'উম্।' মিসেস দত্ত চোখ খুললেন। ঢুলুঢুলু চোখ।

'মিস্টার দত্ত নিতে এসেছেন!' এবার একটু জোরে বললেন নীলিমা।

'আমি যাব না। আমি এই প্রবরের সঙ্গে থাকব।'

'সেকি? কেন? একটু আগে শুনলাম ও বোর করছে।'

'বলেছি বুঝি? ভুল বলেছি। এতক্ষণ জড়িয়ে আছি বাট হি নেভার ট্রায়েড টু মলেস্ট মি। এমন কি হাতও দেয়নি। খুব ভদ্র ছেলে। আমি ভদ্র ছেলে আজকাল দেখতে পাই না। আই লাইক হিম।' গলার স্বর আধবোজা।

'ঠিক আছে। পরে কথা বললে তো হবে। মিস্টার দত্ত দাঁড়িয়ে আছেন

দরজায়।' নীলিমা সামান্য আকর্ষণ করতেই ভদ্রমহিলা এগিয়ে চললেন। সূর্য ওঁদের সঙ্গে গেল। প্রবর স্তম্ভিতের মত দাঁড়িয়ে রইল। মাতাল স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফিরছেন স্বামী? কৌতূহলী হয়ে সে দরজার আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল। মিস্টার দত্তকে দেখা যাচ্ছে। রোগা, টাকমাথা, ভালমানুষ দেখতে এক প্রৌঢ় বলছেন, 'অনেক খেয়ে ফেলেছ নন্দিতা, আজ তোমাকে কি ভাবে নিয়ে যাব বুঝতে পারছি না।'

'আই অ্যাম সরি মিস্টার দত্ত—!' নীলিমা বললেন।

'না, না। আপনি কিছু মনে করবেন না। নন্দিতা খুব খেতে ভালবাসে। বাড়িতে একা খেলে বেশি খাওয়া হয়ে যায় বলে সিলেক্টেড জায়গায় গেলে আমি আপত্তি করি না। সকালে উঠেই ওর লিভার ঠিক রাখার সব ব্যবস্থা আমাকে করতে হয়। আপনি যদি একটু হেলপ করেন?' মিস্টার দত্ত সূর্যর দিকে তাকিয়ে অনুরোধ করলেন। সূর্য বলল, 'নিশ্চয়ই। চলুন।'

মিস্টার দত্তের ক্ষমতা ছিল না আজকের মিসেস দত্তকে বহন করা। সূর্যর কাঁধে ভর দিয়ে ভদ্রমহিলা দরজার বাইরে পা বাড়ালেন। মিস্টার দত্ত পেছন পেছন চললেন। ওঁরা বেরিয়ে গেলে দরজা বন্ধ করে ঘুরে দাঁড়াতেই নীলিমার চোখ পড়ল প্রবরের ওপর। প্রবর বলল, 'মনে হয় উনি আজ বেশি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।'

মাথা নাড়লেন নীলিমা, 'না। এরকমই হয়।'

'তাহলে আপনারা ওকে অ্যালাউ করেন কেন?'

'অভ্যেস বলতে পারেন। মিসেস দত্তের কিন্তু সম্পূর্ণ সেন্স আছে।'

'সেকি?'

'নইলে উনি বলতে পারতেন না আপনি ভদ্র ব্যবহার করেছেন।'

'ফেরা উচিত।'

'আমার বেশ দেরি হয়ে গেছে। সূর্য যাবে উল্টোদিকে। তাড়াতাড়ি না ফিরলে—'।

'বাড়িতে টেলিফোন করা যায় না?'

'যায়—।' প্রবর এগিয়ে গেল টেলিফোনের দিকে। ডায়াল করতেই সে পারমিতার গলা শুনতে পেল, 'কি ব্যাপার? রাত হচ্ছে কেন?'

'আর বলো না। ঝামেলায় আটকে গেছি।'

'আমি তাই বললাম তোমার বাবাকে। নিশ্চয়ই হাসপাতালে আটকেছে। কত দেরি হবে মনে হয়। আমি জেগে থাকব?' পারমিতা জিজ্ঞাসা করল।

'না, জেগে থাকার দরকার নেই। আমি পৌঁছালে বেল বাজাব। কেউ আমাকে টেলিফোন করেছিল সন্ধ্যের পরে?'

'না তো।'

'রাখছি।' মন খারাপ হয়ে গেল।

'নীলিমা হাসলেন, 'বান্ধবী ফোন করেনি?'

মাথা নাড়ল প্রবর, না। তারপর বলল, 'ছেড়ে দিন। তা আপনাদের বিয়ের নেমন্তন্ন কবে খাচ্ছি?'

'দেখি।' নীলিমা মুখ ফেরালেন, 'আজ রাত্রে এখানে খেয়ে যাবেন?'

'সেকি ? কেন ?'

'এমনি। এমন কিছু ভাল মেনু নেই অবশ্য ! আপনি বসুন, আমি ব্যবস্থা করি।' নীলিমা চলে গেলেন কিচেনের দিকে। প্রবর একটা চেয়ারে বসল। জীবন অদ্ভুত। একজন এত বছর প্রেম করার পরেও কেমন শুচিবাইগ্রস্তা অন্যজন প্রায় অপরিচিত পুরুষের শরীরে নিজেকে ছেড়ে দিতে দ্বিধা করেন না। প্রথমটিকে যেমন সমর্থন করা যায় না। দ্বিতীয়টিকেও মেনে নিতে অসুবিধে হয়। কিন্তু কেন একটাও ফোন করল না। তার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল গানকে টেলিফোন করতে। রাত ঢের হয়েছে, ফোনে কথা বলার সময়ও এটা নয়। তবু—। সে নিজেকে সংযত রাখতে পারল না। ডায়াল করতে হল তিনবার। শেষ পর্যন্ত রিঙ হল। গানের বাবার গলা পাওয়া গেল। কি বলবে বুঝতে একটু সময় গেল এবং তাতেই ভদ্রলোক বিরক্ত হয়ে লাইন কেটে দিলেন। এই সময় দরজায় বেল বাজল। নীলিমা এঘরে এসে দরজা খুলতেই সূর্যকে দেখা গেল, 'যাচ্ছি, প্রবর যাবি তো ?'

নীলিমা বলে উঠলেন, 'যাবে মানে ? আমি টেবিলে ডিনার দিয়েছি।'

'না জিজ্ঞাসা করে কেন দাও ?' সূর্য খুব বিরক্ত হল।

'জিজ্ঞাসা করার কি আছে ? তুমি তো খেয়েই যাও।'

'আজ খাবো তার কোন মানে নেই। এইসব মাতাল বহন করে আমার শরীর ভাল নেই। প্রবর, তুই তো উল্টোদিকে যাবি, তুই খেয়ে যা।' কথা শেষ করে সূর্য দ্রুত চলে গেল চোখের সামনে থেকে। প্রবর একেবারে হতভম্ব হয়ে পড়েছিল। এই বাড়িতে সূর্যই তাকে নিয়ে এসেছিল নেমন্তন্ন খাওয়াতে। একটু আগেও সে খুবই স্বাভাবিক ছিল। হঠাৎ এই পরিবর্তনের কোন ব্যাখ্যা তার কাছে নেই। প্রবর দেখল নীলিমা পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছেন। শেষতক ঘুরে বললেন, 'আপনিও নিশ্চয়ই খাবেন না ?'

'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না ? ওর হঠাৎ কি হল ?' প্রবর জিজ্ঞাসা করল।'

মাথা নাড়লেন নীলিমা, 'মাঝে মাঝে আমিও বুঝি না। কি করবেন ?'

'আপনার যদি অসুবিধে না থাকে তাহলে অমার খেতে আপত্তি নেই।'

নীলিমার মুখ কিঞ্চিৎ স্বাভাবিক হল। তিনি বললেন, 'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। বুঝতেই পারছেন আপনার বন্ধু আমাকে অপমান করল।'

'কিন্তু কেন ?'

'আমি আপনাকে বেশী মদ খেতে নিষেধ করছিলাম বলে। মিসেস দত্ত আপনাকে প্রশংসা করছিলেন সেটাও কারণ। সূর্য মেয়েদের শরীর ছাড়া ভাবতে পারে না। আমার খুব খারাপ লাগছে এসব বলতে, কারও অনুপস্থিতিতে বলাও শোভন নয়।' নীলিমা মাথা নামালেন।

প্রবর এগিয়ে এল কাছে, 'নীলিমা, আজ রাত্রে আপনার নিশ্চয়ই খেতে ইচ্ছে করছে না ?'

নীলিমা তাকালেন।

'ধরুন। আজ আপনি কিংবা আমি যদি না খাই ?'

বোঝা গেল নীলিমা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন, 'আপনি এত বোঝেন ?'

'বেশী বুঝি না। তাহলে আমি চলি।'

'আসুন। কিন্তু আর একদিন আমার এখানে না খেয়ে গেলে সারাজীবন ধরে একটা গ্লানি থেকে যাবে প্রবরবাবু।'

'ঠিক আছে, খাওয়া তো যে কোনদিন যেতে পারে। তবে শুধুই খাওয়া খাব না।'

'তাহলে তো আপনার বন্ধুকে বাদ দিয়ে আসতে হয়।'

'ও, তা বটে।'

'আমি জানি না, এভাবে আর কতকাল টানতে পারব। আচ্ছা, আপনার টেলিফোন নম্বরটা কি আমি পেতে পারি?'

প্রবর টেলিফোনের সামনে গিয়ে বইটা খুলে পাতায় নিজের নম্বর লিখে বলল, 'আমি সকাল নটায় বেরিয়ে যাই। আচ্ছা নমস্কার।'

দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন নীলিমা, 'আমি খুবই দুঃখিত।'

'আরে কি আশ্চর্য! আপনি শান্ত থাকুন।' একটু দাঁড়ান, সূর্য, 'আমার বলা ঠিক নয়, যা করবেন তা ভালমন্দ ভেবে করবেন।' প্রবর আর দাঁড়াল না। নির্জন রাজপথে নেমে সে এলোমেলো হাঁটতে লাগল। হঠাৎ মনে হল ষাট বছর যদি মানুষের গড় বয়স হয় তাহলে সে ইতিমধ্যে এক তৃতীয়াংশ সময় কাটিয়ে দিয়েছে। মানুষের তৈরী হবার সময় এটা। এখন বাকি দুই তৃতীয়াংশ সময় হলো লড়াই-এর। গান যদি তাকে না চায় তাহলে সে কেন ওর জন্যে নাছোড়বান্দা হবে? কেমন ঘোরের মধ্যে সে হেঁটে যাচ্ছিল।

দিন দশেক বাদে গানের মুখোমুখি হল প্রবর। থিয়েটার রোড আর সার্কুলার রোডের মোড়ে খোলা রেস্টুরেন্টে বসেছিল ওরা। কফির অর্ডার দিয়ে প্রবর সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করল! তুমি কি চাইছ বল?'

'কি ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করছ?'

'আমাদের সম্পর্কের ব্যাপারে!'

'আমি বুঝতে পারাছি না তোমার বক্তব্য।'

'তুমি কি সম্পর্ক রাখতে চাইছ না?'

'যা ছিল তা থেকে সরে আসার কোন কারণ আছে কি?'

'এই দ্যাখো, তুমি এড়িয়ে যাচ্ছ! গত দুই সপ্তাহ ধরে আমাদের দেখা সাক্ষাৎই হচ্ছে না অথচ দুজনেই কলকাতায় আছি। এটা স্বাভাবিক?'

'আমার তো মনে হয় এটা সাময়িক ব্যাপার।'

'আমার সম্পর্কে তোমার কি অভিযোগ আছে?'

'অভিযোগ? সেরকম কখনও মনে হয়নি তো!'

'আশ্চর্য! তুমি আমাকে এড়িয়ে চলছ না?'

'অপছন্দ মানেই তা নিয়ে অভিযোগ করব কেন? তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে আমার সম্পর্কেও তুমি খুব স্বাভাবিক নও।'

'না, নই। তোমার এই উনিশশতকী মানসিকতা আমি পছন্দ করছি না। ট্রেনের কামরায় তোমার কাঁধে হাত রেখেছি বলে—!' প্রবরকে থামিয়ে গান বলল, 'আমার আপত্তি তোমার হাত রাখায় নয়।'

'তাহলে ?'

'হাত রাখার জন্যে তোমাকে নির্জনতার সুযোগ নিতে হয়েছে।'

'আশ্চর্য ! আর পাঁচটা মানুষের সামনে হাত রাখলে তুমি খুশি হতে ?'

'তাতে বুঝতাম তুমি স্বচ্ছন্দ। কোন অপরাধবোধ নেই।'

হা হয়ে গেল প্রবর। এরকম জবাব পাবে সে কল্পনাই করেনি। কথা খুঁজে না পেতে প্রবর জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি আমাকে ভালবাস গান ?'

'দ্যাখো, সেটা আমার সমস্যা।'

'সমস্যা কেন ?'

'ভালবাসা মানেই নানান রকমের প্রতিক্রিয়ার মুখোমুখি হওয়া।'

'গান, আর কদিন বাদে আমি ডাক্তারি করব। পড়াশুনোর ইচ্ছে আপাতত নেই। আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই।' প্রবর সোজাসুজি বলল। গান আচমকা হেসে উঠল, 'এই কথাটা তো অনেক অনেক কাল আগে মুখে না বলে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছিলাম। আজ তোমাকে মুখে বলতে হচ্ছে কেন ?'

প্রবর বলল, 'তাহলে, তুমি যে ব্যবহার করলে সেটা..।'

'সাময়িক প্রতিক্রিয়া বলতে পার। আমি তো জল নই যে চট করে চেহারা বদলাবো !'

সেই মুহূর্তে নিজেকে খুব নির্বোধ বলে মনে হচ্ছিল প্রবরের। গান যেন তার থেকে অনেক বেশী বোঝে, অনেক সাবালিকা।

সূর্যর সঙ্গে প্রবরের এর মধ্যে আর দেখা হয়নি। হাতে কলমে কিছু অভিজ্ঞতা হবে বলে সে সরকারি চাকরি নিয়ে ইতিমধ্যে মফস্বলে চলে এসেছে। কলকতা থেকে মাত্র পঁয়তাল্লিশ মিনিটের ট্রেনপথ পেরিয়ে বাসে চেপে আরও আধঘণ্টা গেলে সেই আধাগ্রাম পৌঁছানো যায়। একটা হেলথসেন্টার আছে যার ঘর আছে কিন্তু মেঝে নেই এমন অবস্থা। প্রথম কয়েকদিন সে কলকাতা থেকেই যাতায়াত করেছিল। একদিন গানও এসেছিল সঙ্গে। সারাদিন বেকার কাটিয়ে ফিরে গিয়ে বলেছিল, 'এই চাকরিটা তোমাকে করতেই হবে ? যা শিখেছ তার সবটাই তো ভুলে যাবে !'

কথাটা ভুল নয়। আশি ভাগ ওষুধই হাতের কাছে পাওয়া যায় না। কোন রুগীকে ঠিক ঠাক প্রেসক্রাইব করলে বেচারা ওষুধের অভাবেই মারা যাবে। অতএব হাতের কাছে থোড়বড়ি যা আছে তাই দিয়েই কাজ চালাতে হয়। ফলে কেউ সারে, কেউ ভোগে। নিজেকে উন্নত করার কোন সুযোগ নেই। কিন্তু একটু জেদ নিয়েই পড়ে রইল প্রবর। একটা থাকার আস্তানাও পাওয়া গেল। সোম থেকে শুক্র সেখানে থেকে শনিবার কলকাতা। কলকাতা মানে গান।

পারমিতার ইচ্ছে ছিল না প্রবর এত তাড়াতাড়ি চাকরি করে। ছেলে এম ডি পাশ করুক, প্রয়োজনে বাইরে যাক এমন ইচ্ছে ছিল তার। কিন্তু প্রবরের যুক্তি হল, যে দেশের মানুষ সামান্যতম চিকিৎসার সুযোগ পায় না সেদেশে বড় ডিগ্রি নিয়ে এলে কিছু লোকের উপকার হতে পারে কিন্তু সাধারণ মানুষ বঞ্চিত থাকবেই। শুধু অর্থ রোজগারের জন্যে চিকিৎসাশাস্ত্র নিয়ে পড়াশুনা সে করেনি এটা প্রমাণ করা দরকার। পারমিতা ভেবেছিল ছেলে খুব তাড়াতাড়ি বিয়ে করতে চায় বলেই চাকরি নিয়েছে। কিন্তু এই চাকরি থেকে যা আয় হচ্ছে

তাতে যার নিজের খরচই ভালভাবে চলে না সে বিয়ে করবে কি ! তার মনে হত গানই প্রবরকে চাপ দিয়েছে চাকরি করার জন্যে। কিন্তু মনে এমন ভাবনা এলেও পারমিতা তা প্রকাশ করতে সংকোচ করেছে।

এক শনিবার সন্ধ্যায় কলকাতায় ফিরে প্রবর যখন গানের সঙ্গে দেখা করতে যাবে বলে তৈরী হচ্ছে তখন পারমিতা তাকে জানাল এক ভদ্রমহিলা দুবার ফোন করছিলেন। ভদ্রমহিলার নাম নীলিমা। বলেছেন দরকারটা বেশ জরুরি কিন্তু বিশদ বলতে চাননি। প্রবর খুব অবাক হল। নীলিমার কথা তার মাঝে মাঝে মনে পড়ত কিন্তু নিজে উদ্যোগী হয়ে আর যোগাযোগ করেনি। হয়তো সূর্য নিরাসক্ত ছিল বলেই সে নীলিমা সম্পর্কে একটু নির্লিপ্ত ছিল।

পারমিতা জিজ্ঞাসা করল, 'ভদ্রমহিলা কে রে ?'

'সূর্যর বন্ধু।'

'ও।' পারমিতা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে প্রবরের খেয়াল হল যে কাগজে সে নীলিমার টেলিফোন নম্বর লিখে রেখেছিল সেটি কোথায় রেখেছে মনে পড়ছে না। সে গানের সঙ্গে দেখা করতে ওদের বাড়িতে গেল।

গানের বাবা বসেছিলেন বাইরের ঘরে। প্রবরকে দেখে মুখ তুললেন। প্রবর হাসল, 'কেমন আছেন আপনি ?'

বৃদ্ধ সামান্য সময় তাকিয়ে থাকলেন, 'তুমি কিছু জানো না ?'

চোখ ছোট হল প্রবরের, 'কি ব্যাপারে ?'

'গানের অসুস্থতা নিয়ে কিছু খবর রাখো না ?'

'অসুস্থতা ? গানের ? কি বলছেন আপনি ?'

'ওকে গত পরশু ঠাকুরপুকুরে ভর্তি করা হয়েছে। তোমার মাসীমা আর তান গিয়েছে আজও, ফেরারও সময় হয়ে এল।' বৃদ্ধের চোখে জল।

'কি বলছেন আপনি?' হঠাৎ পৃথিবীটা অন্ধকার হয়ে গেল প্রবরের সামনে।

'আমি জানতাম তুমি জানো। অনেকদিন মিশছো— !'

'আমি কিছুই জানি না !' আকাশ থেকে পড়ল প্রবর, 'অসম্ভব, এ হতে পারে না। গত রবিবারেও ও আমাদের বাড়িতে গিয়েছিল।'

'ও এটা এতকাল বহন করেছে প্রবর। একটি শিক্ষিতা মেয়ে এমন নির্বোধ হবে কে ভাবতে পেরেছিল। ডাক্তার বলছে ও অন্তত এক বছর আগে জানতে পেরেছিল। জানামাত্র চিকিৎসা শুরু হলে লড়াই করার একটা জায়গা থাকত !'

সমস্ত সত্তা খান খান হয়ে যাচ্ছিল প্রবরের। কোন কথাই এখন তার মাথায় ঢুকছিল না। সে হিংস্র গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'ঠিক কি হয়েছে ওর ?'

'টিউমার। ব্রেস্টে।'

'ওহো ! ব্রেস্ট টিউমার এমন কিছু ভয়ের নয়।'

'নয়। কিন্তু—'। আমি আর বলতে পারছি না।' বৃদ্ধ চলে গেল ভেতরে। সেই শূন্য ঘরে কয়েক মিনিট পাথরের মত বসে রইল প্রবর। অসম্ভব শব্দটা বারংবার পাক খাচ্ছিল মনে। সে নিজে ডাক্তার। এক বছর ধরে বিনা চিকিৎসায় কেউ এমন রোগ চেপে রাখতে পারে না, পারলে—। প্রবর উঠে দাঁড়াল। আর তখনই ফিরে এল তান এবং তার মা। প্রবরকে দেখতে পেয়েই প্রৌঢ়া ডুকরে কেঁদে উঠলেন। তান চুপচাপ দাঁড়িয়ে। সামনে

গিয়ে দাঁড়াল প্রবর, 'আমাকে বল।'

তান নিচু গলায় বলল, 'আত্মহত্যার চেষ্টা ছাড়া এর অন্য কোন ব্যাখ্যা নেই প্রবর।'

'কি হয়েছে তাই বল!' জেদী শোনাল প্রবরের গলা।

'ব্রেস্টে টিউমার হয়েছিল। লেফট ব্রেস্টে। কাউকে বলেনি। তরশু পেইন হয়। সেটা আর সামলাতে পারে না। আমাদের হাউস ফিজিসিয়ান দেখেই সন্দেহ করেন। পরশু ঠাকুরপুকুরে ভর্তি করা হয়েছে। আজ সকালে জানা গেছে ওটা সত্যিই ম্যালিগন্যান্ট।' ঠোঁট কামড়ালো তান। তারপর বলল, 'ডাক্তাররা বলছেন ব্রেস্ট ক্যানসারের সিম্পটম সবচেয়ে আগে বোঝা যায়। গান নিশ্চয়ই বুঝেছিল। কিছু মনে করো না, আমি তোমাকে একটা প্রশ্ন করতে বাধ্য হচ্ছি, তুমি ওর সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠ, সেটা কি শারীরিক কোনরকম সম্পর্ক ছাড়াই?'

নিঃশ্বাস নিল অনেকটা, নিয়ে প্রবর মাথা নাড়ল, 'কখনই আমাকে ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ দেয়নি তান। বিশ্বাস করো, আমি ভাবতাম ও বেশী রকমের রুচিবাগীশ। আমি কি করে জানব একটা বড় অসুখ আড়াল করতে ও এমন ভাবে নিজেকে গুটিয়ে রাখে। কিন্তু কেনই বা তা করল? আমার মাথায় কিছু নিচ্ছে না।' হঠাৎ কেঁদে ফেলল প্রবর।

তখন এমন একটা সময় যে ঠাকুরপুকুরে পৌঁছেও গানের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি পাওয়া যাবে না। সেই রাত চোখ খুলে কাটাল প্রবর। রাত যত বাড়তে লাগল নিজের ঘরের চেয়ারে বসে সে আবিষ্কার করলে তার মস্তিষ্ক আর কিছু ভাবছে না। কেমন অসাড় হয়ে গেল সে? গানের ক্যানসার হয়েছে। একটু একটু করে দিনের পর দিন সেই অসুখটা ওর শরীর কুরে কুরে খেয়েছে অথচ কাউকে জানায়নি। কেন? মানুষ নিজের শরীরকে ভালবাসে। নিজের শরীরের সামান্য হেরফেরে ভয় পায়। তাহলে? গান কিছুদিন বাদে পৃথিবীতে থাকবে না। তানের মান অভিমান ভালবাসা তখন স্মৃতি হয়ে তাকে আঁচড়াবে। কিন্তু ব্রেস্ট ক্যানসার এবং ইউটোরাসে ক্যানসার যদি প্রাথমিক পর্বেই আবিষ্কৃত হয় তাহলে মেয়েদের প্রাণহানির সম্ভাবনা খুবই কম থাকে। গান এটা কি করল?

হঠাৎ ঘরের দরজায় শব্দ হতেই প্রবর মুখ ফেরাল। পারমিতা দাঁড়িয়ে। তার চোখে বিস্ময়। ধীরে ধীরে কাছে এসে পারমিতা জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে?'

'কিছু না।' মাথা নাড়ল প্রবর।

'কিছু একটা না হলে এত রাত পর্যন্ত চেয়ারে বসে থাকতিস না। তোর যদি আমাকে বলতে অসুবিধে থাকে তাহলে আলাদা কথা। এখন তো বড় হয়ে গিয়েছিস।' হঠাৎ পারমিতার গলা ধরে এল একটু। প্রবর মায়ের দিকে তাকাল। মা এখনও সুন্দরী। বাবা সেই তুলনায় যথেষ্ট বুড়িয়ে গিয়েছে। সে নিচু গলায় বলল, 'গানের ক্যানসার হয়েছে। ঠাকুরপুকুরে আছে। আজই প্রথম জানতে পারলাম।'

প্রায় মিনিটখানিক চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল পারমিতা। তারপর নিঃশব্দে

বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। শূন্য ঘরে নিজের বলা শব্দগুলোকে যেন নিঃশব্দে মারপিট করতে শুনল প্রবর। গান থাকবে না। গান আর থাকবে না।

পরদিন সকালে সে যখন ঠাকুরপুকুরে গানের বিছানার পাশে তখন বাইরে চমৎকার রোদ্দুর। মুখোমুখি হওয়ামাত্র গান হেসেছিল, 'কেমন আছ'?

গলা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, প্রবরের। তকে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। খানিক চুপ করেত থেকে সে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'এতদিন আমাকে বলনি কেন?'

গান মাথা নেড়েছিল, 'ঠিকঠাক বুঝে উঠতেই দিন চলে গেল।'

'মিথ্যে কথা। তুমি জানতে। তাই ট্রেনের কামরায় আমাকে ভয় পেয়েছিলে।'

গান চোখ বন্ধ করল। ভিজে গেল চোখের পল্লবগুলো। প্রবর বলল, 'মন শক্ত করো গান। তোমাকে বাঁচতেই হবে। ইউ মাস্ট।'

'যে জীবন আর কিছুই দিতে পারবে না সেই জীবন বেঁচে কি লাভ?'

'দেওয়া বলতে তুমি কি বোঝ?'

'তুমি শরীর চাও। দেওয়ার মত শরীর আর আমার নেই।'

যেন প্রচণ্ড জোরে প্রবরের গালে কেউ চড় মারল। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল সে। গান বলল, 'তুমি বলেছ প্রেম বাঁচাতে গেলে শরীর দরকার। তাই না?'

প্রবর বেরিয়ে এল। ডক্টর গুপ্তের দেখা সে পেল না। যিনি গানকে দেখছেন সেই ডাক্তারের সঙ্গে নিজের পরিচয় দিয়ে কথা বলল সে। ভদ্রলোক এখনও আশাবাদী। যদিও বেশ দেরিতে ধরা পড়েছে কিন্তু অপারেশন করলে রোগের অগ্রগতি থামানো যেতে পারে। ওঁরা অপারেশন করবেন আগামীকাল।

সাতটা দিন কেমন ঘোরের মধ্যে কেটে গেল প্রবরের। গানের অপারেশন হয়েছে। দুটো স্তনই নির্মূল করে বাদ দিতে হয়েছে। তার ওজন কমছিল কিন্তু শরীর ছোট হয়ে আসেনি। জ্ঞান ফেরা এবং ঘুমের মধ্যে কয়েকদিন কাটিয়ে সে যখন কথা বলতে পারল তখন ওর আত্মীয়দের পাশে পারমিতাও বসে। যতক্ষণ তৃতীয় ব্যক্তি ছিল ততক্ষণ পারমিতার সঙ্গে একটাও কথা বলেনি গান। তাকে শোনানো হয়েছে প্রবর ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলছে। যখন সে পারমিতার সঙ্গে একা হল তখন বলল, 'মাসীমা, আমার একটা কথা আছে।'

'বল।'

'আপনি খুব তাড়াতাড়ি প্রবরের বিয়ে দিয়ে দিন।'

'কত তাড়াতাড়ি?'

'আমি থাকতে থাকতে। ও খুব সেন্টিমেন্টাল। ওর আর একটা অবলম্বন দরকার।'

পারমিতা বলল, 'মাসখানেকের মধ্যে কিছু করা যাবে না গান!'

'মাস খানেক? পাত্রী ঠিক হয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ।'

'কেমন স্বভাব?'

'মন্দ নয়। তবে ভীষণ বোকা, সেটাই চিন্তার।'

'না না। বোকা মেয়ের সঙ্গে ওর বিয়ে দেবেন না। প্রবর কষ্ট পাবে।'

'বলছ ? তাহলে তো আবার ভাবতে হয়।'

'হ্যাঁ। দেখেশুনে বুঝে তবে দেবেন।'

এই সময় প্রবর এবং তান ঘরে এল। প্রবর হাসল, 'কেমন আছ ? এত কথা হচ্ছে কেন ?'

গান পারমিতার দিকে তাকাল, 'বোকামিতে আপনার ছেলেও কম যায় না। ওই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে হলেও তো আমাকে কথা বলতে হবে।'

তান বলল, 'একটা ভাল খবর আছে। তোকে দিন পাঁচেকের মধ্যে ছেড়ে দেবে।'

'ছেড়ে দেবে ? কেন ?' গান অবাক।

'তখন তুই বাড়িতে থাকতে পারবি। প্রতি সপ্তাহে এসে চেক করাতে হবে।'

'তারপর ?'

'তারপর আর কি। যদি নতুন উপসর্গ দেখা না যায় তাহলে মাসে একবার, বছরে একবার তারপর জীবনে আর কোনবারই নয়।' তান হাসল।

'সত্যি ?' গানের মুখ যেন শরতের সকাল।

পারমিতা বলল, 'এবার ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলি। একমাস তো সময় দিয়েছে আমাকে। দেখি তার মধ্যে কিছু করা যায় কিনা !'

তান জিজ্ঞাসা করল, 'কিসের সময় ?'

পারমিতা তাকাল, 'গান চাইছে মাসখানেকের মধ্যে প্রবরের বিয়ে হয়ে যাক।'

প্রবর চাপা গলায় বলল, 'মা।'

'আমাকে বকছিস কেন ? গান যা বলল আমি তাই বলছি। কি গান ?'

ঠোঁট টিপে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল গান।

পারমিতা উঠে দাঁড়াল টুল ছেড়ে, 'তাহলে তান, তোমার বাবাকে বলো আমরা ওঁর সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

তান অবাক হয়ে তাকাল। গানের কপালে ভাঁজ। পারমিতা হাসল, 'শুধু একটাই সমস্যা থাকছে। গান চাইছে না কোন বোকা মেয়ের সঙ্গে প্রবরের বিয়ে হোক। কিন্তু তোমার বোনকে তো আমরা বুদ্ধিমতী বলতে পারছি না তান !'

গান চোখ বন্ধ করতেই দুকোল বেয়ে জল গড়িয়ে এল। সে মাথা নাড়ল ওই অবস্থায়, 'না, হয় না, এ হয় না।'

পারমিতা এগিয়ে এসে মাথায় হাত রাখল, 'তোমাকে এখন এসব নিয়ে ভাবতে হবে না। আগে ভাল হয়ে ওঠ, তারপর তর্ক করবে।'

সাতদিনের প্রতিটি সকাল সন্ধ্যে প্রবর ঠাকুরপুকুরে গিয়েছে। নিজের কাজ থেকে ছুটি নিয়েছে, অন্যকোন দিকে মন দেয়নি। একটু একটু করে তাজা হচ্ছিল গান, কথা বলছিল স্বাভাবিক গলায়। মুখের চেহারাও বদলে যাচ্ছিল। প্রবর ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। ডাক্তারের অনুমতি পাওয়ামাত্র সে

বিয়ে করবে গানকে। জীবন মানেই তো কিছুটা হারানো কিছুটা পাওয়া। গান তার ভালবাসা নিয়ে পাশে থাকলে সে অনেক কিছুই উপেক্ষা করতে পারবে। নিজেকে বুঝিয়েছিল সে।

কিন্তু ঈশ্বর অন্যরকম পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন। বাড়ি ফেরার দিন চারেক বাদে হঠাৎ প্রচণ্ড জ্বর এল গানের। প্রবর তখন তার কার্যস্থলে। গান বিছানায় ভাল ভাবেই শুয়ে আছে জেনে গিয়েছিল সে। খবর পেয়ে যখন কলকাতায় ছুটে এল তখন সব শেষ।

পৃথিবীটা হঠাৎ একেবারে ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল প্রবরের কাছে। চারপাশে সব আগের মতন আছে শুধু গান নেই। যতই ইচ্ছে হোক তার কাছে পৌঁছানো যাবে না। মানুষের শরীরের সঙ্গে সঙ্গে তার অস্তিত্ব লোপ পেয়ে গেল ! পৃথিবীকে যাঁরা কিছু দিয়ে যান তাঁদের ক্ষেত্রে অবশ্য একথা প্রযোজ্য নয়। কিন্তু বেশীরভাগের বেলায় ওই কথা খেটে যায়। হ্যাঁ, গান যদি বেঁচে থাকত, যদি তার স্ত্রী হত তাহলে একটি পূর্ণ নারীর সবরকম ভূমিকায় অবশ্যই তাকে দেখা যেত না। যদি সন্তান আসত তাহলে তাকে স্তন্যদুগ্ধ থেকে বঞ্চিত হতে হত। কিন্তু এসবই তো মেনে নিত প্রবর। তার কেবলই মনে হতে লাগল মানুষকে অখুশী রাখাতেই ঈশ্বরের আনন্দ। যদি অবশ্য ঈশ্বর বলে কোন শক্তি থাকেন।

ছেলের মানসিক অবস্থা বুঝতে পেরেছিল পারমিতা। কিন্তু সান্ত্বনার কথা নিজে থেকে বলতে চায়নি। অপারেশনের পর ছেলের মনের কথা বুঝে যখন হাসপাতালে সে গানকে বিয়ের কথা বলতে গিয়েছিল তখনও নিজেকে নির্লিপ্ত রেখেছিল। ডাক্তার যাই বলুন, পুত্রবধূ হিসেবে একটি অসম্পূর্ণ নারীকে গ্রহণ করতে পারমিতার মন চায়নি। কিন্তু মেয়েটার মুখের চেহারা পাল্টে গেছে দেখে তার ভালও লেগেছিল। এখন ছেলে যে প্রতি শনিবার আসছে না কলকাতায় তাতে তার কষ্ট হচ্ছে কিন্তু তা নিয়ে কোন কথা বলেনি। সব ক্ষতের জন্যে প্রলেপ দরকার। মনের ক্ষতের সবচেয়ে বড় প্রলেপ কাজ আর সময়। তাই কোন ক্ষতই দীর্ঘস্থায়ী হয় না।

এক শনিবারে প্রবর কলকাতায় এল। পারমিতা দেখল ছেলের শরীর বেশ খারাপ হয়ে গিয়েছে। রোগা হয়েছে অনেকটা, গালও সামান্য বসেছে। পারমিতা না জিজ্ঞাসা করে পারল না, 'তোর শরীর এমন হয়েছে কেন ?'

মুখ না ফিরিয়ে প্রবর বলল, 'কেন ? আমি তো ভালই আছি।'

'তোর চেহারা অবশ্য সেকথা বলছে না।'

'একটু খাটুনি হয়েছে, খাওয়া-দাওয়ার সমস্যা হয়।'

'ওখানে পড়ে থেকে কি লাভ ?'

'কি করতে বলছ ?'

'তোর বাবা বলছিল কলকাতাতেই প্র্যাকটিশ করতে। উনি মোড়ের মাথায় এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলেছেন। তিনি তাঁর নিচের ঘরটা ভাড়া দিতে রাজী আছেন।'

'চেম্বার সাজিয়ে বসলেই পেশেন্ট আসবে ভিড় করে একথা কে বলল ?'

'প্রথম দিনে না আসুক, ধীরে ধীরে আসবে।'

'আসলে মা, আমার মাঝে মাঝে মনে হয় চিকিৎসা করার কোন মানে হয় না। বেশীর ভাগ অসুখই তো আমরা সারাতে পারি না। যেসব ওষুধ দিলে কিছুটা কাজ দেয় তা কেনার সামর্থ নব্বুই ভাগ মানুষের নেই। শুধু অসহায় চোখে দেখা ছাড়া বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে কিছু করার থাকে না।'

'সবই ঠিক। কিন্তু ডাক্তাররা যেটুকু উপকার করেন সেটা না পেলে অমাদের দুর্দশা আরও বেড়ে যেত। সেইটে কি কম দামী?' পারমিতা প্রশ্ন করেছিল।

'সবই জানি মা। কিন্তু চোখের ওপর দেখছি একটা শরীর জন্মায় বড় হয় তারপর দুম করে ছাই হয় যায়। আমরা চিকিৎসাশাস্ত্র পড়েও কোন কাজে লাগাতে পারি না। ঠিক আছে, তোমার কথাটা আমি ভেবে দেখব।' প্রবর সামনে থেকে চলে যেতে চাইল।

এসবই যে গানের মৃত্যুর কারণে তা পারমিতা জানে। কিন্তু গান-বিষয়ক কোন কথা প্রবর আলোচনা করে না বলেই সে প্রসঙ্গটি তোলে না। মাঝে মাঝে মনে হয় যে ছেলেকে সে পেটে ধরেছিল, একটু একটু করে বড় করেছিল, স্বামীকে যতটা পারেনি তার অনেক বেশী ভালবাসা যাকে স্বচ্ছন্দে দিতে পেরেছিল সে এখন অন্য একটি মৃত মেয়ের জন্যে নিজেকে বিক্ষত করছে, এ কেমন বিচার? কি ছিল গানের মধ্যে যা পারমিতা দিতে পারেনি? মা আর প্রেমিকার মধ্যে তফাৎ শুধু দৈহিক আকর্ষণে। সেটাই কি সব কিছু ভাসিয়ে দেয়? এখন এই মুহূর্তে গানের শরীর ছাই হয়ে গেছে, কোন আকর্ষণ আর থাকতে পারে না, তবু ওর মন জুড়ে রয়েছে সে। পারমিতা যখন থাকবে না তখন প্রবর কি এমনই তার কথা ভাববে? বাগটুলির গুলির মত দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে নিচে পড়ে যায় ভাবনাগুলো, নশ্বরের ঘর পায় না।

হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল। সে একটু এগিয়ে জিজ্ঞাসা করল, হ্যাঁরে, তুই সেই নীলিমা বলে মেয়েটার সঙ্গে আর যোগাযোগ করিসনি?'

প্রবর জামা খুলছিল, জিজ্ঞাসা করল, 'কেন? আবার ফোন করেছিল নাকি?'

'হ্যাঁ। গতকালই। তোর ঠিকানা চাইছিল।'

'দিয়েছ নাকি?'

'না। মেয়েটি কে?'

'মেয়ে নন, ভদ্রমহিলা। বিবাহিতা। স্বামী নেই কিন্তু ছেলে আছে।'

'ও। তোর সঙ্গে জরুরী দরকার বলছিল।'

'কি জানি!'

পারমিতা আর দাঁড়ায়নি। নীলিমার পরিচয় পাওয়ার পর ছেলের ওই উদাসীনতা তাকে আশ্বস্ত করল। সে সোজা চলে এল মনোরমার ঘরে। ভদ্রমহিলা সাহায্য ছাড়া বিছানা থেকে নামতে পারেন না। একটি দিন রাতের আয়া রাখা হয়েছে তাঁর জন্যে। পাশে বসে পারমিতা শাশুড়িকে বলল, 'আপনার নাতি এসেছে। এবার আপনি একটা কিছু করুন। মেয়েটা মরে যাওয়ার পর থেকে আমি ওকে ঠিক বুঝতে পারি না।'

মনোরমা বললেন, 'আমার সঙ্গে ভাল করে সে কথাই বলে না।'

'তবু আপনিই বলতে পারেন। ওর বাবাকে দিয়ে এসব হবে না।'

'ও কি এখন সংসারী হতে চাইবে।'

'আপনি বলে দেখুন না।'

'ভাল মেয়ে পেয়েছ?'

'এখনও পাইনি। তবে খবর তো অনেকগুলো আছে। আপনি রাজী করান।'

মনোরমা মাথা নাড়লেন। অনেকদিন বাদে এই সংসারে গুরুত্ব পাওয়ায় তাঁর ভাল লাগল।

জল খাবার খেয়ে জামাকাপড় পরে তৈরী হতেই বাবাকে দেখল প্রবর। বাবা তার ঘরে এসে বলল, 'মায়ের কাছে কিছু শুনেছ?'

'হ্যাঁ।'

'আমার শরীর ভাল নেই, তোমার ঠাকুমার অবস্থা তো জানোই। আমার মনে হয় এখন তোমার এই বাড়িতেই থাকা দরকার। ওখানে নোটিস দিয়ে দাও যাতে সামনের মাস থেকে এখানে প্র্যাকটিস শুরু করতে পার। আহা, ঝুঁকি তো থাকবেই। আজকের সমস্ত সফল ডাক্তারই প্রথম দিকে ঝুঁকি নিয়েছেন। একটা সুবিধে হল এই তল্লাটে ভাল ডাক্তার একজনও নেই।' প্রবাল বলল।

'আমি যে ভাল তা মানুষ মনে নাও করতে পারে।'

'এমন একজন ডাক্তার দেখাতে পার যার সম্পর্কে কোন মানুষের কমপ্লেন নেই? দু-একজনকে নিয়ে কেউ ভাবে না, বেশীর ভাগ মানুষকে ইম্প্রেস করার দায়িত্ব তোমার। ছাত্র হিসেবে যখন খারাপ ছিলে না তখন নিজের ওপর আস্থা নেই কেন?' বাবা বেরিয়ে গেল। আজকাল ছেলের সঙ্গে কথা বলতে গেলে কিছুক্ষণ বাদেই বিষয় খুঁজে পাওয়া যায় না। ইচ্ছে না থাকলেও নিজেকে গম্ভীর করে রাখতে হয় সেই কারণে।

বাইরে বেরুবার আগে প্রবর মনোরমার ঘরে এল, 'কেনম আছ?'

'আর আছি। আমার কথা মনে পড়ল তাহলে?' মনোরমা অভিমান করলেন।

জবাব না দিয়ে প্রবর জিজ্ঞাসা করল, 'ওষুধপত্র ঠিকঠাক খাচ্ছ?'

'তুই এখানে বস।' মনোরমা বিছানা দেখালেন। প্রবর বসল। একটু তাকিয়ে থেকে মনোরমা বললেন, 'তুই তো ডাক্তার। বলতো, কবে প্রাণ বেরুবে?'

'সেটা জ্যোতিষীরা বলতে পারবে।' হাসল প্রবর।'

'ছাই পারবে। আমার ঠিকুজিতে ছিল তোর ঠাকুর্দা পরে মারা যাবে। আর ভাল লাগছে না রে ভাই। এভাবে বেঁচে থাকা যায় বল? চার দেওয়ালের বাইরে কিছুই দেখতে পারি না। কেউ ঘরে না এলে কথাও বলা যায় না।'

'কেন? মা বাবা তো আছেন।'

'তোর বাবা? কাজকর্ম করে সে যখন বাড়ি ফেরে একবার আসে, যাওয়ার আগে একটু দাঁড়িয়ে দেখে যায়। তোর মা একা কত করবে বল। যদি এই

বাড়িতে আর একটা মেয়ে থাকত তবে তার সঙ্গে গল্প করে দিব্যি সময় কাটত।'

'আর একটা মেয়ে পাবে কোথায় ?'

'বুড়ি ঠাকুমার মুখ চেয়ে তুই রাজী হয়ে যা দেখবি ঠিক এসে যাবে।' শীর্ণ হাত বাড়িয়ে প্রবরকে স্পর্শ করলেন মনোরমা।

'শরীর তোমার খারাপ ঠিকই কিন্তু মাথা পরিষ্কার আছে।'

'মানে ?'

'ঠিক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লাইনে চলে এলে। মতলবটা কার ?'

'কার মানে ?'

'ও সব চিন্তা মাথা থেকে সরাও।'

'কেন সরাবো ? তুই সারাজীবন সন্ন্যাসী হয়ে থাকবি নাকি ?'

'সন্ন্যাসী হওয়া এত সহজ ব্যাপার নাকি ?'

'আমি কোন কথা শুনতে চাই না। মরার আগে তোর বউ-এর মুখ দেখে যেতে চাই'।

প্রবর একটু হাসল। তারপর উঠে এল। সে বুঝতে পারল এবার চাপ আরও বাড়বে। মা এবং শেষপর্যন্ত বাবাও ঠাকুমার পাশে এসে দাঁড়াবেন। পারমিতাকে বাইরে 'বেরুচ্ছি' বলে সে যখন রাস্তায় নামল তখন ঘড়িতে আটটা।

গান চলে গেছে। জীবনে প্রেমও কি চলে গেল ? একটা মানুষ এক জীবনে কবার প্রেম করতে পারে ? যাকে না দেখলে একসময় বুকের ভেতরটা খাঁ খাঁ করত সে পৃথিবী থেকে চলে গেলে তার জায়গায় আর একজনকে বসানো যায় ? সম্ভব ? প্রবর এর উত্তর জানে না। গান চলে যাওয়ার ঠিক পরেই তার যেরকম মানসিক অবস্থা ছিল এখন সেরকম নেই। তখন কোন কাজই করতে ইচ্ছে করত না। এখন তো দিব্যি সকালে ঘুম ভাঙার পরে একটার পর একটা কাজ ঠিকঠাক করে যায়। তাহলে ?

ট্যাক্সি নিল। নীলিমা এতবার ফোন করছেন কেন ? ভদ্রমহিলার সঙ্গে তার একবারই দেখা হয়েছিল। কি দরকার ওঁর ? সূর্যর সঙ্গে প্রবরের অনেকদিন দেখা হয়নি। গানের মৃত্যুর খবর পেয়ে শ্মশানে গিয়েছিল কিনা তা সে জানে না তবে অসুস্থতার সময়ে তাকে দ্যাখেনি। প্রবরের মনে হয়েছিল সূর্যের তুলনায় নীলিমা অনেক বেশী বাস্তবমনের মেয়ে। দু'জনের মধ্যে মিল হওয়াটাই অদ্ভুত ব্যাপার।

ট্যাক্সি ছেড়ে সে সিঁড়ি ভেঙ্গে নীলিমার ফ্ল্যাটের দরজায় হাজির হল। বেল টিপল তিনবার। দরজা খুলল তারপর। একটি মেইডসার্ভেন্ট গোছের মহিলা সামনে দাঁড়িয়ে, পাশে গবু। প্রবর জিজ্ঞাসা করল, 'নীলিমা নেই ?'

'এখনও ফেরেননি।'

হঠাৎ গবু বলে উঠল, 'তুমি সেই মামা, না ?'

মামা ! প্রবর তার দিকে তাকিয়ে হাসল, 'আমাকে মনে আছে তোমার ? বাঃ। গুড। আচ্ছা, নীলিমা এলে বলবেন প্রবর এসেছিল।'

'অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু আপনাকে ভেতরে যেতে হবে।' পেছন থেকে

কথাগুলো ভেসে আসতেই চমকে তাকাল প্রবর। নীলিমা সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে হাসছে। এই মুহূর্তে তাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

প্রবরের পাশ কাটিয়ে গবু তীরের মত ছুটে গেল, 'মা এসেছে, মা এসেছে?

তাকে জড়িয়ে ধরে দরজার দিকে এগিয়ে এল নীলিমা, 'কি হল? চলুন।'

ঘরে ঢুকে নীলিমাকে মিনিটখানেক ছেলের সঙ্গে কথা বলতে হল। তারপর তাকে শান্ত করে বলল, 'শেষপর্যন্ত দেখা দিলেন।'

'আমি তো এখানে থাকি না।'

'শুনেছি। কিন্তু বাড়িতেও ঠিকানা দিয়ে যাননি?'

'দিয়েছি। মা মনে রাখতে পারে না।'

'নাকি অচেনা মহিলা বলে দিতে চাননি!'

'তাও হতে পারে।' প্রবর হাসল।

'আপনি একটু বসুন। আমি চেঞ্জ করে আসি।' নীলিমা চলে গেল।

গবু এল, 'টি ভি দেখবে?'

'তুমি যদি চাও দেখতে পারি।'

সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে ঘরের কোণে রাখা টিভি সেটের বোতাম টিপল গবু। প্রবর লক্ষ্য করছিল ছেলেটার মধ্যে একটু অস্বাভাবিকতা আছে। হাঁটা চলা তাকানোয় একটু যেন গোলমাল। খবর হচ্ছে। পাঞ্জাবে আজও দশজন খুন হয়েছে। একটা বাস উড়িয়ে দিয়েছে উগ্রপন্থীরা। সেই ভাঙ্গাচোরা বাস আর কিছু মৃতদের ছবি টিভি দেখাচ্ছিল। যেন ভয় পেয়েই কাছে সরে এল গবু। অদ্ভুত গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা মামা, মানুষ কেন মরে যায়?'

'বেঁচে থাকার সময় শেষ হয়ে যায়, তাই।'

'তাই ওরা মরে গেছে?'

'ওদের বেলায়—!' প্রবর জবাবটা শিশুর কাছে কিরকম দেওয়া উচিত ভাবল, 'কিছু মানুষ অন্যায় করে ওদের মেরেছে।'

'পুলিশ কিছু বলছে না কেন?'

'বলবে। পুলিশ ওদের খুঁজে বেড়াচ্ছে।'

'আমিও খুঁজব।'

'বড় হয়ে খুঁজো। কেমন?' হঠাৎ প্রবর আবিষ্কার করল গবুর সঙ্গে গল্প করতে তার বেশ ভাল লাগছে। ওর সঙ্গে যে কোন কথা বলার আগে নিজেকে যে বদলাতে হচ্ছে তাতেই ভাল লাগাটা তৈরী হচ্ছে। গান চলে যাওয়ার পর এমন প্রশান্তি তার আসেনি।

'আঙ্কলের সঙ্গে কি বকবক করছ?' নীলিমার গলা পাওয়া গেল।

'আমি মামা বলেছি।'

'যাচ্চলে। তাহলে তো আমিই বোকা হয়ে গেলাম।' নীলিমা হেসে উঠল। মিনিট পাঁচেক বাদে গবুকে ভেতরে পাঠিয়ে নীলিমা বলল, 'কি খাবেন!'

'কিস্যু না। আপনি কেন খোঁজ করছিলেন সেটাই বলুন!'

নীলিমা হাসল, 'একবার এলেন, এসে ডুব মারলেন, তাই ভাবলাম—, অন্যায় করেছি?

'একটুও নয়। সূর্য কেমন আছে?'

'আপনার সঙ্গে দেখা হয় না?'

'না। আমি তো এখন মফস্বলে থাকি।'

'ঠিকানাটা লিখে দিন তো।' উঠে গিয়ে একটা প্যাড আর কলম আনল নীলিমা, প্রবর তাতে নিজের নামধাম লিখে বলল, 'মনে হচ্ছে বেশীদিন এখানে নেই আমি।'

'কেন?'

'বাবা চাইছেন কলকাতায় প্রাকটিস শুরু করি।'

'বাঃ। ভালই তো।'

'সূর্য আসবে আজ?'

'না। সে আপনি চলে যাওয়ার পর মাত্র একদিন এসেছিল।'

'সেকি? কেন?'

'আমি জানি না। হয়তো আমাকে একঘেঁয়ে মনে হয়েছে ওর। কিংবা আমার চেয়ে আকর্ষণীয়া কাউকে পেয়ে গেছে।' নীলিমা মুখ নামাল।

'আপনারা পরস্পরকে ভালবাসতেন না?' সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করল প্রবর।

'আমি ভালবাসা শব্দটার মানে আজ পর্যন্ত বুঝলাম না।' নীলিমার চোখ উপচে জল গড়িয়ে এল। সে বলল, 'আমারই ভুল। একবার দুর্ভাগ্য যাকে ছোবল মেরেছে তার আর নতুন করে স্বপ্ন দেখা যে বোকামি এটা বুঝিনি।'

'আপনি শক্ত হন।'

'শক্তই তো আছি। দেখুন, আমি দেখতে যত সুন্দরী হই না কেন, বয়স তিরিশের নিচে থাকলেও আমার সবচেয়ে বড় ডিসকোয়ালিফিকেশন আমি বিবাহিতা এবং সন্তানের মা। বাংলাদেশে প্রেম ও বিয়ে করার জন্যে অবিবাহিতা মেয়ের তো অভাব নেই। যাকগে।' চোখ মুছল নীলিমা, 'আপনি ড্রিঙ্কস নেবেন?'

মাথা নাড়ল প্রবর, 'না। কফি আছে?'

নিশ্চয়ই। আপনি এখনও মদ খান না?'

'সুযোগ পাইনি। গ্রামে চোলাই পাওয়া যায়। সেটা ছুঁতে পারিনি।'

'আমার যে মদ না খেলে চলে না।' নীলিমা উঠে দাঁড়াল।

'আপনি খেতে পারেন। কে আপত্তি করছে?'

'সূর্যর সঙ্গে আলাপের আগে এই অভ্যেস আমার ছিল না।'

'দেখুন, যা বুঝেসুঝে করছেন তা নিয়ে আফসোস করবেন না।'

'তাহলে আপনার জন্যে কফি?' প্রশ্নের উত্তরে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলতেই নীলিমা ভেতরে চলে গেল। টিভিতে এখন সিরিয়াল শুরু হয়েছে। প্রবর সেটা বন্ধ করে দিল। নিজেকে একটু বোকা বলে মনে হচ্ছিল তার। সূর্যর সম্পর্কে ভুল বুঝেছিল। ভালবাসা দিতে এবং সেটা ফিরিয়ে নিতে সূর্যর বিন্দুমাত্র অস্বস্তি হয় না। আচ্ছা, এটাকে কি ভালবাসা বলে? খুব রাগ হচ্ছিল সূর্যর ওপরে। গান আর ওর মধ্যে কত তফাৎ!

চোখ বন্ধ করে বসেছিল প্রবর। নীলিমা টেবিলে ট্রে রাখতে চোখ খুলল। দু'কাপ কফি আর কিছু কাজু। সে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কফি খাবেন?'

'হ্যাঁ।'
'অসুবিধে হবে না ?'
'দেখি।'
কফি খেতে খেতে প্রবর জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কোথায় কাজ করেন ?'
'টেলর এন্ড টেলরে।'
'ওটা তো বিদেশী ফার্ম।'
'আগে পুরোটাই ছিল এখন আধাআধি।'
'গবুর অসুবিধে হয় না ?'
'হয়। তবে এবার যে মেয়েটিকে পেয়েছি তার স্বভাব খুব ভাল।'
একটু থেমে প্রবর জিজ্ঞাসা করল, 'আমি সূর্যর সঙ্গে কথা বলব ?'
'একদম না। যা গেছে তা নিয়ে আমি ভাবতে চাই না।'
'তার মানে ?'
'গতকাল আগামীকাল গত পরশু হয়ে যাবে। যে অতীতের স্মৃতি রক্তাক্ত তাকে আঁকড়ে ধরে থেকে কি লাভ ? এই নিয়ে চিন্তাও করতে চাই না।'
'ও হঠাৎ কেন এমন করল ?'
'জানি না। তবে আপনি সেদিন যে ভদ্রমহিলাকে দেখেছিলেন তাঁর বন্ধু হয়ে গিয়েছে এমন কথাই বলে গেল। সেই ভদ্রমহিলার নাকি কোন সংস্কার নেই, কোন দাবী নেই, শারীরিক আনন্দের চূড়ান্ত দিতে এবং নিতে জানেন।'
'ননসেন্স !' রেগে গেল প্রবর।
অনেকক্ষণ ওরা কেউ কথা বলল না। কফি শেষ হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ প্রবর বলল, 'সেদিন আপনাকে একটি মেয়ের কথা সূর্য বলেছিল। ওর বোন—।'
'গান !'
'হ্যাঁ। শরীর সম্পর্কে যার খুব বাতিক ছিল বলে ভেবেছিলাম।'
'মনে পড়ছে।'
'গান নেই।'
'সেকি ?' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল নীলিমা।
'হ্যাঁ। ক্যানসার হয়েছিল বুকে। যাকে বাতিক বলে ভেবেছিলাম সেটা যে রোগের কারণে তা বুঝলাম অনেক পরে।'
'আপনি খুব ধাক্কা খেয়েছেন। কিন্তু জীবনের সত্যিটা মেনে নেওয়াই ভাল।'
'তার মানে ?'
'পৃথিবীতে কোন মুখই দীর্ঘস্থায়ী হয় না। জিহোভার আদেশ অমান্য করে শাপের প্ররোচনায় ইভ আর আদম ফলটি খাওয়া শেষ করা মাত্র যে অভিশাপ পেয়েছিল তা আমাদের বহন করতেই হবে। আদমের ছেলে এবেলকে মেরে অন্য ছেলে কেন পালিয়ে গিয়েছিল নিরুদ্দেশে। কে জানে আমরা সেই কেনের বংশধর কিনা। অভিশাপ আমাদের ছেড়ে যাবে না কোনদিন।' খুব সিরিয়াস গলায় বলল নীলিমা। প্রবর তার দিকে তাকিয়ে আছে দেখে সে অদ্ভুত হাসল, 'এই যে ছেলেকে এত ভালবেসে বড় করছি, হয়তো এর কাছ

থেকেই চরম আঘাত পাব একদিন।'

'এতটা ভাবা ঠিক হচ্ছে না।'

হাসল নীলিমা, 'আমি এখন সব কিছুর জন্যে তৈরী।'

'কিন্তু আমাকে খোঁজ করছিলেন কেন?'

'এমনি। সত্যি কোন কারণ নেই।'

'ভাল। তাহলে আমিও কারণ ছাড়াই এখানে আসতে পারি?'

'স্বচ্ছন্দে। আপনার আর আমার মধ্যে স্বর্গের সম্পর্ক তো নেই।'

'গুড। আজ চলি।'

'কবে ফিরছেন?'

'পরশু সকালে ফিরব বলে এসেছি।'

নীলিমা তাকে সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিল। চুপচাপ নেমে এল প্রবর। ওর মনে হচ্ছিল আজকের এই সময়টা একদম আলাদাভাবে কাটল।

ফিরে যাওয়ার আগে পারমিতা একই কথা বলল প্রবরকে। তাকে জানানো হল এটা বাবারও ইচ্ছে। চুপচাপ শুনল সে। তারপর বলল, 'প্রথম কথা আমি যদি এখানে প্র্যাকটিস শুরু করি তাহলে অন্তত দু'বছর তোমাদের অপেক্ষা করা দরকার। দ্বিতীয়ত, যে মেয়েটিকে তোমরা নির্বাচন করবে তার সঙ্গে আমার মিলবেই এমন গ্যারান্টি দিতে হবে। ভবিষ্যতে কোন গোলমাল হলে তার দায়িত্ব তোমাদের।'

'আশ্চর্য! বিয়ের পর সব ব্যাপারে কারো মেলে? মানিয়ে নিতে হয়।'

'কতটা?'

'তোর মতলব কি বলত?' পারমিতা রেগে গেল, 'কি ভেবেছিস তুই? গানকে তো আমি মেনে নিয়েছিলাম। ওই অপারেশনের পরেও ওকে এ বাড়িতে আনতে চেয়েছিলাম। ঠিক আছে, তোর যদি অন্য কোন মেয়েকে পছন্দ থাকে, তো বল!'

'পছন্দ করার জন্যে সময় দরকার হয় মা।'

'কত সময় চাস? ওই দুই বছর? বেশ তাই বলব তোর বাবাকে।'

ভালভাবে বেঁচে থাকার জন্যে পর্যাপ্ত টাকা দরকার। প্রবর তার কোয়ার্টার্সের তক্তাপোষে শুয়ে ভাবছিল। গ্রামে পড়ে থাকলে শুধু বেঁচে থাকাই সম্ভব, তার বেশী কিছু হবে না। পৃথিবীতে মানুষ বাঁচে একটা বিশেষ সময়ের জন্যে। খুব কম মানুষই একশ'র সীমা পার হয় আর এই সময়টাও বেশী নয়। মরে যাওয়ার পর কি হবে সেটা কেউ জানে না যখন তখন তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। বেঁচে থাকাটাই যাতে একটু আনন্দজনক হয় তার চেষ্টা করা উচিত। আর এই জন্যেই অর্থের প্রয়োজন। যে সব মানুষেরা বলেন যে ব্যক্তিগত সুখের সন্ধান না করে জনসাধারণের সুখের চেষ্টায় নিয়োজিত হলেই বৃহত্তর সুখের সন্ধান পাওয়া যায় তাঁরা নিশ্চয়ই ভুল বলেন না, কিন্তু সেই সঙ্গে যে দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে হয় এটাও অনুচ্চারিত রাখেন। চিত্তরঞ্জন দাস বা বিধানচন্দ্র রায় যেমন ব্যক্তিগত সম্পদ সঞ্চয় করে আরামে ছিলেন তেমনি সেই সম্পদ দান করে মানুষের উপকারও করে গেছেন। অর্থাৎ

তাঁরা সন্ন্যাসী না হয়েও একটি মধ্যপথ অবলম্বন করেছিলেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে মা-বাবার প্রস্তাব অনেক বেশী আকর্ষণীয়। গ্রামে বসে শুধু সালফাগুয়াভিন আর ক্রোসিন নিয়ে গরীব মানুষের উপকার খুব বেশী করা যায় না। একসময় হতাশা আসেই যা তার ইতিমধ্যেই এসে গিয়েছে। প্রবর তার পদত্যাগপত্র লিখে ফেলল।

এই গ্রামের যেসব মানুষ নিয়মিত অসুখে ভোগেন তাঁদের সে চেনে। কার কি অসুখ এবং কেন সেটা সারছে না তাও তার জানা। এদের মধ্যে ক'জনের মৃত্যু খুব বেশী দেরিতে নয় তা সে বলে দিতে পারে। মাঝে মাঝে নিজেকে নিধিরাম সর্দার বলে মনে হয় তার। ঈশ্বর যা করতে চলেছেন তা সে জেনেও ঠুঁটো হয়ে বসে আছে। ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে লড়াই করার কোন ক্ষমতা তার নেই। সেদিন নীলিমা জিহোভার কথা বলেছিল। বাইবেলে এই ভদ্রলোকের বিরাট ভূমিকা। যখন কোন ধর্মপ্রাণ মানুষ বিপদে পড়েছেন জিহোভা স্বর্গ থেকে নেমে এসে তাঁকে উদ্ধার করেছেন। এখন সেইরকম কোন জিহোভার অস্তিত্ব নেই। এই সব ভাবনা প্রবরকে অনেকখানি বাস্তবে ফিরে আসতে সাহায্য করল। সে পারমিতাকে লিখে দিল যে চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়েছে।

প্রথম তিন মাস প্রায় মাছি তাড়াতে হল প্রবরকে। সকাল বিকেল চেম্বারে বসেও রুগীর মুখ দেখতে পেল না তেমন। যে ক'জন এসেছেন তাদের কাছ থেকে পাওয়া টাকায় ঘরভাড়াই দেওয়া যায় না। পাড়ার মানুষ এই নবীন ডাক্তারকে বিশ্বাস করতে ভরসা পাচ্ছিল না। কিন্তু ছোটখাটো একটা ঘটনা হঠাৎই ঘটে যায় এবং তার কথা মুখে মুখে ছড়ায়। তেমনই একটা ঘটনা থেকে প্রবরের খ্যাতি ছড়াল। মাথা পিছু কুড়ি টাকা নিয়েও দিনে চারশো টাকা খুব সহজে আয় করতে পারছে সে। চারশো টাকা আয় অথচ খরচ তেমন নেই। দুপুর ছাড়া দিন রাতের অনেকটা সময় চেম্বারেই কাটে তার। একমাত্র রবিবার সন্ধ্যায় সে চেম্বার বন্ধ রাখে। এবং এই সময়টায় নীলিমার বাড়িতে একটা চমৎকার আড্ডা হয়। ছ'দিনের টানা পরিশ্রমের পর এই আড্ডা অনেকখানি তাজা করে তোলে তাকে।

বন্ধু শব্দটি এদেশে খুবই সীমিতভাবে ব্যবহার করা হয়। আমাদের মনের গঠন এমনভাবে দীর্ঘ অভ্যেসে তৈরী যে সমলিঙ্গের বাইরে বন্ধুত্বের কথা চট করে মনেই আসে না। একটি নারীর সঙ্গে পুরুষের বন্ধুত্ব মানে প্রেম এবং সেই প্রেমের বয়স দীর্ঘস্থায়ী হওয়া মানে অবশ্যই শারীরিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে যাওয়া—এমন ধারণাই চালু আছে এবং প্রবর তার থেকে খুব দূরে ছিল না। কিন্তু নীলিমার সঙ্গে মেশার পর তারও ধারণা পাল্টালো। একটি শরীরের সঙ্গে ভাল বন্ধুত্ব হলে অনেক মানসিক জোর পাওয়া যায় সেটা তার জানা ছিল না।

রবিবার সন্ধ্যায় চা খেতে খেতে নীলিমা হঠাৎই জিজ্ঞাসা করল, 'বিয়ে করছ কবে ?'

চমকে উঠল প্রবর, 'কাকে ?'

'সেটা তুমি বলতে পারবে।'

'পারলে তো আগেই জানতে পারতে।'

'মা কোন মেয়ে দ্যাখেননি ?'

'জানি না। বিয়ের জন্যে বলে বলে এখন বলা বন্ধ করেছে।'

'নিজের যখন তেমন কাউকে পছন্দ নেই তখন মায়ের ওপর নির্ভর করা ভাল।'

'কেন ? তুমি একটি পাত্রী নির্বাচন করে দাও।'

হেসে ফেলল নীলিমা, 'আমি তো তেমন কাউকে চিনি না। অফিসে যাদের দেখি তাদের সঙ্গে তোমার বনবে না। যাঁরা তোমার বউ-এর সঙ্গে সংসার করবেন তাঁদের ওপর এ ব্যাপারে ভরসা করা ভাল।'

'অর্থাৎ আমার নিজের কোন পছন্দ অপছন্দ থাকতে পারে না ?'

'সেই সুযোগ তো প্রথমেই দেওয়া হয়েছে। আছে নাকি কেউ।'

'নাঃ।' প্রবর হাসল।

'হাসছ যে ?'

তোমার কাছে প্রতি রবিবার আসি বলে মা আমাদের সম্পর্ক জানতে চেয়েছিল। বন্ধু বললাম কিন্তু মুখ দেখে মনে হল মেনে নিতে পারলেন না। তুমি বরং একদিন আমাদের বাড়িতে চল, মায়ের সঙ্গে আলাপ করবে।'

'যেতে পারি কিন্তু তিনি সহজভাবে আমাকে নিতে পারবেন না। শোন, বিয়ের কিছুদিন বাদে তুমি আমার কথা তোমার বউকে বলবে। যদি তাঁর আপত্তি থাকে আমার সঙ্গে মিশতে তাহলে তৎক্ষণাৎ এই সম্পর্ক ত্যাগ করবে।'

'চমৎকার। আমি কি পুতুল ?'

'দ্যাখো, সংসারে থাকতে গেলে এসব মানতেই হয়।'

'আমি তো কোন অন্যায় করছি না।'

'তুমি কি করছ তা বিচার করবে অন্যজন।'

'বাজে কথা। আজ তোমার মুড ভাল নেই।'

নীলিমা হাসল। প্রবরের মনে হল হাসিটা স্বাভাবিক নয়। নিজেকে সে অনেকবার প্রশ্ন করেছে নীলিমাকে ভালবাসে কিনা ? সসন্তান নীলিমাকে বিয়ে করতে সে পারবে কিনা ? কিন্তু কখনই জবাব পায়নি। আসলে জবাব তৈরী হবার মত কোন পরিস্থিতি তৈরী হয়নি কখনও। নীলিমা তার শুধুই বন্ধু। মাঝে মাঝে এও মনে হয় যদি সে নীলিমাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয় তাহলে সবচেয়ে অবাক হবে নীলিমা নিজেই। হয়তো অপমানিত বোধ করতে পারে। প্রবর আর একটি সুযোগ-সন্ধানী পুরুষ হয়ে উঠবে তার চোখে। সম্পর্ক সহজ বলেই ওরা এখনও সূর্যর কথা আলোচনা করতে পারে। গানের কথা উঠলে স্মৃতি খুঁড়তে অসুবিধা হয় না। অথবা নীলিমার কেউ ওর সম্পর্কে আগ্রহ দেখালে সেটা প্রবরকে জানিয়ে হাসাহাসি করতে তার দ্বিধা হয় না। প্রবর এ ব্যাপারে উসকালে সে চোখ বড় করে বলে, 'আবার ? ন্যাড়া দুবারের বেশী বেলতলায় যায় ?'

'দুবার মানে ?'

'একবার লোভে, দ্বিতীয়বার মরীয়া হয়ে পড়ে থাকা বেল কুড়িয়ে আনতে। হেসে ওঠে নীলিমা, 'পুরুষ জাতটাকেই তো চেনা হয়ে গেল।'

'তোমার সামনে তো একজন পুরুষ বসে আছে।'
'তুমি তো আমার শরীর চাও না, চাও ?'
'জবাব দিতে পারেনি প্রবর। জবাব না দেওয়ায় সম্পর্ক সহজতর হয়েছে।

পারমিতার নির্বাচন মেনে নিল প্রবর। এখন তার যা আয় তাতে সংসার চালাতে কোন অসুবিধে হবার সুযোগই নেই। রীতিমত ধুমধাম করে ছেলের বিয়ে দিল পারমিতা। মেয়েটার নাম সোহিনী। চেহারাটি বড় সুন্দর, কথাবার্তাও। এই বিয়েতে নীলিমাও এসেছিল গবুকে নিয়ে। নতুন বউকে যে শাড়িটি দিয়ে গেছে তার মূল্য অন্তত পনেরশ। এ নিয়ে অনেকেই বিস্মিত হয়েছিল। প্রবরের মনে হয়েছিল এত দামী শাড়ি না দিলেই পারত নীলিমা।

সোহিনীর সঙ্গে একটা সমঝোতা তৈরী হল কারণ সোহিনী এই বাড়ির বউ হতেই এসেছে। একটি শিক্ষিতা মেয়ের সবরকম গুণ নিয়ে সে প্রবরকে বুঝতে চেয়েছে। দুপুর দুটো থেকে পাঁচটা এবং রাত এগারটার পর যে মানুষটাকে ঘরে পাওয়া যায় তার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক আচমকা তৈরী হয় না। কিন্তু সমঝোতা হয় স্বাভাবিক নিয়মেই। যেহেতু সোহিনী সুন্দরী তাই তার একটা আকর্ষণ ছিলই। কিন্তু সেতু তৈরী হতে কয়েকটা দিন সময় খরচ করল প্রবর। তারপর যেদিন সে সংযম হারালো সেদিন থেকে এটাই একটা অভ্যেসে রূপান্তরিত হয়ে গেল।

নীলিমার সঙ্গে যোগাযোগ ক্ষীণ হল। গান এবং নীলিমার কথা প্রবর সোহিনীকে বলেছে। চুপচাপ শুনেছে সোহিনী। প্রবর বলেছে, 'তোমার নিজের জীবনে যদি তেমন ঘটনা কিছু ঘটে থাকে আমায় বলতে পার।'

মোহিনী শান্ত গলায় বলেছিল, 'সময় পাইনি।'

'অ। নীলিমা আমার শুধুই বন্ধু। তুমি কি চাও না ওর সঙ্গে যোগাযোগ রাখি ?'

'আমাকে অত বোকা ভাবার কি কোন কারণ খুঁজে পেয়েছ ?' মোহিনী ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিল।

নবমী

ধর্মতলা স্ট্রীটের চেম্বারে বসে শেষ পেসেন্টকে দেখল প্রবর রাত দশটায়। এই চেম্বারটির ভাড়া মাত্র পাঁচশো কিন্তু চারবছর আগে নেওয়ার সময় দুলক্ষ টাকা গুঁজে দিতে হয়েছিল। পাড়ার চেম্বারটি ছেড়ে দিয়েছে সে অনেককাল। সকালগুলো কেটে যায় হাউজ কলে। বিকেল তিনটে থেকে এই চেম্বারে। কলকাতা শহরে তার খ্যাতি ছড়িয়েছে চিকিৎসক হিসেবে। ফলে আশি টাকা দক্ষিণা নিয়ে সে প্রত্যহ পঁচিশজনকে চেম্বারে দ্যাখে। দৈনিক আয় সকাল বিকেল মিলিয়ে আড়াই হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছে। এত টাকা ইনকামট্যাক্সে দেখানো যায় না। অনেক চিকিৎসকের মত প্রবরও কারচুপি করে। পুরোন বাড়ি ছেড়ে সল্টলেকে সে বিশাল বাড়ি করেছে। ইদানীং তার শরীরও বেশ ভারি হয়েছে রাত সাড়ে দশটায় বাড়ি ফিরে তিনপেগ হুইস্কি না খেলে

কিছুতেই ঘুম আসে না।

মনোরমা চলে গেছে অনেকদিন। বাবা মারা গেছেন ছেলের সাফল্য দেখে। পারমিতা এখনও আছে, কিন্তু তার মত আছে। সোহিনীর হাতে সংসারের হাল দুই ছেলে সেন্ট জেভিয়ার্সে। একজন এবার ফাইন্যাল দিয়ে জয়েন্টে বসেছে সুখের সংসার এখন প্রবরের। কোথাও কোন অভাব নেই। মেদ কমাতে ভোর পাঁচটায় যে রোজ হাঁটতে বের হয় সুগারটা বেশ সমস্যা তৈরী করছে, এই যা।

রাত দশটায় শেষ পেসেন্ট দেখে কর্মচারীদের চেম্বার বন্ধ করতে বলে সে গাড়িতে উঠে বসল। সবাই বেরিয়ে যাওয়ার পর দরজায় তালা ঝুলিয়ে কর্মচারিটি চাবি দিয়ে গেলে সে ইঞ্জিন চালু করে। আজ সকাল থেকেই মনে হচ্ছিল কি যেন ঠিক হচ্ছে না দিনটা কেটেছিল অস্বস্তি নিয়ে। এখন বাড়ি ফিরে দেখবে সোহিনী বই পড়ছে। তার গ্লাস বোতল টেবিলে সে যতক্ষণ পান শেষ না করবে সোহিনী বই পড়েই যাবে। তারপর খাওয়া শেষ করে ঘুম। কথা হবে দু-চারটে।

হঠাৎ পথ বদলালো প্রবর অনেকদিন নীলিমার সঙ্গে দেখা হয় না। প্রায় মাস আষ্টেক তো বটেই নীলিমা সেই ফ্ল্যাটে একাই থাকে। গবু এবার খড়গপুর থেকে পাশ করে দিল্লীতে চাকরি নিয়ে গেছে। সেই একই রকম আছে নীলিমা। একটু রোগা কিন্তু বয়স বাড়া ছাড়া চেহারা তেমন বদলায়নি। বরং প্রবরের ঝুলপি সাদা হয়েছে, পেটে চর্বি। নীলিমার বাড়িতে মদ থাকে না। লাইটহাউসের সামনে সরবতের দোকানের কাছে পৌঁছে এক বোতল কিনে নিল প্রবর।

ঘড়িতে এখন প্রায় পৌনে এগারটা। এইসময় কারো বাড়িতে যাওয়া ঠিক নয়। একটু দ্বিধা এল কিন্তু সেটাকে ঝেড়ে ফেলল প্রবর। বেল টিপল দুবার। তৃতীয়বারে কী-হোলে চোখ এল দরজা খুলল নীলিমা। পরনে শোওয়ার পোশাক। চোখে বিস্ময়। প্রবর জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন আছ?'

'হঠাৎ? কি ব্যাপার?'

'এমনি কিছু ভাল লাগছিল না। বসতে বলবে তো?'

'হ্যাঁ। বসো। সোহিনীকে জানিয়েছ তো দেরি হবে বলে?'

'নাঃ। কাউকে কিছু জানাতেই হবে আজ সেটা ভাবতে পারছি না।'

'কি হয়েছে?' দরজা বন্ধ করে এসে জিজ্ঞাসা করল নীলিমা।

'জানি না। খুব টায়ার্ড লাগছে।'

'তুমি বরং কিছুদিন বেড়িয়ে এস।'

'চাইলেই কি দুম করে যাওয়া যায়? পেশেন্টদের তারিখ দেওয়া আছে'।

'আগে নিজের মন, শরীর, তারপর অন্যসব।'

'ডাক্তারের ক্ষেত্রে নয়। যাকগে। জল দাও।'

'ভাল লাগছে না যখন তখন নাই বা খেলে।'

'প্লিজ!'

নীলিমা জল এবং গ্লাস নিয়ে এল। নিজে নিয়ে প্রবর জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি?'

নীরবে মাথা নাড়ল নীলিমা। প্রবরকে খেতে দেখল সে। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, 'প্রবর, তুমি আমাকে কি ভাবো বলতো ?'

'বন্ধু।'

'না আমরা বোধহয় আর বন্ধু নই।'

'মানে ?'

'বন্ধুত্বের সংজ্ঞা থেকে আমরা অনেক দূরে সরে গিয়েছি। এইভাবে এত রাত্রে তুমি আমার ফ্ল্যাটে এসো না। আমার খারাপ লাগছে বলতে।'

'তুমি কি আমাকে এখনই উঠে যেতে বলছ ?'

'না। আজ খাও। কিন্তু আমার বাড়িটা কারো অবসর সময়ে মদ খাওয়ার জায়গা নয়। তাছাড়া সোহিনীও এটা পছন্দ করবে না।'

'আমি তোমাকে বুঝতে পারছি না।'

'এত বড় ডাক্তার তুমি, এই ছোট্ট সত্যিটা কেন বুঝবে না ?'

প্রবর গ্লাস শেষ করল, 'তোমার জীবনে কি অন্য কেউ এসেছে ?'

হেসে ফেলল নীলিমা, 'বাঃ। এই বুদ্ধি তোমার ? আমার বয়স এখন পঞ্চাশ আগেকার দিন হলে বার্ধক্যের সময়। যৌবনে যখন কাউকে আর আসতে দিলাম না এখন মতিভ্রম হবে ভাবছ কি করে ?'

'তুমি এখনও যুবতী।'

'এরকম ভাবলে তোমার ভাল লাগে। আমার কথা তুমি কখনও ভেবেছ ? কি পেয়েছি আমি ? কোন পরিচিতি ? কোন সিকিউরিটি ?'

'সেটা আমি তোমাকে দিতে পারতাম, তুমি নিতে চাওনি।'

'তুমি কখনই দিতে পারতে না জানতাম বলেই নিতে চাইনি।'

কিন্তু আজ, আজ আমার বলতে আপত্তি নেই, জীবনে দুটো মেয়েকে আমি ভালবেসেছিলাম। একজন চলে গেছে অনেককাল আগে, আর একজন তুমি !'

'তুমি আমাকে ভাল বেসেছিলে ?' নীলিমার গলায় বিস্ময়।

'তোমার অজানা কথা বলছি নাকি ? ভালবেসেছিলাম বলে যা যা বলেছ শুনেছি এই যে, আজ তুমি নিষেধ করছ এখানে আসার জন্যে, বেশ, আসব না।' প্রবর কথা শেষ করা মাত্র নীলিমা দ্রুত চলে গেল ভেতরের ঘরে। চুপচাপ ওর যাওয়া দেখল প্রবর। তারপর গ্লাসে নতুন মদ ঢালল। তিনটে তার কোটা কিন্তু আজ পাঁচটা হয়ে গেল। এইভাবে একা শূন্য ঘরে বসে মদ খেতে খেতে সে কেমন অসার হয়ে যাচ্ছিল। কোন ভাবনা মাথায় কাজ করছিল না। খেয়াল হল হঠাৎই। ঘড়িতে এখন রাত সাড়ে বারোটা। উঠে দাঁড়াতেই পা টললো। নিচে নেমে গাড়ি চালিয়ে ফিরতে হবে। কপালের ঘাম মুছল সে। পথ অনেকটা, স্টিয়ারিং ধরলে কি মাথা আর পা কাজ করবে না ? ঠিক করবে। দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে নীলিমার কথা মনে পড়ল। আজ এই ফ্ল্যাটে তার শেষ রাত। যাওয়ার আগে নীলিমাকে বলে যাওয়া উচিত। সে আবার ফিরল। পা ঠিক তালে পড়ছে না। সে নীলিমার শোওয়ার ঘরের পর্দা সরাল, 'আমি যাচ্ছি।'

শুয়ে ছিল উপুড় হয়ে নীলিমা গলার স্বর কানে যাওয়া মাত্র সোজা হয়ে বসল, 'না এই অবস্থায় তুমি একা যেতে পার না।'

'মানে ?'

'তোমার শরীর আর বশে নেই। যদি যেতেই চাও, চল, আমি পৌঁছে দিয়ে আসছি।'

'তুমি কিভাবে যাবে ?'

'ট্যাক্সি নিয়ে। কাল এসে গাড়ি নিয়ে যাবে।'

অসম্ভব।' জড়ানো গলায় বলল প্রবর, 'এত রাত্রে তোমাকে একা ফিরতে দেব না।'

'এত রাত পর্যন্ত মদ খেতে তো পারলে ! পুরোটা শেষ করেছ ?'

'তুমি রেগে যাচ্ছে। আমার কিচ্ছু হবে না '

'বেশ, আমাকে যদি নিয়ে যেতে না চাও তাহলে বাড়িতে ফোন করো।'

'কি বলব ?'

'যা খুশী। অন্তত ওরা জানুক তুমি ঠিক আছ।'

ফোনের কাছে যাওয়ার সময় প্রবর বুঝল তার পক্ষে ভাল করে হাঁটাই সম্ভব হচ্ছে না। টেলিফোন আঁকড়ে সে নম্বর ঘোরাল রিঙ হচ্ছে। পারমিতার গলা পাওয়া গেল, হ্যালো ! হঠাৎ বালক বয়সের এক অস্বস্তি আঁকড়ে ধরল প্রবরকে। সে সাড়া দিতে পারল না। পারমিতা আবার জানান দিল এবার প্রবর বলল, 'মা, আমি আজ রাত্রে ফিরতে পারছি না। হঠাৎ জরুরী কলে বাইরে এসেছি।'

'কোথায় গিয়েছিস।' হ্যালো, হ্যালো '

'রামপুরহাট ' মাথায় অন্য নাম এল না। রিসিভার নামিয়ে রাখল সে। এভাবে মিথ্যে কথা বলার মধ্যে যে মজা আছে সেটা বুঝতে পেরে চোখ বন্ধ করল। মা বলেই বলা গেল, সোহিনী হলে ঠিক তার গলার জড়তা ধরে ফেলত প্রবর ঘুরে দাঁড়াল।

নীলিমা সামনে নেই। এই যে মিথ্যেটা সে বলল তা কি নীলিমা শুনতে পেয়েছে ? সে যদি বলত, বলতে পারত, মা আমি প্রচুর মদ খেয়ে ফেলেছি বলে নীলিমার বাড়িতে থেকে যাচ্ছি, তোমরা কিছু মনে করো না তাহলে কি মা সেটা সোহিনীকে বলে দিত ? সহ্য হত মায়ের ? সে টলতে টলতে নীলিমার ঘরের দরজায় পৌঁছে দেখল সে বিছানা করছে। চুপচাপ শোওয়ার ব্যবস্থা করে বলল, আমার কাছে তোমার রাত্রে শোওয়ার মত কোন পোশাক নেই পাশেই বাথরুম তোমার, যা অবস্থা তাতে কি রাত্রে খেতে পারবে ?'

চুপচাপ মাথা নেড়ে না বলল প্রবর।

'তাহলে শুয়ে পড়। গুডনাইট।' নীলিমা এগিয়ে এল দরজার দিকে।

প্রবর সরে দাঁড়াতেই সে বেরিয়ে গেল। শূন্য ঘরে একা দাঁড়ানো প্রবরের হঠাৎ মনে হল ঠিক এরকমটা সে চায়নি। এইভাবে একা অজানা একটা ঘরে রাত কাটাতে কিছুতেই ভাল লাগবে না। সে একটু এগিয়ে খাটে বসল। একটা গোটা রাত সে এঘরে ঘুমাবে এবং আগামীকাল যখন বেরুবে তখন নিশ্চয়ই নীলিমা তাকে অন্য কথা শোনাবে। নীলিমা যে তাকে এই ফ্ল্যাটে থাকতে দিয়েছে নেহাৎই করুণা করে নইলে ও এখানে এখন থাকত, গল্প করত। নীলিমা তার বন্ধু, এই বন্ধুত্বের সম্মান সে রেখে এসেছে এতকাল।

কিন্তু আজ নীলিমা তাকে ভয় পেল বলেই এই ঘর থেকে চলে গেল। চিন্তাটা ওই অবস্থায় মাথায় ঢুকে যাওয়ায় একেবারে এঁটুলির মত চেপে ধরল। কিছুক্ষণ ছটফট করে প্রবর উঠল। নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করল। তারপর ধীরে ধীরে বাইরের ঘরে এসে দাঁড়াল বাইরের ঘরের আলো যাওয়ার সময় নিভিয়ে দিয়ে গিয়েছে নীলিমা। সে ওপাশের দরজার দিকে তাকাল। পর্দা ঝুলছে, আলো জ্বলছে না।

নিঃশব্দে বাইরে বেরুবার দরজায় চলে এল প্রবর। অনেকটা সময় নিয়ে সে দরজা খুলল সামান্য শব্দ হল। কিন্তু সেটা শোনার মত মানসিক অবস্থা ছিল না তার। বাইরে পা দিয়ে বুঝল দরজাটা চেপে বন্ধ করতে গেলে আওয়াজ হবে। কিন্তু ওটাকে খোলা রেখে চলে যাওয়া যায় না। প্রবর ইতস্তত করছিল এমন সময় দরজায় নীলিমাকে দেখা গেল, পেছনে অন্ধকার, কোথায় যাচ্ছ ?'

'আমার চলে যাওয়া উচিত ' প্রবর বিড়বিড় করল

'না বলে চোরের মত পালাচ্ছ কেন ?'

প্রবর চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। নীলিমা আবার জিজ্ঞাসা করল, 'নিজের ওপর বিশ্বাস আছে যে ফিরে যেতে পারবে ?'

'চেষ্টা করব।'

'মাকে গিয়ে কি বলবে ? মাতাল হয়ে রামপুরহাট থেকে ফিরে এলে ?'

প্রবর এই কথাটা ভাবেনি। সে নিঃশব্দে নীলিমার পাশ দিয়ে ঘরে ফিরে এল। দরজা বন্ধ করল নীলিমা। তারপর বলল, 'এত টাচি কেন তুমি ? ভাবলে আমি তোমাকে অবহেলা করছি ? আশ্চর্য মানুষ !'

'আমি কিছুই ভাবিনি ' চোখ বন্ধ করল প্রবর। তার শরীর ভাল লাগছিল না

'চল, শোবে।' নীলিমা ওর হাত ধরল।

বাধ্য ছেলের মত প্রবর চলে এল নীলিমার সঙ্গে। খাটে শুইয়ে দিয়ে নীলিমা তার জুতো খুলে দিল। জামার বোতাম বিচ্ছিন্ন করল তারপর আলো নিভিয়ে বলল, 'আমি তোমার পাশে বসে আছি। তুমি ঘুমাও।'

শরীর বিছানায় টানটান হওয়া মাত্র অদ্ভুত এক আরামবোধ প্রবরকে জড়িয়ে ধরল। সে নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'নীলিমা, আমার ভাল লাগে না, কিছুই ভাল লাগে না '

নীলিমা সযত্নে ওর চুলে হাত বোলাল, 'ঘুমিয়ে পড়লে, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

ভোর পাঁচটায় ঘুম ভেঙে গেল প্রবরের। চোখ মেলে দেখল ঘরে হালকা নীল আলো জ্বলছে। ঝটফট উঠে বসে বুঝল মাথাটা ঈষৎ ভারি, কিন্তু শরীর ঠিক হয়ে গেছে ? নীলিমা এই ঘরে নেই সে বাথরুমে ঢুকল। আয়নায় নিজেকে দেখতে দেখতে মনে পড়ল গতরাত্রের কথা। মাকে মিথ্যে বলেছে সে। এখানে এই ভাবে রাত কাটানোর কোন পরিকল্পনা ছিল না, কোন কুকাজ সে করেনি। তারপরেই মনে হল নীলিমার সঙ্গে যদি সে ঘনিষ্ঠ হত তাহলে কি সেটাকে কুকাজ বলা হত ? কেন ? নীলিমার কাছে এলে তার শান্তি লাগে সে ওর বন্ধু। তাহলে ? প্রবর হাসল। অনেকেই বলে তার হাসির সঙ্গে পারমিতার হাসির মিল আছে। অবশ্য বলে না, বলত। বয়স বাড়ার সঙ্গে

সঙ্গে অনেক কথা বলা বন্ধ হয়ে যায়।

হাসিটি দেখামাত্র আবার পারমিতার কথা মনে পড়ল প্রবরের। আজ পর্যন্ত সে কখনও মাকে মিথ্যে কথা মুখের ওপর বলেনি। যেটা বলতে চায়নি এড়িয়ে গেছে। এখন একধরনের অস্বস্তি তৈরী হল। এমন কি বিয়ের কিছুকাল বাদে মা যখন জিজ্ঞাসা করেছিল, বউমার সঙ্গে তোর সম্পর্কটা কিরকম রে ? কেমন ছাড়া ছাড়া মনে হচ্ছে !' তখনও সে হেসেছিল, জবাব দেয়নি। প্রবরের মনে হল তার এখনই রামপুরহাটে যাওয়া উচিত। তাহলে পুরো মিথ্যে থাকবে না গতরাতের কথাটা। রামপুরহাটে পা দিয়েই সে ফিরে আসবে কিন্তু একটিবার যেতেই হবে। পরিষ্কার হয়ে সে ফিরে এল ঘরে। তারপর নীলিমার দরজায় গিয়ে দাঁড়াল এখন বিছানা ছাড়ার সময় নয়। ঘুমন্ত কোন মহিলার সামনে যাওয়া কি ঠিক হবে ? ইতস্তত করে সে ভেতরে ঢুকল। সম্ভবত গবুর বিছানা এটা। সেখানে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে নীলিমা। কি মনে হতে সে আবার ফিরে এল। জীবনে কোনদিন যে কাজটা করেনি আজ তাই করল। রান্নাঘরে ঢুকে গ্যাস জ্বালিয়ে জল গরম করে চা বানাল বেশ মজা লাগছিল তার। দুকাপ চা বানিয়ে সে যখন নীলিমার কাছে ফিরে এল তখনই তার ঘুম ভাঙ্গেনি প্রবর নরম গলায় ডাবল, 'খুকুমণি, এবার চোখ মেলুন। এই যে খুকুমণি !'

নীলিমা চোখ মেলল প্রবরকে সামনে দেখেই ধড়মড়িয়ে উঠে বসল এবার তার সমস্ত মুখে বিস্ময়, 'কি আশ্চর্য !'

'নাও, চা খাও। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম চা আজ এই রান্নাঘরে বানানো হল। অবশ্য মুখে দিয়ে কুৎসিত লাগলে স্বচ্ছন্দে ফেলে দিতে পার কারণ জীবনে প্রথমবার চেষ্টাটা করলাম।'

নীলিমা হেসে ফেলল। চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বলল, 'আমারও প্রথমবার। কাজের লোক ছাড়া কেউ ভোরবেলায় ঘুম থেকে তুলে চা করে খাওয়ায়নি আমাকে। কুৎসিত লাগলেও তাই অমৃত মনে করে খাব ' সে চুমুক দিল তারপর মাথা নাড়ল, 'নাঃ। চায়ের মত হয়েছে।'

চা খাওয়া হয়ে গেলে নীলিমা বলল, 'এবার বাড়িতে যাও।'

'বাড়ি মানে ? তুমি আমাকে মিথ্যেবাদী বানাতে চাও নাকি ? মাকে বলেছি আমি রামপুরহাটে গিয়েছি। কথাটাকে সত্যি করতে একবার সেখানে গিয়ে ফিরে আসা তুমি যাবে আমার সঙ্গে ? একদিনের আউটিং ?' প্রবর জানতে চাইল

'অসম্ভব। অফিসে আজ জরুরী কাজ আছে।'

কি রকম জরুরী ? আমার পেশেন্ট দেখার চেয়েও ?'

'নাঃ। তুমিই ঘুরে এসো '

'আপত্তিটা কিসের ?

'তুমি বিখ্যাত ডাক্তার। কেউ না কেউ আমাকে তোমার সঙ্গে দেখবে। তখন জবাবদিহি কে দেবে ? পরিচিত ? পেশেন্ট ?'

'যা সত্যি, তাই বলতে পারি। আমরা বন্ধু।'

নীলিমা হাসল, 'এদেশে বয়স্ক পুরুষের মহিলা বন্ধুকে মেনে নেবার অভ্যেস

এখনও তৈরী হয়নি। তার ওপর তাকে নিয়ে আউটিং ? টি টি পড়ে যাবে।'

'অদ্ভুত কথা। তোমার সঙ্গে আমার স্পষ্ট সম্পর্ক ? শারীরিক সম্পর্ক দূরে থাক, আজ পর্যন্ত চুমুও খাইনি তোমাকে। বদনামের ভয় কেন করব ? কাল সারারাত একই ফ্ল্যাটে ছিলাম আমরা। তোমার কোন অসুবিধে করেছি ?'

'লোকে বিশ্বাস করবে না। তোমার প্রফেসনের ক্ষতি হবে'

'আমি বিশ্বাস করি না। যতক্ষণ কোন অন্যায় না করছি ততক্ষণ বিশ্বাস করব না। অবশ্য তোমার যদি ক্ষতি হয় তাহলে আলাদা কথা।'

'আমার ? আমার তো কোন পিছুটান নেই ছেলে সাবালক। সে তার মত জীবনযাপন করছে। কাল রাত্রে তুমি যাকে অসুবিধে বলছ তা যদি করতে তাহলেও সত্যি সত্যি অসুবিধে হত কিনা তা আমি নিজেই বলতে পারি না। মেয়েরা বন্ধুর ব্যাপারটা ভাল বোঝে না। বোঝে না বলেই অন্যের ব্যাপারটা সন্দেহের চোখে দ্যাখে।'

'আমি এসব বুঝছি না। আধঘন্টার মধ্যে বের হব। তুমি যাবে ?'

'যেতে পারি একটা শর্তে।'

'বলে ফেল।'

'বাড়িতে ফিরে বলবে আমি তোমার সঙ্গে গিয়েছিলাম।'

'তুমি সঙ্গে ছিলে সেটা বলতে আমার কোন অসুবিধে নেই।'

'তাহলে তো উঠতেই হয়।' বিছানা থেকে নামল নীলিমা।

সাদা শাড়ি সাদা জামায় নীলিমাকে চমৎকার দেখাচ্ছিল। প্রবরের মনে হল এই সকালে সে যদি পাজামা-পাঞ্জাবি পরতে পারত তাহলে ভাল লাগত। কালকের পোশাকই তাকে অঙ্গে চাপাতে হয়েছে। সার্টের নিচে গেঞ্জিটা নেই, এই যা। নীলিমার বাড়ির আবর্জনার বালতিতে ফেলে দিয়েছে সেটাকে।

গাড়ি চালাতে চালাতে তার মনে হল কথাটা। জীবনের অনেক কিছু এমনি এমনি জমে যায় যা শুধুই ক্লান্তি তৈরি করে। এইভাবে সেইসব আবর্জনা যদি ফেলে দেওয়া যেত ! একটাই জীবন, এখন তার প্রায়-বিকেলে চলে এসে মনে হচ্ছে, তাতে কত ভুল ছড়ানো। সেইসব ভুলগুলো সংশোধন করার জন্যে যদি সুযোগ পাওয়া যেত। ভিডিও টেপ যেমন ইচ্ছে হলেই পেছনে ঘোরানো যায় তেমনি কোন উপায় থাকত ?

'তোমার গাড়িতে তেল ভরা আছে তো ?' নীলিমা মনে করাল।

তৎক্ষণাৎ বাস্তবে ফিরে এল সে। না, নেই। কাঁটা বলছে আর মাত্র কুড়ি কিলোমিটার চাকা ঘুরবে। পাম্পে গাড়ি ঢোকাল। ট্যাঙ্ক ভর্তি করে নিল তেলে। আবার ইঞ্জিন চালু করে প্রবর বলল, 'একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম। তেলের কথা মনে করিয়ে দিয়ে ভাল করেছ।' সে ঘড়ি দেখল।

'কতক্ষণ লাগবে ?'

'নো আইডিয়া। ঘন্টা পাঁচেকের মধ্যে পৌঁছানো উচিত।' গাড়ির গতি সত্তরে তুলেই নামিয়ে নিল প্রবর। সামনে একটা ম্যাটাডোর কিছুতেই জায়গা ছাড়ছে না।

'তাহলে তো পৌঁছেই ফিরে এলে আজ রাত্রে কলকাতায় পা দেবে।'

'তাইতো কথা হয়েছে। খুব খারাপ লাগছে ?'

'না। অনেকদিন বাদে বের হলাম। শেষ কবে এরকম গাড়িতে চেপে কলকাতার বাইরে গিয়েছি মনেই পড়ছে না। সেই বিয়ের পরপর—।' নীলিমা থেমে গেল।

'বিয়ের পরে খুব বেড়াতে তোমরা ?'

'প্রথম প্রথম। এখন ভুলে গেছি। এই, ওভারটেক করো না।'

'কোন কোন রাস্তায় ওভারটেক না করলে লক্ষ্যে পৌঁছতে অনেক দেরি হয়ে যায়।'

নীলিমা তাকাল, কিছু বলল না। প্রবর বলল, 'সোহিনীকে নিয়ে আমি আগে প্রতি বছর দিন দশেকের জন্যে বের হতাম। ট্রেনেই যেতাম।'

'দার্জিলিং, সিমলা, কুলু মানালি ?'

'ঠিক।'

'প্রথমে থ্রি-টিয়ারে পরে ফার্স্ট ক্লাসে ?'

'ঠিকই। তারও পরে এ সি-তে।'

'প্রথম সন্তানের পরেও যাওয়াটা চালু ছিল, দ্বিতীয়টি আসার পর সময় হয় না ?'

'মিলছে। বাঙালিদের চরিত্র এইরকমই।'

'আর একটু আছে। পুরি দিয়ে শুরু, বেনারস, হরিদ্বার পরে যোগ হয়। বেড়ানোর সঙ্গে তীর্থ করা। টু ইন ওয়ান। তারপর একসময় বলল, আঠাশ বছর আগে হরিদ্বারে পাঁচ টাকায় এক কিলো খাঁটি ক্ষীর খেয়েছি হে।' নীলিমা হেসে উঠল।

'জাবর কাটা জাত বলছ ?'

'একশবার। তবু সেটা এক দিক দিয়ে ভাল। মাঝে মাঝে তোমার কি মনে হয় আমরা কেন বেঁচে আছি ? সকালে ঘুম থেকে উঠে রাত্রে ঘুমাতে যাওয়া পর্যন্ত আজ যা যা করছি কাল তাই করেছি, আগামীকালও সেটাই করব। কোন বৈচিত্র্য নেই, নিজের উন্নতি দেখার ইচ্ছে নেই।'

'সেটা কিভাবে সম্ভব ?'

'পথ খুঁজতে হবে। জীবনযাপনের একটা মানে বের করতে হবে। সাধারণ মানুষ চিন্তাও করে না সেকথা। জন্তুজানোয়ারের মত বেঁচে থাকার জন্যেই বেঁচে থাকে।'

'কিন্তু তুমি তো সাধারণ মানুষের মত নও। মানে, তোমার বয়সের একজন মহিলা সংসার নিয়ে জবজবে থাকেন। তোমার জীবনযাপনের ধরনের সঙ্গে তার মিলবে না।'

'আমার কথা ছেড়ে দাও, আমি ছন্নছাড়া। এরকম জীবন যেন কোন মেয়ের হয় না।'

'বাঃ। তুমি কি জানো, সংসারের জাঁতাকলে পিষে থাকা অনেক মহিলাই ছটফট করেন সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে, আর্থিক স্বাধীনতা পেলে নিজের মত একা থাকতে, ঠিক তুমি যেমন আছ। সারাজীবন অন্যের জন্যে খেটে মরলাম, আর নয় ! এই তাদের বক্তব্য। কোন হিসেব পাবে না। এই ধরো,

আজ, আজকের সকালটা গতকালের থেকে আলাদা, আগামীকালও এরকম হবে না। অথচ তুমি প্রথমে রাজি হচ্ছিলে না। তাই না ?'

মাথা নাড়ল নীলিমা। স্বীকার করল চুপচাপ।

বর্ধমানে ওরা চা খেয়েছিল। অনেক অনেকদিন রাস্তার ধারের দোকান থেকে তেলে ভাজা সিঙ্গাড়া খায়নি প্রবর। দেখা গেল নীলিমাও তাই। দুজনেই স্বীকার করল আজকাল ওসব খেতে ভয় হয়। অথচ এককালে অম্বলও হত না, পেটও ঠিক থাকত। একজন ডাক্তার হিসেবে যে পেসেন্টদের খাওয়ার ব্যাপারে সে যে বিধিনিষেধ দেয় তাতে বিজ্ঞানের সমর্থন আছে। সিঙ্গাড়া সরিয়ে দিয়ে প্রবর মাথা নেড়েছিল।

নীলিমা জিজ্ঞাসা করল, 'কি হল ?'

'একটাই শরীর, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কেমন বদলে যায়।'

'প্রকৃতির নিয়ম।'

'সবার ক্ষেত্রে এক নিয়ম চালু নয় কিন্তু। আমি এমন লোককে জানি সত্তর বছর বয়সে ব্লাডপ্রেসার নর্মাল, সুগার নেই, যা ইচ্ছে খেয়ে হজম করতে পারেন। কিন্তু বেশির ভাগ মানুষই পঞ্চাশে এসে শরীরের ভেতরটা নিয়ে বিব্রত হন। যার মিষ্টি খাওয়ার শখ ছিল সে আর মিষ্টির দিকে তাকাতে পারবে না সুগার বেড়েছে বলে। রেড মিট বন্ধ। ব্লাড ইউরিয়া ছয়ের ওপর উঠেছে অতএব প্রোটিন বাদ। ফ্যাট বেড়ে যাচ্ছে অতএব মদ্যপান নিষেধ। চারধারে শুধু নো। ওঠ।' প্রবর হাসল।

কথাগুলো ওর নিজেরও। প্রোটিন, মদ, সিগারেট খাওয়া নিষেধ হয়ে গেছে। শরীর এগুলোকে নিতে পারছে না। মিষ্টিও বাতিল হওয়া উচিত। কিন্তু প্রবর মাঝেমাঝেই অবাধ্য হচ্ছে। আর এই অবাধ্যতার জন্যে যখন শরীর জানান দেয় তখনই কিছুদিন বাধ্য হয়ে থাকা। এই চলছে।

বীরভূমে ঢুকে গিয়েছিল দুপুরের আগেই। দুপাশে ফাঁকা মাঠ। মাঠে ফসল নেই। মাথা ঘুরিয়ে দেখলেও আকাশ শেষ হয় না। ঝড়ো গতির গাড়িতে বাতাস শব্দ তুলছে। কাঁচ তুলে দিতে গিয়েও থেমে গেল নীলিমা। বলল, 'আঃ।'

সামনেই একটা সাঁকো। সাঁকোর গায়ে এই দিকবিদিক শূন্য চরাচরে খড়ের ছাউনি দেওয়া হোটেল। পবিত্র হিন্দু হোটেল। গাড়ি দাঁড় করাল প্রবর। জিজ্ঞাসা করল, 'পবিত্র হিন্দু মানে কি ?'

নীলিমা বলল, 'ব্রাহ্মণ রাঁধুনি বোধহয়।'

গাড়ি দাঁড়াতে দেখেই একটা বাচ্চা ছুটে এল, 'পারশে মাছ আছে বাবু, জ্যান্ত পার্শে।'

প্রবর বলল, 'নামো। এরকম জায়গায় মাঝে মাঝে চমৎকার খাবার পাওয়া যায়।'

'এখনই খাবে ?'

'সকাল থেকে পেটে সলিড কিছু পড়েনি।'

অগত্যা নামল নীলিমা। লম্বা কাঠের টেবিল আছে। পেছনে মাটিতে বাঁশ পোতা বেঞ্চি। খদ্দের নেই। দুজন লোক খালিগায়ে গল্প করছিল। প্রবীণটি

দাঁড়িয়ে বলল, 'আসুন স্যার।'

'ভাত ডাল পাওয়া যাবে?' প্রবর জিজ্ঞাসা করল।

'ভাত, মুসুরির ডাল, উচ্ছে ভাজা, আলু পোস্ত, পটলের তরকারি আর পার্শে মাছ।' লোকটা যখন ফিরিস্তি দিচ্ছিল তখন একটা সুর এসে গেল।

'এখনই পাওয়া যাবে?'

লোকটি চট করে ভেতরে চলে গেল। প্রবরের মনে হল খুব নোংরা নয় এখানকার পরিবেশ। ফিরে এসে কিন্তু কিন্তু করে লোকটা বলল, 'মিনিট পঁচিশেক দেরি হবে। একেবারে গরম গরম দিতে পারব। কলাপাতাও পৌঁছে যাবে তার মধ্যে।'

প্রবর নীলিমার দিকে তাকাল। লোকটা এক পা এগিয়ে এল, 'প্রথম খদ্দের মা আপনারা। দয়া করে চলে যাবেন না।'

নীলিমা বলল, 'আধ ঘন্টা বসে থাকতে হবে?'

'বসবেন কেন মা? সঙ্গে গাড়ি আছে, দেবী দর্শন করে আসুন।'

'দেবী?'

'এই আধমাইলটাক ওই কাঁচা রাস্তা দিয়ে গেলেই মায়ের মন্দির দেখতে পাবেন। খুব জাগ্রত। কার্তিক মাসে খুব ভিড় হয়।' লোকটা হাত নেড়ে বলল।

প্রবর মাথা নাড়ল, 'দূর। দেবী দর্শন করার মানুষ আমরা নই।'

'ও। তবে ওখানে গেলে একজন সাধকের দেখা পাবেন।'

'সাধক?' নীলিমা কৌতূহল দেখাল।

'হ্যাঁ মা। মনমেজাজ ভাল থাকলে তিনি কথা বলেন। দু'দিন অন্তর শুধু আধসের ভাত খান। মেজাজ খারাপ থাকলে কাউকে কাছে ঘেঁসতে দেন না। আমাদের কাছে উনি দেবতার মতন। মা, বাবুকে নিয়ে একবার ঘুরে আসুন।'

নীলিমা প্রবরকে বলল, 'চল না। প্রমোদকুমারের লেখায় এমন চরিত্র পেয়েছি। দেখে আসি।'

অগত্যা প্রবর নীলিমাকে নিয়ে গাড়িতে উঠল। পিচের রাস্তা ছেড়ে কাঁচা পথে নেমে বুঝল মাটি শক্ত। সে হাসল, 'লোকটা আমাকে প্রথমে স্যার বলল। তারপর তোমাকে মা বলতেই আমি বাবু হয়ে গেলাম।'

'সহজেই যে সম্পর্কের কথা মনে এসেছে তাই বলল।'

'এত সহজে আসে কেন?'

'কি বলব? অভ্যেস, সংস্কার। তুমি যতই চেঁচাও পরিবর্তন হবে না। যদি গিয়ে বল আমরা স্বামী-স্ত্রী নই চোখ বড় করে তাকাবে। বিশেষ একটা বয়সের পরে নারী এবং পুরুষকে একসঙ্গে দেখলে স্বামী-স্ত্রী ছাড়া ভাবার অভিজ্ঞতা এখনও হয়নি।' নীলিমা একটু গম্ভীর হল, 'তুমি তখন মানতে চাওনি।'

'আমি এখনও মানি না।'

আধ মাইলের জায়গায় এক কিলোমিটার চলে আসার পর কিছু গাছগাছালির ফাঁকে টিনের ছাদওয়ালা চালাঘর চোখে পড়ল। গাড়ি থেকে নেমে ওরা কাউকেই দেখতে পেল না। গরু ছাগল পর্যন্ত নেই। চালাঘরের সামনে গিয়ে

দাঁড়াতেই দেবীমূর্তি চোখে পড়ল। কালী, কিন্তু জিভ বের করে নেই। পায়ের তলায় শিব শায়িত নয়। পরনে একটি ডুরেকাটা শাড়ি। মুখটি ভারি মিষ্টি। দেখলেই ঘরের মেয়ে বলে মনে হয়।

নীলিমা বলল, 'হ্যাঁ। ভয় হচ্ছে না বরং আনন্দ জাগছে।'

নীলিমা প্রণাম করল। প্রবর বলল, 'আমি পারলাম না। নিজের মেয়েকে যেমন প্রণাম করতে পারতাম না। কালীকে মেয়ে হিসেবে অনেকে ভেবেছেন শুনেছি, এ বোধহয় সেই রূপ।'

চোখ সরাতে ইচ্ছে করছিল না। প্রবর চালাঘরের বাইরে তাকাতেই মানুষটিকে দেখতে পেল। মাথায় চুল নেই। টাক নয়, বিশ্রীভাবে ছেঁটে ফেলা হয়েছে। মাঝে মাঝে মাথার চামড়া বেরিয়ে আছে। শরীর শীর্ণ, লাল কাপড় লুঙ্গির মত পরা, উর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত। মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ওদের দেখছেন। প্রবর বুঝল এই সেই মানুষ।

চোখাচোখি হতেই কেমন একটা অস্বস্তি তৈরি হয়ে গেল তার। নীলিমাও মানুষটিকে দেখছিল। তিনি হঠাৎই ডান দিকে হাঁটতে লাগলেন। একটা গাছের নিচে গিয়ে গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসলেন। নীলিমা বলল, 'এঁর কথাই দোকানদার বলেছিল। চল না আলাপ করি।'

'যদি মেজাজ খারাপ থাকে?' একটু জোরেই বলল প্রবর।

'আমি কি পাগলা কুকুর যে লোক দেখলেই কামড়াব?' হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন মানুষটি। অত দূরে প্রবরের গলার স্বর পৌঁছানোর কথা নয়। তিনি আবার হাত নাড়লেন, 'যাও, দেখা হয়ে গেলে বিদেয় হও। আমি একটু বাতাস খাই।'

নীলিমা এগিয়ে গেল। নমস্কার করল, 'আমরা কথা বললে আপনি অসন্তুষ্ট হবেন?'

'আমি ম্যাজিক জানি না। টাকা পয়সা সোনাদানা দিতে পারব না। রোগ সারাতে জানি না। আর যে শালারা রটিয়েছে আমার খুব রাগ তারা রাগ কি জিনিস জানেই না। কে হয়?' চোখের ইশারায় প্রবরকে দেখালেন তিনি।

নীলিমা কেঁপে উঠল। সে মাথা নামাল, 'আমরা পরিচিত। বন্ধু।'

'কতখানি বন্ধু? বন্ধু বললেই হোল? খুব সোজা। চোরের মতন দূরে দাঁড়িয়ে আছে কেন?'

নীলিমা ঘাড় ঘুরিয়ে ইশারায় প্রবরকে ডাকল।

প্রবর পাশে দাঁড়াতেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'মায়ের সঙ্গে আলাপ হল?'

'মা মনে হয়নি। মেয়ে বলেই মনে হয়েছে।' প্রবর জবাব দিল।

'আঃ। মেয়ে মা নয়? বাবা মেয়েকে মা বলে ডাকে না? এ কে রে বাবা!' মানুষটি হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠলেন। যেন এমন মজার কথা তিনি কখনও শোনেননি। তারপর আচমকা গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখানে কেন আসা হল?'

প্রবর জবাব দিল, 'সাঁকোর কাছে খাওয়ার জন্যে থেমেছিলাম। একটু দেরি হবে বলে ওরা এই মন্দির ঘুরে দেখার কথা বলল। চলে এলাম।'

'তাহলে পেটের জন্যে আসা! পেটসর্বস্ব জীবন। পেটের জন্যে রোজগার

করা হয় ?'

'সাধারণ মানুষ তো তাই করে।'

'বাঃ, বাঃ। কি জবাব। তার মানে একটা মুটে আর ইনি সমান। সে সাধারণ আর ইনিও সাধারণ। সে খালি গায়ে মোট বয় আর ইনি প্যান্টুলুন পরেন।'

'আপনি কি বলতে চাইছেন ?' প্রবর রেগে গেল।

মানুষটি হাসলেন, 'ওই শরীরটা কার ?'

'আমার।'

'বাঃ। ভাল কথা। নিজের শরীরটাকে ভাল ভাবে জানা আছে ?'

'নিশ্চয়ই।'

'শরীরের মধ্যে কটা শরীর থাকে ?'

প্রবর নীলিমার দিকে তাকাল, 'মানুষ জন্মায় যে শরীর নিয়ে তা প্রথম এক যুগে শুধুই বড় হয়। তারপর তার শরীরের ভেতর আর একটা শরীর তৈরি হয় যা সমস্ত যৌবনকাল জুড়ে থাকে।'

'চুকে গেল ? আর কিছু নেই ? শরীরের দুটো চেহারা ?' মানুষটি উঠে এলেন। প্রবরের পেছনে দাঁড়িয়ে হুকুম করলেন, 'চোখ বন্ধ করা হোক।'

প্রবর চোখ বন্ধ করতেই মেরুদণ্ডের নিচে মানুষটির হাতের স্পর্শ পেল। প্যান্ট এবং অন্তর্বাস ভেদ করে সেই স্পর্শ ক্রমশ তীব্রতর হল। মানুষটি চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আর কোন শরীর নেই ?' মুহূর্তে সব অন্ধকার হয়ে গেল। সমস্ত বোধ অন্তর্হিত। প্রবরের মনে হল তার মেরুদণ্ড যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে একটা রবারের বল বেঁধে রাখা হয়েছিল। একটু ছাড়া পেয়ে সেটি জলের চাপ এড়িয়ে ওপরে উঠতে চাইছে। এই সময় অন্য সব চিন্তা তার মাথা থেকে উধাও। এমন কি পাশে নীলিমা দাঁড়িয়ে, রহস্যময় মানুষটি যে পেছনে তাও বোধে নেই। কোন সুদূর থেকে ভেসে আসা একটা তরঙ্গ বারংবার বলতে লাগল, কিছু একটা করার ছিল, করা হয়নি। কিছু একটা করার ছিল—।

একটু একটু করে সব স্বাভাবিক হল। মানুষটি ফিরে গেছেন নিজের জায়গায়। ঘোলাটে ভাব কেটে গেলে তিনি বললেন, 'জানোয়ার জানে তার একটাই শরীর। ওই সাধারণ মানুষ মনে করে শরীর দুটো। কিন্তু আসলে আমাদের শরীর তো তিনটে। প্রথমটা মায়ের পেট থেকে বের হয় প্রকৃতির টানে। তার কোন ক্ষমতা নেই। খাইয়ে দিতে হয় পরিয়ে দিতে হয়। তারপর সারাজীবন ধরে ওই কাজটা নিজে অথবা অন্য কেউ না করে দিলে সে শুকিয়ে কাঠ। ওটাকে তবু বইতে হবে কেন না ওটা আধার। গয়নার বাক্সের মত। তারপর মায়ের পেট থেকে বের হওয়া শরীরে যখন পরিবর্তন ঘটল তখন তার শরীরের আবির্ভাব। পুরুষের একরকম আর নারীর আর এক রকমের প্রকাশ। ওই শরীরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে মন। কিন্তু মন যার দুর্বল সে তো অসহায়। এসব আপনা আপনি হয়। একটুও চেষ্টা করতে হয় না। মায়ের পেটে যেদিন প্রাণ আসে সেদিন সেটা দুটো টুকরো হয়। একটা বুকে অন্যটা মেরুদণ্ডের নিচে ঘুমিয়ে থাকে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ঘুমন্ত অবস্থাতেই

ছাই হয়ে যায়। কেউ কেউ সেটা জাগাতে পারে। তখন আর এক শরীর আর এক প্রাণ। সেই মূলাধার পদ্মে জীবের পরমা শক্তির ঘুম ভাঙাতে পারলে মানবজীবন সার্থক। নইলে শুধু জন্মানো আর মরা।'

নীলিমা জিজ্ঞাসা করল, 'কিভাবে তার ঘুম ভাঙানো যায়?'

'বাবু হয়ে চোখ বন্ধ করে নিজের কপালের দিকে কখনও তাকানো হয়েছে?'

'হ্যাঁ। আস্তে আস্তে মন চিন্তাশূন্য হয়ে যায়। আবছা অন্ধকার নামে চারধারে।'

'বাঃ। পাঁচ দশ মিনিট এক দুই ঘণ্টা। সব চিন্তাশূন্য। আস্তে আস্তে আলো ফুটবে। মন হয়ে যাবে চুম্বক। সেই চুম্বক দিয়ে মূলাধার থেকে টেনে তুলে ইচ্ছেমত খেলা করা যায়। তারপর চোখ খুললে কোন রোগ নেই কষ্ট নেই। ভাত হয়ে গেছে।'

'এ্যাঁ?'

'হোটেলে ভাত হয়ে গেছে; ওরা হাঁ করে তাকিয়ে আছে। যাওয়া হোক।' মানুষটি হঠাৎ উঠে পড়ে হনহন করে হাঁটতে লাগলেন। কিছুক্ষণ সেই দিকে তাকিয়ে থেকে নীলিমা বলল, 'চল।'

প্রবর বলল, 'ভদ্রলোক আমার শিরদাঁড়ার নিচে হাত দিতেই আচমকা সব জ্ঞান চলে গেল। লোকটা আলাদা জাতের।'

হঠাৎ নীলিমা কেঁদে ফেলল। প্রবর অবাক, 'কি হল?'

'আমার খুব ভাল লাগল এসে। খুব ভাল। তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। বুক কেমন ভরে গেছে।' নীলিমা চোখ বন্ধ করে আকাশের দিকে মুখ তুলল।

প্রবর কিছু বলল না। গাড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে তার মনে হল, বয়স হচ্ছে। সময় আর বেশি নেই। এই সময়টাকে কি ভাবে কাটানো যায়?

বাড়িতে ঢোকামাত্র পারমিতা এগিয়ে এল, 'কাল রাত্রে ওইরকম একটা ফোনের পর আর কোন খবর নেই, আমরা তো চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম।'

প্রবর দেখল সোহিনী দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। মুখ গম্ভীর। সে জিজ্ঞাসা করল, 'ওইরকম ফোন মানে? আমি তো বলেছিলাম।'

'কথা কেমন জড়ানো লাগছিল। রামপুরহাটে যাচ্ছিস আগে জানতিস না?'

'না। সরো, আমি স্নান করব।'

'তারাপীঠে গিয়েছিলি?'

'না। সময় পাইনি।' প্রবর নিজের ঘরে ঢুকল। সারাদিন গাড়ি চালিয়ে শরীর এখন বেশ ক্লান্ত। সে দেখল সোহিনী বাথরুমে ঢুকে স্নানের ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। বাথটবে জল ভরে নুন মিশিয়ে দিয়ে সে বেরিয়ে এল। কোন কথা না বলে সে বাথরুমের দরজা বন্ধ করল। সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় সে আয়নার সামনে দাঁড়াল। নিজের শরীরটাকে এখন আর চেনা যায় না। কি ছিল কি হয়েছে? শরীরের দিকে তাকাবার বয়সের পর নিত্য দেখে আসছে কিন্তু কখন কোন ফাঁকে মেদ জমল, ভাঁজ পড়ল, ভারি হল তা টেরই পায়নি। দ্বিতীয় শরীর ঠিক সময়ে জেগেছিল সময় যাওয়ার আগেই যে নিষ্ক্রিয়। তৃতীয় **শরীর? নিজের মেরুদণ্ডের নিচে হাত দিয়েও কোন অনুভব হল না। শুধু**

চামড়ার স্পর্শ। জলে নামল প্রবর।

নীলিমা খুব ধাক্কা খেয়েছে। সারাটা পথ বেশি কথা বলেনি। আজ যে এমন একটা মানুষের দেখা পাওয়া যাবে তা কে জানত। জীবনের অনেক কিছুই এমনই ঘটে যায়। গত রাত্রে নীলিমার ফ্ল্যাটে শুয়েও মনে অন্য বাসনা আসেনি। কেউ বিশ্বাস করবে না। একটু একটু করে তার আর সোহিনীর মনের ফারাক অনেক বড় হয়ে গেল। এক বিছানায় পাশাপাশি শুয়েও দুজনেই জানে কেউ কারো শরীরের দিকে হাত বাড়াবে না, অথবা বাড়াতে পারবে না। এও তো জীবন। বাইশ বছরে যা বোধগম্য হয় না বাহান্নতে পৌঁছে সেটাই চরম সত্যি হয়ে দাঁড়ায়। শুধু কি শরীর বদলায়, মনও তো তার সঙ্গে পাল্লা দেয়।

স্নান করে আরাম। পাজামা পাঞ্জাবি পরে চুল আঁচড়াবার সময় সোহিনীর গলা শোনা গেল, 'চা দেব তো?'

'চা? নাঃ। বিকেলে চা খেয়েছি।'

'চেম্বার থেকে লোক এসেছে?'

'আজ ওদের ছুটি দিয়ে দাও।'

সোহিনী বেরিয়ে গেল। বিছানায় শুয়ে পড়ে চোখ বন্ধ করতেই মায়ের গলা, 'এমন হুট করে বাইরে যাস না। বয়স হচ্ছে তো!'

'আমি তোমার থেকে ছোট।' উঠে বসল প্রবর। দেখল সোহিনী ফিরে এল।

পারমিতা জিজ্ঞাসা করল, 'তুই গাড়িতে গিয়েছিলি।'

প্রবর তাকাল, 'হ্যাঁ। আমার সঙ্গে নীলিমাও ছিল।'

'নীলিমা? কেন? ও, ওর কোন আত্মীয়কে দেখতে গিয়েছিলি?'

প্রবর তাকাল। সে কি এখন সত্যি কথা বলবে? নীলিমার নাম শোনামাত্র পারমিতা কথার আড়াল খুঁজছেন, সোহিনীর মুখ পাথর। একেবারে সাদাসাপটা সত্যি কথা কতটা সহ্য হবে এঁদের? হঠাৎই তার মনে অন্য চিন্তার উদয় হল। পারমিতার বয়স হয়েছে। তার সহায় সম্বল বলতে বাবার রেখে যাওয়া কিছু টাকা আর প্রবর। অপছন্দ কিছু হলে লড়াই করতে গেলে যাকে সঙ্গে পাওয়া দরকার তার সঙ্গেই লড়াই করতে পারবে না পারমিতা। সেক্ষেত্রে মুখ বুজে সরে থাকবে। সোহিনীর সেই একই অবস্থা। আঠারো বছরের ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে কেউ বাপের বাড়িতে ফিরে যেতে পারে না। সোহিনীর অন্য কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। অতএব মা যখন কথা খুঁজে একটা আড়াল পেতে চাইছেন তখন তাকে সেটা পাইয়ে দেওয়াই মানবিক হবে। সে খুব ধীরে শব্দ উচ্চারণ না করে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল।

পারমিতা বেশ নিশ্চিন্ত ভাব দেখাল, 'কেমন আছেন তিনি?'

'সময় হয়ে এসেছে।'

'ও। তা অত কাছে গিয়েও তারাপীঠ গেলি না?'

'কি হবে? আমার তো ওসব আসে না তুমি জান! তবে অদ্ভুত একটি মানুষের দেখা পেয়েছি পথে। নির্জনে এক আটচালায় যে মায়ের মূর্তি নিয়ে থাকেন সেটিও অদ্ভুত।'

'কি রকম ?' পারমিতা আগ্রহী হল।

প্রবর সংক্ষেপে তার অভিজ্ঞতার কথা বলল। বলার সময় তার রোমাঞ্চ হল।

রোমাঞ্চিত পারমিতাও। সোহিনীর দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'এমন মায়ের মূর্তি আমি কখনও দেখিনি। বীরভূমের বিভিন্ন শ্মশানে শুনেছি অনেক যোগসিদ্ধ পুরুষ থাকেন। ওর সৌভাগ্য এমন একজনের দেখা পেয়েছে। তুমি যাবে বউমা আমার সঙ্গে ?'

সোহিনী জবাব দিল না, বদলে একটু হাসল। পারমিতা আরও কিছুক্ষণ কথা বলে ফিরে গেলেন নিজের ঘরে। ছেলেরা অন্য ঘরে পড়ছে। খুব প্রয়োজন ছাড়া বাবার সঙ্গে তাদের কথাবার্তা হয় না। সোহিনী দাঁড়িয়েছিল। প্রবর তাকে বলল, 'তুমি কিছু মন্তব্য করলে না ?'

'কি ব্যাপারে ?' সোহিনী নড়ল না।

'নীলিমার সঙ্গে বাইরে গিয়েছিলাম বলে !'

'ভদ্রমহিলাকে আমি কখনও চোখে দেখিনি। শুনেছি তোমার অনেককালের বন্ধু। এককালে তোমার আর এক বন্ধুর প্রেমিক ছিলেন তিনি। এরকম একজনের সঙ্গে বাইরে গিয়েছ বলে আমি কি মন্তব্য করতে পারি !' সোহিনী অদ্ভুত হাসল, 'আর মন্তব্য করতে গেলে যে মনের প্রয়োজন সেটাও আজকাল খুঁজে পাই না।'

'চমৎকার জবাব।'

'তুমি ব্যঙ্গ করতে পার কিন্তু জানতে চাইলে বলে সত্যি কথাটা বললাম।'

'সোহিনী, আমরা পরস্পরকে যখন এই চোখে দেখি তখন একসঙ্গে আছি কেন ?'

'তুমি কেন আছ তা জানি না। নিজেকে নির্লিপ্ত করে আমার থাকতে কোন অসুবিধে হচ্ছে না। যাওয়ার জায়গা যদি থাকত তাহলে নিশ্চয়ই রোজ আমাকে দেখে যাতে তুমি বিরক্ত না হও তার ব্যবস্থা করতাম।'

প্রবরের মেজাজ খারাপ হচ্ছিল। সে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার কখনও মনে হয়েছে কেন এমন হল ? কেন আমরা পরস্পরকে আঁকড়ে ধরতে পারলাম না।'

'অনেকবার তো এসব আলোচনা হয়েছে।'

'আমরা কোন কারণ জানতে পারিনি।'

'তোমার মন ইচ্ছে করে মানতে চাইছে না। তুমি যেমন চেয়েছিলে আমি তেমন নই। মনের গায়ে একবার কারো ছাপ বসে গেলে সেখানে অন্য কোন ছাপ স্পষ্ট হতে পারে না। তুমি আমার মধ্যে তোমার গানকে পেতে চেয়েছিলে। সেটা তো কখনই সম্ভব নয়। তুমি ভদ্রলোক, ঝগড়া করোনি, এই নিয়ে ঝামেলা হয়নি তাই। একটু একটু করে নির্লিপ্ত হয়েছ, আমিও তাই। শুধু—।'

'শুধু ?'

'ছেলেদের তো কোন দোষ ছিল না।'

'কেন ? আমি কি ওদের ওপর কোন অবিচার করেছি ?'

'অবিচার বলতে তুমি কি বোঝ জানি না। বাবা হিসেবে কতটুকু সময় দিয়েছ ?'

'আশ্চর্য ! আমার প্রফেসনের প্রয়োজনে—।' প্রবরকে কথা শেষ করতে দিল না সোহিনী। হাত তুলে বলল, 'মুশকিল হল আমাদের প্রত্যেকের নিজের নিজের মত একটা না একটা যুক্তি থাকে। আলোচনা করে কোন লাভ নেই।'

প্রবর ঠোঁট কামড়াল। তারপর বলল, 'ছেলেদের কেন ? তোমারও তো দোষ ছিল না।'

হঠাৎ সামনে এগিয়ে এল সোহিনী, 'শোন। তোমাকে একটা কথা বলি। জ্ঞান হবার পর বাবাকে খুব ভালবাসতাম। যা কিছু আবদার ওঁর কাছেই করতাম। তখন আমার জীবনে দ্বিতীয় কোন পুরুষ ছিল না। বিয়ের পর তোমাকে পেলাম। বাবার ভূমিকা নেওয়া তোমার কথা নয়। কিন্তু তুমি স্বামীর ভূমিকায় আমার অভাব রাখোনি। আমাকে স্বাচ্ছন্দ্য দিয়েছ, সন্তান দিয়েছ, শারীরিক আনন্দের অভিজ্ঞতা দিয়েছ। মন ছুঁতে পারোনি। পারলে কি হত ? আমার বাবাও বিয়ের পরে চলে গেছেন। আমি তো হাজার চাইলেও তাঁকে খুঁজে পাব না। এও তেমনি। পাইনি। কিন্তু যা পেয়েছি তাই ভাল। এখন শরীরের চাহিদা মরে গেছে। তোমার বদলে ছেলেদের পেয়েছি। মনের জায়গাটা কিন্তু আর খালি নেই। তাই বেশ আছি। অতএব এসব নিয়ে মাথা ঘামিও না।' সোহিনী চলে গেল। চুপচাপ রইল কিছুক্ষণ প্রবর। হঠাৎ তার খুব একা লাগছিল। এই পৃথিবীতে সব থাকলেও মানুষের একাকিত্ব বোধ সূচের মত হয়ে ওঠে কখনও কখনও। সে ধীরে ধীরে ছেলেদের ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল। বড় ঘর। দুটো খাট। দুটো টেবিল। একজন টেবিলে বসে লিখছে, অন্যজন খাটে বইমুখে লম্বা হয়ে শুয়ে আছে। তার দুই পুত্র। সবাই বলে প্রবরের মুখ বসানো। তার ছেলেবেলা। একজনের পনের, অন্যজন আঠারো পার করেছে। ওই বয়সেই তো সে সূর্যর কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছিল। ওই বয়সেই এই জানলা দিয়ে শিহরিত হয়েছিল। ওই বয়সেই গান এসে গিয়েছিল তার জীবনে। আঃ। সেই বয়সটা কোথায় গেল ! ছেলেদের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ নিজের ওপর তার খুব মায়া হচ্ছিল। জায়গা দখল হয়ে গিয়েছে। প্রতিদিন পুরোন জায়গা ছেড়ে নতুন জায়গার দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

ছোট ছেলে প্রথম দেখতে পেল, 'বাবা !' সঙ্গে সঙ্গে সে লেখা বন্ধ করে সোজা হয়ে বসল। তার গলা কানে যাওয়ামাত্র বড় ছেলে লাফিয়ে উঠল। প্রবর চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। ছোট জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার শরীর খারাপ ?'

প্রবর মাথা নাড়ল, না। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'কেন রে ?'

'আজ চেম্বারে যাওনি, তাই।'

'এমনি গেলাম না।' প্রবর ঘরে ঢুকল। টেবিলের উল্টোদিকে চেয়ার টেনে বসল, 'পড়াশুনা কেমন হচ্ছে ?'

ছোট জবাব দিল, 'ভাল'।

এবার সে বড়র দিকে তাকাল, 'জয়েন্টের রেজাল্ট কবে বেরুবে ?'

'কিছুদিনের মধ্যেই।' বড়র গলার স্বর বেশ ভারি।

'কি বই ওটা ?'
'আউটসাইডার।'
'বাঃ। এসব বই বুঝতে পারো ?'
'না পারার তো কিছু নেই।' বড়র জবাব, 'সহজ ইংরেজি।'
'আমি ভাষার কথা বলছি না। মানে ধরতে পার ?'
'আমরা এসব নিয়ে ডিবেট করি।'
'ও।' হঠাৎ থমকে গেল প্রবর। সে যেন আর কথা খুঁজে পাচ্ছিল না।
হঠাৎ ছোট মুখ খুলল, 'বাবা, একটা কথা বলব ?'
'ইয়েস। বল ?' মুখ ফেরাল প্রবর।
'স্কুল থেকে একটা ট্যুরে নিয়ে যাবে। আমি যাব ?' ছোট প্রশ্ন করতেই বড় ধমক দিল, 'অ্যাই। এটা কি হচ্ছে ?'
'তুই চুপ কর। আমি বাবাকে বলছি!'
'তোমার মা অনুমতি দিয়েছেন ?'
'মাথা নিচু করল ছোট, 'না। মা বুঝতে চাইছে না।'
উঠে দাঁড়াল প্রবর, 'ভালভাবে বোঝাও।'
'তুমি একবার হ্যাঁ বলো না।'
'না। মা যা বলবে তাই তোমাকে শুনতে হবে।'
'বাঃ। তুমিও তো আমার বাবা। তুমিও বলতে পার।'
'তোমাদের ব্যাপারে মায়ের কথাই আমার কথা।' প্রবর ঘর থেকে বেরিয়ে এল। দরজার বাইরে আসামাত্র বড়র গলা কানে এল, 'আচ্ছা হয়েছে। ঘোড়া টপকে ঘাস খেতে গিয়েছিলি।'
'কি ? মা ঘোড়া ?' ছোট চেঁচাল, 'বলে দেব ?'
এরা অনেক বড় হয়ে গিয়েছে। বেশ বড়। প্রবর মনে মনে বলতে লাগল।

চেম্বারে বসে পেশেন্টের সঙ্গে কথা বলতে বলতেই প্রবরের মনে হচ্ছিল শরীরে একটা অস্বস্তি হচ্ছে। গেঞ্জি ভিজে গেছে ঘামে। রুমালে কপালের ঘাম মুছল সে। পেশেন্ট চলে গেলে সহকারিকে ডাকল, 'আর ক'জন আছে ?'
'আটজন।'
'সবাইকে বলে দাও একটা জরুরি প্রয়োজনে নার্সিংহোমে যেতে হচ্ছে। আজ দেখতে পারব না। আর এক্ষুনি একটা ট্যাক্সি ডেকে আনো।' প্রবর আবার রুমালে মুখ মুছল। সহকারি বেরিয়ে যাওয়ামাত্র সে ড্রয়ার খুলে ছোট্ট কৌটো বের করে একটা ট্যাবলেট জিভের তলায় রাখল। বুকের দুই পাঁজরের নিচে চাপটা বাড়ছে। এখন দেড় থান ইঁট। তিনটের চাপ হলেই—। সে চেম্বারের চারদিকে তাকাল। কেমন ঝাপসা লাগছে। হ্যাঁ, এসবই আগাম সংকেত। বসে থাকতেও শরীর চাইছে না। টেলিফোনের বোতাম টিপল সে। রিঙ হল। সোহিনীর গলা শুনতে পেয়ে বলল, 'সোহিনী, আমি বেলভিউতে যাচ্ছি। শরীরটা ভাল লাগছে না। তবে চিন্তার কোন কারণ নেই।'

'কি হয়েছে ?'

'হৃদযন্ত্র মনে হচ্ছে বিকল হতে যাচ্ছে। বাই।' টেলিফোন নামিয়ে রাখল সে। দরজা খুলে গেল। সহকারি বলল, 'স্যার, ট্যাক্সি এসে গেছে।'

প্রবর উঠল। ব্যথাটা এবার দুই ইঁটে পৌঁছে গেছে। জিভের তলার ট্যাবলেট গলে গেছে। নিশ্চয়ই লড়াই শুরু হয়ে গেছে। হাঁটতে গিয়ে টলে যেতেই সহকারি উদ্বিগ্ন হয়ে বলল, 'স্যার ! আপনাকে ধরব ?'

হাত নেড়ে না বলল সে। বাইরে নিশ্চয়ই পেশেন্টরা অপেক্ষা করছে এখনও। তাদের সামনে দিয়ে ডাক্তার হয়ে অসুস্থ অবস্থায় সে যাবে না। নিজেকে সোজা রেখে কিছু বিস্মিত মানুষের সামনে দিয়ে সে বাইরে বেরিয়ে এল কোনরকমে। সহকারি ট্যাক্সির দরজা খুলে ধরতেই সে ভেতরে ঢুকে বলল, 'বেলভিউ, জলদি।'

'স্যার ! আমি সঙ্গে যাব ?' সহকারির উদ্বিগ্ন গলা শুনে না বলতে গিয়েও সে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল। ড্রাইভারের পাশে উঠে বসল লোকটা। আজ কোন মায়ামন্ত্রে কলকাতার রাস্তায় জ্যাম ছিল না। বেলভিউতে পৌঁছে গেল দশ মিনিটেই। ততক্ষণে চাপ আড়াই ইঁটে পৌঁছে গিয়েছে। মুখ বিকৃত হচ্ছে। সহকারি ছুটোছুটি করে ভর্তির ব্যবস্থা করতেই তাকে স্ট্রেচারে করে লিফটের দিকে নিয়ে যাওয়া হল। প্রবর শেষবার কথা বলল, 'ডক্টর সেনকে খবর দিও।'

যন্ত্রণা এখন তিন ইঁটের চাপে বেশ বেপরোয়া।

দশমী

দিন কয়েক বাদে এক সকালে ডক্টর সেন কেবিনে ঢুকে প্রশ্ন করলেন, 'কেমন আছেন ?'

প্রবর শুয়েছিল। হেসে বলল, 'ভাল।'

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন।'

'বেঁচে গেলাম বলে ?'

'না। আপনার হার্টঅ্যাটাক হয়েছিল বলে। এখন আপনি জীবনকে অনেক শান্ত চোখে দেখবেন, বেপরোয়া ভাব চলে যাবে।' ডক্টর সেন হাসলেন, 'সেই বিখ্যাত কবি স্টুয়ার্ট বলেছিলেন, মানুষ কিছুতেই শুনবে না, আমিও শুনিনি যতক্ষণ ঈশ্বর আমাকে একটি হার্টঅ্যাটাক উপহার দিয়ে মৃত্যুর কয়েক ইঞ্চি দূর থেকে ফিরিয়ে এনেছেন।'

প্রবর হেসেছিল। এসব তার চিকিৎসক হিসেবে অজানা নয়। হৃদয় শব্দটির মধ্যে আবেগের সবরকম আস্তানা। তাই আমরা সেইসব শব্দ তৈরি করেছি যা আবেগেরই পরিণতি। হৃদয়গ্রাহী , হৃদয়ঙ্গম, হৃদয়বিদারক, হৃদয়বেদনা। একটি মানুষ নিয়মিত ওষুধ খেয়ে, ওজন কমিয়ে, খাবার নিয়ন্ত্রণে রেখেও হার্টঅ্যাটাকের শিকার হয় যদি সে প্রচণ্ড পরিমাণে হৃদয়াবেগে ভোগে। কি করে আবেগের প্রাচুর্য হার্টঅ্যাটাককে ডেকে আনে ? আবেগের চাপে শরীরের আর্ডেনাল গ্লান্ড থেকে আর্ডেনালিন বেরিয়ে এসে রক্তস্রোতে

মেশে। এই আর্ডেনালিন রস করোনারি রক্তবাহকে মিশে যায় তখন হার্টের পেশীতে স্বাভাবিক রক্ত চলাচল বাধা পায়। ফলে যন্ত্রণা শুরু হয় যাকে বলা হয় অ্যানজাইনাপেক্টরিস।

অর্থাৎ টেনসন কমাতে হবে। ইমোশন এবং টেনসনমুক্ত জীবন চাই। একবার মৃত্যুর কাছে না পৌঁছালে মানুষের এই শিক্ষা হয় না। এসবই ঠিক কিন্তু কিভাবে এই পৃথিবীতে মানুষ টেনসনমুক্ত জীবন যাপন করতে পারে সেটাই সঠিকভাবে বলতে পারবে না কেউ। কাজের চাপ কমালেও আবেগ থেকেও টেনসন বেড়ে যাবেই।

ডক্টর সেন বলেছিলেন, 'তবে আপনাকে সেলাম জানাচ্ছি। অ্যাটাক হতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে যেভাবে সব গুছিয়ে মুখে ট্যাবলেট পুরে এখানে এসে হাজির হয়েছিলেন সেটা একটা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকল। কিছুদিন একদম বিশ্রাম নিন। নো কাজ।'

প্রবর কিছু বলেনি। এখনও তার শরীর দুর্বল। হাঁটাচলা ওই বাথরুম পর্যন্ত। একটু বেশি মাত্রায় সতর্কতা। তা হোক। আরাম লাগলো তার। আর এই বিছানায় শুয়ে শুয়ে অনেক অনেকদিন পরে সে গানকে দেখতে পাচ্ছে। প্রথমে গান এল সে যখন গভীর ঘুমে। কতবছর পরে সে এল স্বপনচারিণীর মত। এতদিন কোথায় ছিল গান ? স্বপ্নে তাকে দেখে দেখে এখন চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকতেই প্রবর চোখের পাতায় তাকে দেখতে পায়। সেই ঝকঝকে মেয়ে যে সামনে এসে দাঁড়ালেই পৃথিবীটা নরম হয়ে যায়। গতকাল একটা কাণ্ড হল। ঘুমের ওষুধ এখন দিনের বেলায় বন্ধ হয়েছে। ঘুম আসছিল না। হঠাৎ তার সেই মানুষটির কথা মনে পড়ল। চোখ বন্ধ করে সে নিজের কপালের দিকে তাকাল। আস্তে আস্তে সব জাগতিক অনুভূতি মুছে যেতে লাগল। অদ্ভুত পাতলা এক অন্ধকার চারপাশে। এবং সেই অন্ধকার সরিয়ে গান দেখা দিল। মিষ্টি হাসল গান।

গান কি তার তৃতীয় শরীর ? মানুষটি বলেছিলেন এইভাবেই শরীরের মধ্যে যে শরীর ঘুমন্ত তাকে জাগানো যায়। কিন্তু জেগে উঠল যে সে তো গান। আর সেই অবস্থায় তার কখন যে ঘুম এসে গিয়েছিল তা নিজেরই জানা নেই।

প্রথম প্রথম দুবেলা সোহিনী এবং পারমিতা আসত। ছেলেরা বিকেলে। এখন সে নিরাপদে চলে আসার পরে বিকেলেই আসে। সারা সকাল দুপুর সে একা। অবশ্য একেবারে একা নয়। তৃষ্ণা নামে একটি সুন্দরী নার্স তার সঙ্গে মাঝেমাঝেই কথা বলে যায়। মেয়েটির ছেলেবেলা কেটেছে দার্জিলিঙএ। পেশেন্ট ডাক্তার জেনেও মেয়েটি তার প্রশ্রয়ে বেশ স্বচ্ছন্দ। ডিভোর্স হয়েছে তার কয়েক মাস হল। অথচ তা নিয়ে কোন আক্ষেপ নেই। ওকে তার একটুও ইমোশনাল বলে মনে হয় না। এই তৃষ্ণাকেই সে বলেছিল নীলিমাকে টেলিফোনে খবর দিতে যাতে তাকে দেখতে আসে।

আজই নীলিমা এল। তখন সকাল শেষ হচ্ছে। সাদা শাড়ি সাদা জামা পরা নীলিমাকে তার আজ বেশ বয়স্কা মনে হল। কেবিনে ঢুকতেই প্রবর বলল, 'তোমায় অফিস কামাই করালাম।'

সেকেন্ড তিরিশেক চুপ করে থেকে নীলিমা বলল, 'কেমন আছ ?'

'ফার্স্ট ক্লাশ।'

'কেন এমন হল ?'

বুকে হাত রাখল প্রবর, এই একটি যন্ত্র মায়ের পেটে থাকার সময় অকেজো থাকে। বেরুনোমাত্র সেই যে চালু হল কখন থামবে তা কেউ জানে না। মানুষের শরীরের এই একটি যন্ত্রের ওপর তার কোন কন্ট্রোল নেই।'

'খুব পরিশ্রম করেছ ?'

মুটেরা আমার দশগুণ বেশি পরিশ্রম করে।'

নিঃশ্বাস ফেলল নীলিমা। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'এত দিন আমাকে জানাওনি কেন।? একটি মেয়ে টেলিফোনে বলতে আমি হতভম্ব।'

'জানাবার মত ঘটনা নয়।'

'বাঃ।'

'আমার হৃদযন্ত্র বিকল হয়েছে, এসো দেখতে এসো।'

'এখনই বা খবর দিলে কেন'

'ইচ্ছে হল। তুমি কেমন আছ ?'

'ভাল। খুব ভাল। মনের ভার অনেক কমে গেছে।'

'যাক। তোমার হার্টঅ্যাটাক হবে না।'

'কবে ছাড়বে এরা।?'

'কাল সকালে।'

'ও। তাহলে তো তোমাকে আর দেখতে আসা যাবে না।'

'কেন ? সোজা বাড়িতে চলে এস।'

বাড়িতে আবহাওয়া ভাল থাকবে ?'

'না থাকার তো কোন কারণ নেই। আমাদের দুজনেরই তো বয়স হয়েছে। আর অসুস্থ মানুষকে সবাই একটু করুণা করে।'

'এটা কি বললে ? কারো করুণার ওপর—!'

হাত তুলে থামাল প্রবর, 'কেউ যদি কিছু করতে চায় সেটা তার নিজস্ব ব্যাপার।'

সেই কাজটার কোন প্রতিক্রিয়া যতক্ষণ আমার ওপর না পড়ছে ততক্ষণ মাথা ঘামাব কেন ?'

নীলিমা উঠে দাঁড়াল, 'অনেকক্ষণ কথা বলেছ। এবার আসি।'

'এসো।'

নীলিমা চলে গেল। প্রবরের মনে হল নীলিমার বয়স তার থেকে বড় হলেও তেমন বয়স্কা ওকে এখনও মনে হয় না। গান বেঁচে থাকলে কি রকম দেখতে হত ? এখন যে গান তার বন্ধ চোখের পাতায় এসে দাঁড়ায় তার চেহারা তিরিশ বছর আগেকার। এই সময় বেঁচে থেকে গান যদি তাকে দেখতে আসতো তাহলে ওকে কি নীলিমার মত দেখাতো, নাকি সোহিনীর মত ? চোখ বন্ধ করল প্রবর।

বড় ছেলে ডাক্তারি পড়ছে। ছোট শিবপুরে ভর্তি হয়েছে। সুখের জীবন বলতে লোকে তো এই রকমটাই চায়। প্রবর এখন অনেক নিয়ন্ত্রিত জীবন

যাপন করে। একবেলা যায় চেম্বারে। দিনের বাকি সময় নিজের ঘরে ইজিচেয়ারে শুয়ে থাকে চোখ বন্ধ করে। শরীর স্থির হয়ে যায় কিন্তু মেরুদণ্ড থেকে কোন অনুভূতি একটুও ওপরে ওঠে না। এই সময় তার সমস্ত পৃথিবীজুড়ে থাকে গান।

নীলিমা এই বাড়িতে মাসে একবার আসে। ফোন করে প্রতি রবিবার। তাকে চমৎকার গ্রহণ করেছে সোহিনী। প্রাথমিক ধক্কা কেটে যাওয়ার পরে মেয়েরা সম্ভবত মেয়েদের ভাল বুঝতে পারে। সোহিনী যেই বুঝেছে নীলিমার কাছ থেকে তার আশংকার কোন কারণ নেই অমনি সে সম্পর্ক সহজ করেছে। এখন নীলিমা এসে তার শরীরের খবর নেয়, আড্ডা মারে সোহিনী এবং পারমিতার সঙ্গে। ছেলেরা ওকে ডাকে পিসী বলে। এতে কোনও প্রতিক্রিয়া হয় না প্রবরের।

বেঁচে থাকতে গেলে তাকে টেনসনমুক্ত হতে হবে। ইদানীং একটা কথা তার কেবলই মনে হচ্ছে, কেন বেঁচে থাকব ? শরীর সময়ের আগেই জরাগ্রস্ত হচ্ছে। কাজ করতে গেলে আগের মত উৎসাহ পাওয়া যায় না। মদ্যপান করতে বিন্দুমাত্র ইচ্ছে জাগে না। শুধু ভাল লাগার মধ্যে রয়েছে এই ইজিচেয়ারে শুয়ে চোখ বন্ধ করে থাকা। এমন কি কেউ কথা বলতে চাইলেও বেশি শব্দ খরচ করতে ইচ্ছে করে না। এখন শুধু থাকা। এ বাড়ির সবাই আর্থিক দিক দিয়ে নিরাপদে আছে। তার আর দায়িত্ব বলতে বাড়তি কিছু নেই। এই রকম ভাবলে মন অনেক হালকা হয়ে যায়।

বুকে আবার অস্বস্তি হচ্ছিল। প্রবর ডক্টর সেনের চেম্বারে গেল। ইসিজি করা হল। ডক্টর সেন বললেন, 'একটু গোলমাল লাগছে। একদম বিশ্রাম।'

'কেন ?'

'প্রয়োজন তাই।'

'আপনি আমার বয়সী। একটু বড়ও হতে পারেন। আপনি যে পরিশ্রম করছেন তা করার ক্ষমতা আমার নেই। কেন ? আপনি মদ্যপান করেন, সিগারেট খান। আমি ওসব করি না। তবু আমার হৃদযন্ত্র মাঝেমাঝেই ধাক্কা খাচ্ছে। কেন ?'

'এক একজনের সিস্টেম এক এক রকম। একথা আপনিও জানেন।'

'তার মানে আমি আর চেম্বারে যাব না।'

'কিছুদিন না।'

'বাড়িতে বসে কি করব ?'

'ছেলেদের সঙ্গে আড্ডা মারুন। নাতনির সঙ্গে সময় কাটান। নিজেকে যতটা সম্ভব চেঞ্জ করার চেষ্টা করুন।'

নিজেকে পাল্টাতে হবে। গান চলে যাওয়ার পর থেকে যে পাল্টানোর খেলা শুরু হয়েছিল তাতো আজও শেষ হল না। বড় ছেলে বিয়ে করেছে তার সহপাঠিনী এক ডাক্তারকে। মেয়েটি ভাল। গানের ধাঁচ আছে খানিকটা ওর মধ্যে। বছর পাঁচেক হল একটি মেয়েও হয়েছে। টরটরে কথা বলে সে। পারমিতা এখনও বেশ শক্ত। এ বাড়ির হাল এখনও তার হাতে। সোহিনীই বরং নানারকম অসুখে ভোগে। ছোটছেলে চাকরি নিয়ে চলে গেছে বোম্বে।

একটি মারাঠি মেয়ের প্রেমে পড়েছে সে। কথাটা জানিয়েছে তার ঠাকুমাকে। সোহিনীর মনঃকষ্টের এটা একটা বড় কারণ। এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না প্রবর। তাকে অবশ্য কথা বলতে হয়। পিউ তাকে কথা বলিয়ে ছাড়ে। পিউ আজকাল অনেকটা সময় দাদুর সঙ্গে কাটায়। তার প্রশ্নগুলো বেশ অদ্ভুত, 'দাদু, তুমি কি বুড়ো ?'

'হ্যাঁ, দিদা।'

'কে বেশী বুড়ো, তুমি না মাম্মা ?'

'তোমার মাম্মা আমার মা। তাই তিনি বড়।'

'বড় না, বুড়ো ? কে বেশী বুড়ো। মাম্মা আমাকে নিয়ে চিড়িয়াখানায় হেঁটে বেরিয়েছে। তুমি পারবে ? পারবে না। তুমি বেশী বুড়ো।'

'হয়তো তাই।'

'তুমি কাকে ভালবাসো ? মাম্মা, দিম্মা না আমি। কাকে ?'

প্রবর হঠাৎ মুগ্ধ হয়ে গেল। সে বলল, 'কাকে বলা যায় বল তো !'

'আমাকে, আমাকে, আমাকে। আর কাউকে নয়।' চিৎকার করে বলল পিউ।

এ এক মজার খেলা। সারাজীবনে এমন খেলা কখনও খেলেনি প্রবর। এমন আনন্দও কখনও পায়নি। মা, গান, সোহিনী অথবা ছেলেদের সঙ্গে যে সম্পর্ক এককালে তৈরি হয়েছিল পিউ-এর সঙ্গে এই সম্পর্ক তার থেকে একদম আলাদা। পিউ যখন তার ইজিচেয়ারের ওপর উঠে বসে গলা জড়িয়ে ধরে তখন পৃথিবীটা কি রকম মায়াময় হয়ে যায়। সেইসময় কেন বাঁচব প্রশ্নটা মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে। রোজ সকালে বিছানা থেকে উঠেই পিউ চলে আসে তার কাছে। আজকাল ভোরের আগেই ঘুম ভেঙে যায় প্রবরের। সে কান খাড়া করে থাকে পিউ-এর পায়ের শব্দ শোনার জন্যে। সে এল আর তার সকাল হল। বকর বকর শুরু করা মাত্র ডাক আসে। স্কুলে যাওয়ার জন্যে তৈরী হতে হয়। তৈরী হলে তার হাত ধরে প্রবর নিচে নামে। স্কুল-বাস এলে যত্ন করে তুলে দেয়। বাসে ওঠার আগে পিউ হুকুম করে, 'নিচু হও।' আজকাল হেঁট হতে অসুবিধে হয়। কিন্তু ভাল লাগে এই সময়। পিউ তার গালে চুমু খেয়ে বাসে উঠে পড়ে। মুক্ত আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে পিউ কতদিন তাকে চুমু খেয়ে যেতে পারবে। আবার দুটো বাজলেই ছাতামাথায় প্রবর নেমে এসে দাঁড়ায় ফুটপাতের পাশে। বাস এলে তড়বড়িয়ে নেমে এসে পিউ শোনাতে থাকে স্কুলে কি কি হল, কে কি বলল। সেই সামান্য কথার বিস্তারিত বিবরণ শুনতেও ভাল লাগে তার। খেয়ে দেয়ে পিউ চলে আসে তার খাটে। দুপুরের ঘুমটা ঘুমোয় তাকে জড়িয়ে ধরে। বিকেলে নাতনিকে নিয়ে পার্কে যায় প্রবর। বুড়োদের আড্ডা যেদিকে নেই সেদিকে ঘুরে বেড়ায়। পার্কে পিউ কিছু সঙ্গিনী পেয়েছে। ওদের খেলা চুপচাপ দ্যাখে প্রবর। সন্ধেবেলায় পিউ পড়াশুনা করে যখন তখন সে শুয়ে থাকে নিজের ইজিচেয়ারে। দিনটা যে কোন ফাঁকে ভরাট হয়ে কেটে যায়। সোহিনী বলে, 'মায়ায় জড়াচ্ছ।'

'মায়া ?'

'তা নয়তো কি !'

শ্রদ্ধা, প্রেম, কামনা থেকে এক ঝটকায় মায়াতে চলে আসা ? হোক মায়া তবু এই তো জীবন। এরই নাম অক্সিজেন।

পিউ-এর যখন আটবছর তখন স্কুলে যাওয়ার সময় ঘরের ভেতর দাঁড়িয়ে সে বলল, 'নিচু হও, চুমু খাব।'

'এখানে কেন ? বাস এলে—।'

'না না। এখানে অন্যমেয়েরা বাসে বসে দ্যাখে আর আমাকে ঠাট্টা করে।' চুমু খেয়ে নিচে নামতে লাগল পিউ। আজকাল ও যেভাবে হাঁটে তাতে তাল রাখতে পারে না প্রবর। মনটা কিরকম ভারি হয়ে গেল শরীরের সঙ্গে সঙ্গে। ওইটুকুনি মেয়ে এখনই ঠাট্টার ভয়ে ঘরেই দায়িত্ব সেরে নিল। অবশ্য এটাও ঠিক, বন্ধুরা ঠাট্টা করলে সেটা সহ্য করা মুশকিল। তবু—।

চৌদ্দ বছর অবধি এই জীবন। পিউ এখন চৌদ্দতে। দুপুরে শোওয়ার সময় পায় না। সে ফেরে চারটের সময়। কথা বলে, গল্প করে। কিন্তু সেসব বেছে বেছে। প্রবর বুঝতে পারে পিউ বড় হচ্ছে। শরীরের পরিবর্তন আসার সঙ্গে সঙ্গে সে অনেক ব্যাপারে সচেতন হচ্ছে। এখন একটা চুমু পেতে গেলে অনেক সাধ্যসাধনা করতে হয়। টিভিতে ইংরেজি সিনেমা দেখে দেখে অনেক আধুনিক কথা বলে। সেদিন বলল, 'দাদু তুমি এত আধুনিক কিন্তু সিস্টেম ভাঙ্গতে পার না!'

'কি রকম ?'

'দিম্মাকে আদর করতে ইচ্ছে হয় না ?'

'সে কি ?'

'বিদেশিরা স্ত্রীদের আনন্দ হলেই চুমু খায়। কেউ কিছু মনে করে না। তোমার বয়সে তো আকছার। তুমি দিম্মাকে লাস্ট কবে চুমু খেয়েছ ?'

'মনে পড়ে না ভাই।'

'তবে ? দ্যাখো।'

'এদেশে ওটা চালু নয় যে।'

'মাম্মাকে চুমু খেয়েছ কবে ?'

'সেই ছেলেবেলায়।'

'এখন খাও না কেন ?'

'বড় হলে কোন ছেলে মাকে চুমু খায় না এদেশে।'

'বেশ। তাহলে এখন থেকে আমাকেও চুমু খেতে বলবে না। আমি বড় হয়ে গেছি। শোন না মা দিম্মা কথায় কথায় বলে বড় হয়েছ!'

এ এক যন্ত্রণা। একটু একটু করে মেয়েটা সরে যাচ্ছে। জীবন তাকে যেমন এক নতুন আনন্দ এনে দিয়েছিল, যা জড়িয়ে ধরে বেঁচে থাকার আনন্দ পেতে চলেছিল আবার নতুন করে তা আবার নিষ্ঠুর ভাবে সরিয়ে নিয়ে যেতে জীবনই তৎপর। যদি কেড়ে নেবেই তবে কেন দেওয়া ?

বিকেলে পিউ-এর সঙ্গে পার্কে গেলে আর এক সমস্যা। সতের আঠারো বছরের ছেলেরা চারপাশে ঘুরঘুর করে। ন্যাতনি তাদের সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করলেও স্বস্তি পায় না প্রবর। এখন তার কাজ পাহারা দেবার। এক এক বিকেলে পিউ বলে সে পার্কে যাবে না। পাশের বাড়ির বান্ধবীর কাছে জরুরী

দরকার আছে তার। সেসময় মন খারাপ হয়ে যায়। দরকার কি ধরনের তা আর বিশদে বলে না পিউ। কিন্তু ফিরে আসে যখন তখন তার পায়ে বেশ ধুলো মাখা। পার্কে গেলে এই ধুলোটা লাগে। প্রবর বোঝে তাকে এড়িয়ে বান্ধবীদের নিয়ে পার্কে যায় পিউ। কেন ? তাকে এড়িয়ে কেন ?

চুপচাপ এক অপরাহ্নে নিজের ইজিচেয়ারে শুয়ে চোখ বন্ধ করতেই অন্ধকার। শরীরের সমস্ত অনুভূতি নিয়ে কপালের দিকে এগিয়ে যেতেই কিছু একটা যেন নড়ে উঠল। প্রবর শুধু আলোর ফুলকি দেখতে পাচ্ছিল। না আজ গান তার হাসিমুখ নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল না। কিরকম শূন্য অনুভূতি অক্টোপাশের শুঁড়ের মত তাকে জড়িয়ে ধরছিল। তার মনে হচ্ছিল এক গভীর নদীর নিচে সে শুয়ে আছে। মাথার ওপর, শরীরের ওপর জলের চাপ প্রবল। সেই চাপ ভেঙ্গে সে ওপরে উঠতে চাইছে। তার মেরুদণ্ড জুড়ে সেই ওঠানামা। আলোর ফুলকিগুলো একের সঙ্গে এক জুড়ে যাচ্ছে। আর তার আকর্ষণে মেরুদণ্ড বেয়ে একটা ঢেউ ওপরে উঠে আসছে। সারা শরীরে প্রথমে শিহরণ। প্রতিটি রোমকূপ রোমাঞ্চিত। তারপর ঘামের স্রোত নামল। প্রাণপণে সে চেষ্টা করছিল জলের ওপরে উঠে আসতে। একটু বাতাসের জন্যে।

ভাসান

স্থির। সময় এখন স্থির। শুধু পায়ের ওপরে যে জানলাটা চোখে পড়ে যেখানে চারকোণা আকাশ। সেই আকাশে আলো ফোটে, ধীরে ধীরে নীল ফ্যাকাশে হয়ে যায়। রুপো থেকে শিষে, রঙের কত হেরফের। কখনও সাদা কখনও কালো মেঘেরা জড়াজড়ি করে ছুটে যায় ওই চৌকো আকাশ বেয়ে। একসময় আলো মরে। লালচে আভা ছড়ায়। তারপর টুক করে অন্ধকার। ঠিক হল না, অন্ধকারও বিনা ভূমিকায় আসে না। তবে এখন শুক্লপক্ষ। তাই লালচে আভার পর অন্ধকার এসেও এল না। তার বদলে রুপোলি ঢল নামল। এক কোণায় পূর্ণচন্দ্র উঁকি মারল। আজ পূর্ণিমা।

প্রবর চোখ বন্ধ করল। চোখ বন্ধ করলে অন্ধকার, খুললে ওই চৌকো আকাশ। কিন্তু এটা সব সময় নয়। সারাদিনে, চব্বিশ ঘণ্টায় আটঘণ্টা। দিনের তিনভাগের এক ভাগ। বাকি দুই ভাগ পাশ ফিরে দুই দেওয়াল দেখা। এক দেওয়ালে গাছের ফাঁক দিয়ে ঢালু জমি নেমে গেছে দিগন্তে। অন্য দেওয়ালে শুধু গাছ আর গাছ। নিবিড় অরণ্য। ওয়াল পেপারে ছাপা ছবি। তবু কি চমৎকার।

'কেমন আছেন ?' পায়ের শব্দ সেই সঙ্গে প্রশ্ন। এই ভদ্রলোক ডাক্তার। ডক্টর সেনই ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। নার্সিং হোম থেকেই দেখে যাচ্ছেন। কতদিন হয়ে গেল। এখন আর হিসেব নেওয়ার ইচ্ছেও হয় না। সেই যে বাতাসের জন্যে ছটফটানি শুরু হয়েছিল ইজিচেয়ারে শুয়ে সেখান থেকেই যেতে হয়েছিল নার্সিং হোমে। ডক্টর সেন প্রচণ্ড লড়াই করে তার হৃদযন্ত্র এখনও চালু রেখেছেন। মোটা টাকা সেলামি দিয়ে বড় ছেলে তাকে ফিরিয়ে

এনেছে বাড়িতে।

প্রবর আজকাল প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করে না। প্রথম প্রথম করত। গোঙানি ছাড়া কোন শব্দ বের হয় না। ছুটন্ত রেলগাড়ির কামরা দুর্ঘটনায় পড়লে যেমন পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কা খায় তার গলা থেকে ওঠা শব্দগুলোর হাল হয় সেইরকমই। সে চোখ বন্ধ করল। এখন ডাক্তারের পাশে দাঁড়িয়ে থাকবে সোহিনী, পাথরের মত। পারমিতা দরজায়। বড় ছেলে বাড়িতে থাকলে সঙ্গে আসবে। পিউ?

'দুবেলা চাদর পাল্টে দিচ্ছ?' ডাক্তার যাকে প্রশ্ন করল সে জবাব দিল 'হ্যাঁ স্যার। চাদর পাল্টে পাউডার লাগিয়ে দিই পুরু করে।'

'গুড। ঘাগুলোর অবস্থা কি রকম? চাদরটা সরাও তো?'

চাদর সরানো হল। প্রবরের শরীর ডানদিকে ঘোরানোর পর ডাক্তার বলল, 'হ্যাঁ অনেকটা শুকিয়েছে। দিনের বেলায় অয়েলক্লথ এখনও কিছুদিন ব্যবহার করতে হবে।'

সোহিনীর গলা শোনা গেল, 'কোনরকম চান্স আছে?'

কিসের? সেন্স আসার? নিশ্চয় আছে। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। কয়েকদিন বাদে ফিজিও থেরাপি শুরু করতে হবে। চলুন।'

পায়ের আওয়াজ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। প্রবর চোখ খুলল। সামনে গাছ। দেওয়াল জোড়া গাছ। অথচ আকাশে চাঁদ উঠেছে। সে গোঁ গোঁ শব্দ করল। এখন শরীরের কোন পেশী বিন্দুমাত্র নড়ছে না। দুই হাত দুই পা এমনকি ঘাড় পর্যন্ত আর মস্তিষ্কের নির্দেশ পালন করে না। শুধু হৃদযন্ত্র চালু আর বোধ, বোঝার ক্ষমতাটুকু অন্তর্হিত হয়নি। প্রতিটি কথা কানে যায়। অনেক কিছুই মনে করতে পারে। কিন্তু সেটা যে পারছে তা কাউকে বোঝাতে পারে না। গোঁ গো শব্দ শুনে আয়া ছুটে এল, 'কি হয়েছে? কষ্ট হচ্ছে?'

প্রবর আবার শব্দ করল। আয়া বিড়বিড় করল, কি যে বলতে চায় বুঝতে পারি না।' তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'চিৎ করে শুইয়ে দেব?'

প্রবর মৃদু আওয়াজ করল। আয়া তার নগ্ন শরীরে চাপ দিয়ে একটু একটু করে চিৎ করে দিল। দিয়ে চাদর টেনে দিল শরীরে। চোখ খুলল প্রবর। হ্যাঁ, চাঁদ আরও একটু ঢুকে এসেছে চৌকো আকাশে। গোলগাল চাঁদ। আয়ার গলা কানে এল, 'অনেকক্ষণ পেচ্ছাপ হয়নি। করবেন?'

সে মাথা নেড়ে না বলতে চাইল কিন্তু ঘাড় নড়ল না। চাঁদ দেখার সময় এ কি রকম কথা। আয়া বেডপ্যান নিয়ে এল। তারপর তার দুই পায়ের মধ্যে সেটাকে চেপে ধরল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর বলল, 'দেখবেন, আবার বেছানা ভেজাবেন না। আওয়াজ করবেন।'

প্রবর চাঁদের দিকে তাকিয়েছিল। এখন শরীর শিশুর মত নিরাসক্ত। যে শরীর নিয়ে এত খেলা একজীবনে করা হয়েছে তার সঙ্গে ভুমিষ্ঠ হওয়া শিশুর কোন পার্থক্য নেই। এমন কি যখন পিউ অথবা বউমা ঘরে ঢোকে তখন তারাও স্বচ্ছন্দে সরে যাওয়া চাদর টেনে দিয়ে যায়। শরীর অবশ হলেও মন তার কাজ করে যায় এটুকুই একটা শিশুর সঙ্গে পার্থক্য। সে লজ্জা পেত প্রথম প্রথম, এখন পায় না। তার খিদে পেলে চেঁচায়, পায়খানা প্রস্রাবের সময়

চেঁচানোর আগেই অনেক সময় বেরিয়ে যাচ্ছে। দ্বিতীয় শৈশব কি একেই বলে ? চোখ বন্ধ করল প্রবর। চোখের সামনে অন্ধকার। কেউ একজন হেঁটে যাচ্ছে। কে ? কি একটা করার ছিল কিন্তু করা হল না। সে নিঃশ্বাস ফেলল। যে হেঁটে যাচ্ছে সে কি গান ? মনে মনে চেঁচিয়ে ডাকল প্রবর। গান ! গান ! গান !

আমরা কোথা হইতে আসিয়াছি তাহা জানি না, কোথায় যাইব তাহাও জানা নাই। কিন্তু আর নয়। ঈশ্বর এবার সময় এনে দাও। সে বন্ধ চোখের পাতায় তাকিয়ে মেরুদণ্ড থেকে একটা ঢেউকে জাগাতে চাইল বারংবার। বদলে চোখের কোণ উপচে জল গড়িয়ে এল।

এই শরীর ছেড়ে সে যাওয়ার জন্যে ছটফট করছিল। কিন্তু কি ভাবে যাবে ? এখন শরীরটাকে ধ্বংস করার বিন্দুমাত্র শক্তি তার নেই। মরতে চাইলেও মরার উপায় নেই। সব কিছুই জীবন তাকে হাত ভরে দিয়েছিল কিন্তু যেই সে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছে অমনি তার হাত থেকে কেড়ে নিয়েছে নির্দয়ভাবে। হঠাৎ মাতৃস্তন্যের কথা মনে পড়ল। সেই প্রথম। জীবনের স্বাদ পেয়েছিল যে স্তন্যবৃন্তে তার মুখে নিমপাতার রস মাখিয়ে দেওয়া হয়েছিল নির্দয়ভাবে। সারাজীবন ধরে তারই সন্ধানে ঘুরে বেড়ানোই সার হল। প্রতিদিন বেঁচে থাকাটাই যেখানে বিস্ময়, মরণ স্বাভাবিক, সেখানে এখন তার দেখা নেই কেন ? মরণের মুখেও কি নিমপাতা মাখিয়ে দিয়েছে কেউ ! প্রবর চোখ খুলল। চাঁদ বড় হয়েছে আরো। আরও উজ্জ্বল। এরকম একটা চাঁদের রাতের কথা তার বোধে মাঝে মাঝে টোকা দিয়ে যায়। সে বুঝতে পারে না। মায়ের শরীর থেকে বেরুবার আগে হৃদযন্ত্র অচল ছিল। এখান থেকে যাওয়ার সময় হৃদযন্ত্র আবার বন্ধ হবে। কিন্তু কোথায় যাবে ? কোন মাতৃগর্ভে। সেখানে কি গভীর অন্ধকার ?

প্রবর, চোখ বন্ধ করে, সমস্ত বোধ একত্রিত করে আর একটি মাতৃগর্ভের সন্ধান করছিল এই জ্যোৎস্নাপ্লাবিত পূর্ণিমায়।